আমার মা সব জানে
অদ্রীশ বর্ধন

আমার মা সব জানে

অদ্রীশ বর্ধন

প্রতিশ্রুতিময় সাহিত্যের
ভাবী কল্পতরু
বিজ্ঞাননিষ্ঠ
অনীশ দেব-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

আমার মা সব জানে (২য়)

আমার মা সব জানে (৩য়)

আমার কথা

ভাগ্যচক্রে আমি আমার ছেলের বাবা এবং মা (কারণ অনুমেয়)। রাশি রাশি প্রশ্নকে ‘ফেস’ করতে হয়েছে। কিভাবে জবাব দিলে মাথায় ঢুকবে, তা ভাবতে হয়েছে মুখের দিকে চেয়ে। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, মা যা জানে—বাবা তা জানে না। যেমন, আমার মা। সব জানে। জানত।

অদ্রীশ বর্ধন

সূচিপত্র

ব্ল্যাক হোল

প্রশ্ন : 'ব্ল্যাক হোল' কি কালো গর্ত? মহাকাশে গর্ত থাকে?

মা : গর্তের মধ্যে জিনিস পড়লে যেমন হারিয়ে যায়—ব্ল্যাক হোল তেমনি সবকিছু নিজের মধ্যে টেনে নেয়—কিছুই আর বেরিয়ে আসে না—তাই তার নাম গর্ত।

প্রশ্ন : কী ভাবে টেনে নেয়?

মা : ফোর্স অভ গ্র্যাভিটেশন দিয়ে—বাংলায় অভিকর্ষণ শক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই এ-ওকে টানছে।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোল তাহলে কি?

মা : আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হেঁয়ালি। অতিকায় নক্ষত্র যখন ভেঙেচুরে ধসে পড়ে, তখন যা পড়ে থাকে—তাই। এরই নাম ব্ল্যাক হোল বা অন্ধকূপ। সব বস্তুর কবরখানা।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোল বলছ কেন? অন্য রঙের নয় কেন?

মা : তারকার ধ্বংসাবশেষ এত জমাট বেঁধে যায় যে, অভিকর্ষণ শক্তি বেড়ে যায় অকল্পনীয়ভাবে—তখন তার মারাত্মক টান এড়িয়ে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না। আলোকে টেনে নিয়ে নিজেও অন্ধকার হয়ে থাকে। তাই তা কালো। আকাশের অন্য জ্যোতিষ্কদের মত চেকনাই তার নেই।

প্রশ্ন : এই টান কতখানি, মা?

মা : এক কেজি ওজনের তোর ওই ডিক্সনারিটা ব্ল্যাক হোলের বিশ ফুট দূরে আনলেই তার ওজন হবে মিলিয়ন টন। এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ, তা তো জানিস?

প্রশ্ন : এই টান-কে কাজে লাগানো যায় না?

মা : তার আগে কাজে লাগাতে হবে উর্বর কল্পনাশক্তিকে। পাক খেয়ে খেয়ে বস্তুগুলো যখন ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঢুকতে থাকে, তখন ব্ল্যাক হোলের বিপুল অভিকর্ষ ক্ষেত্র থেকে প্রচণ্ড গতিশক্তি অর্জন করে বস্তুরা। এই শক্তির কিছুটা তীব্র বিকিরণে রূপান্তরিত হয়। ব্ল্যাক হোলের বাইরে ঘাঁটি গেড়ে বসে হয়ত একদিন আমরা এই বিপুল শক্তিধারাকে কাজে লাগাতে পারি।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোলের উনুন বানাতে চাও?

মা : উনুনে কয়লা বা কাঠ পোড়ালে পুরো এনার্জি পাওয়া যায় না। নিউক্লিয়র রিঅ্যাকশনের ফলেও পুরোটা পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনও বস্তু ব্ল্যাক হোলের দিকে ঘুরপাক খেয়ে ছুটে গিয়ে, ভেতরে না ঢুকেও উগরে দেবে অনেক বেশি শক্তি। যে কোনও জিনিস থেকেই ব্ল্যাক হোল শক্তির যোগান দিয়ে যাবে—জুতো, বই, কাঠ—সব কিছু থেকেই। ব্ল্যাক হোল তাই ব্রহ্মাণ্ডের উনুন।

প্রশ্ন : কিন্তু ব্ল্যাক হোল তো কিছুই উগরে দেয় না?

মা : ব্ল্যাক হোলের অন্য একটা দিক নিশ্চয় আছে। অর্থাৎ পেছনদিক। শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে সেখানে।

প্রশ্ন : তার মানে?

মা : কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, কোনও জিনিসই সত্যি-সত্যি হারিয়ে যায় না ব্ল্যাক হোলের মধ্যে। বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য দিক দিয়ে—ব্রহ্মাণ্ডের অন্য এক জায়গায়।

প্রশ্ন : টুথপেস্টের মত?

মা : হ্যাঁ। বেরোনোর মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, এনার্জির জন্য জ্বলে উঠছে—সাদা গর্ত হয়ে যাচ্ছে। যতখানি পজিটিভ গ্র্যাভিটির চাপে ভেতরে চেপেচুপে ঢুকছে, ঠিক ততখানি নেগেটিভ গ্র্যাভিটির চাপে প্রতিটি কণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : কালো গর্তর পেছনে সাদা গর্ত!

মা : হাসছিস? পণ্ডিতরাই তো সন্দেহ করছেন, মহাশূন্যের কোয়াসারগুলো এক-একটা সাদা গর্ত।

প্রশ্ন : কোয়াসার আবার কি?

মা : মহাশূন্যের দূরে দূরে শ-খানেক গ্যালাক্সির প্রভা নিয়ে যে বস্তুগুলো দীপ্যমান—তাদের নাম কোয়াসার। তারা যে কী, সেটাও একটা রহস্য।

প্রশ্ন : এবার আমার কল্পনা খাটাই। ব্ল্যাক হোলের মধ্যে দিয়ে বেড়ানো যায়?

মা : কার্ল সাগান অবশ্য তোর মতই কল্পনা করেছেন। ব্ল্যাক হোলের মধ্যে দিয়ে যে কোনও বস্তু বহু দূরে চলে যেতে পারে খুব অল্প সময়ের মধ্যে—সাধারণ ব্রহ্মাণ্ডের গতির সীমা পেরিয়ে যায়। একদিন হয়ত ব্ল্যাক হোলের মধ্যে মানুষ নিজেদের টিকিয়ে রাখার মন্ত্রগুপ্তি মুঠোয় এনে ফেলবে, হয়ত স্পেশ্যাল অভিকর্ষ-প্রতিরোধক মহাকাশপোত নির্মাণ করবে—এমন সব বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি মেনে চলবে, আজ তা কল্পনাও করা যায় না। মানুষ এবং মালপত্র বহুদূরে চলে যাবে চক্ষের নিমেষে।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোলের মধ্য দিয়ে তাহলে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে টহল দেওয়া যাবে?

মা : অগুন্তি ব্ল্যাক হোল রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে—এক-একটা গ্যাল্যাক্সিতে এক-এক বিলিয়ন—আন্দাজি হিসেবে। একটা থেকে আর একটার দূরত্ব চল্লিশ আলোকবর্ষ—এক আলোকবর্ষ মানে এক বছরে আলো যতটা পথ যায়। সাগান সাহেব বলেছেন, এক ব্ল্যাক হোল থেকে আর এক ব্ল্যাক হোলে টুকটাক লাফ মেরেই গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে টহল মেরে একদিন কসমিক এম্পায়ার গড়ে তোলা যাবে। এ রকম সাম্রাজ্য এর মধ্যেই হয়ে রয়েছে কী না, তাই বা কে জানে!

প্রশ্ন : কল্পবিজ্ঞান পড়ছ বুঝি আজকাল?

মা : সবই তো সম্ভাবনার কথা। এমনও তো হতে পারে, ব্ল্যাক হোল বস্তুর গোরস্থান শুধু নয়—গোরস্থান এবং আঁতুরঘরও বটে। একদিকে মৃত্যু—আর এক দিকে নতুন জন্ম। তাই যদি হয়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যু হবে না কোনওদিনই।

প্রশ্ন: ব্ল্যাক হোলকে দেখা যায়?

মা : না। কিন্তু তার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না।

প্রশ্ন :কীভাবে?

মা : ব্ল্যাক হোলের কিনারায় বস্তুদের মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে ঠিকরে আসে এক্স-রে। তা থেকে আন্দাজ করা যায়। আর বোঝা যায় গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সের দৌলতে।

প্রশ্ন : গ্র্যাভিটেশনাল লেন্স!

মা : গ্র্যাভিটির মূলে যে কণিকা, তার নাম গ্র্যাভিটন। ব্ল্যাক হোলের চারপাশে এই গ্র্যাভিটন দিয়ে তৈরি গ্র্যাভিটি আলোকে নিজের দিকে টেনে নেয়। লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো যেন একদিকে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা তখন বোঝেন, এই লেন্স আর আমাদের মাঝে রয়েছে একটা ব্ল্যাক হোল। আমাদের এই গ্যালাক্সির ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা ব্ল্যাক হোল—এক্স-রে থেকে আঁচ করা গেছে। এখান থেকে তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। সিগনাস তারকামণ্ডলীর এক জায়গায় এক্স-রে'র উৎস খুঁজতে গিয়ে জানা গেল সেখানে রয়েছে একটা ব্ল্যাক হোল। অনেক পণ্ডিত অবশ্য মানেন না। মিনি ব্ল্যাক হোলও আছে।

প্রশ্ন : মিনি ব্ল্যাক হোল!

মা : যে-বিস্ফোরণ থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে, সেই বিস্ফোরণের ভয়াবহ চাপেই হয়ত অজস্র মিনি ব্ল্যাক হোলও তৈরি হয়ে গেছে। এই গ্যালাক্সিতেই আছে শ-দুয়েক।

প্রশ্ন : যদি ধাক্কা লাগে পৃথিবীর সঙ্গে?

মা : পৃথিবী ফুঁড়ে বেড়িয়ে যাবে। এরকম নাকি ঘটেছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন। সেন্ট্রাল সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্‌কা অঞ্চল ফুঁড়ে ঢুকে গিয়ে নর্থ আটলান্টিক দিয়ে বেরিয়ে গেছিল তুমুল জলস্তম্ভ বানিয়ে। অবশ্য তা কেউ দেখেনি। অদ্ভুত চিহ্ন রয়ে গেছে শুধু সাইবেরিয়ায়। সবই অবশ্য জল্পনাকল্পনা।

প্রশ্ন : পৃথিবী কি ব্ল্যাক হোল হতে পারে?

মা : মুঠোয় চেপে পৃথিবীকে যদি ০·৮৭ সেন্টিমিটার অর্থাৎ একটা বড় মুক্তোর সাইজে আনতে পারিস, তাহলে হবে।

প্রশ্ন : মিনি ব্ল্যাক হোলকে পোষ মানানো যায় না?

মা : গেলে পৃথিবী থেকে এনার্জির সমস্যা চলে যাবে। ধরা যাক, সৌরজগৎ দিয়ে যাচ্ছে একটা মিনি ব্ল্যাক হোল। তাকে টেনে এনে সূর্যর চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল। তারপর তার মধ্যে হাইড্রোজেন গুলি ছুঁড়ে দিলেই তুমুল ধারায় উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে হিলিয়াম। সহজতম এবং অতীব দক্ষ পারমাণবিক চুল্লি হয়ে যাবে মিনি ব্ল্যাক হোল। সেই এনার্জিকে স্টোর করে পৃথিবীতে পাঠালেই ল্যাঠা চুকে যাবে।

প্রশ্ন : সূর্য যদি ব্ল্যাক হোল হয়ে যায়?

মা : সোনালী সূর্যর এখনকার ব্যাস দেড় মিলিয়ন কিলোমিটার। জাদুকাঠি বুলিয়ে তাকে দশ কিলোমিটার ব্যাসের সূর্য বানিয়ে দিলে বেচারা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সমস্ত উপাদান নিয়েই এত ঘন হয়ে যাবে যে আলো আর বেরোবে না। সে থাকবে, কিন্তু তাকে আর দেখা যাবে না।

প্রশ্ন : সৌরজগতের কী হবে?

মা : কিস্‌সু না। পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে থেকে তখনও পৃথিবী চক্কর মারবে ব্ল্যাক হোল ঘিরে। তবে হ্যাঁ, নারকীয় অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা সৌরজগৎ।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোল কি স্থির গর্ত?

মা : না। কুমোরের চাকার মত ঘুরছে। অঙ্ক কষে দেখা গেছে, তিরিশটা সূর্যর সমান একটা অতিকায় তারকা যদি ব্ল্যাক হোল হয়ে যায়, তাহলে সে ঘুরবে সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার বার!

প্রশ্ন : ঘুরন্ত লাটুর মত গোঁ-গোঁ করবে?

মা : মোটেই না। ব্ল্যাক হোল কথা বলে না—বোবা। বস্তু, আলো, রেডিও তরঙ্গ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড—কিছুই তো বেরোতে পারছে না! আওয়াজ হবে কী করে? ব্ল্যাক হোল তাই শুধু অন্ধকূপ নয়—বোবা গহ্বর।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোল কি গোল?

মা : ঘুরছে বলে বাইরের দিকটা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত চ্যাপ্টা। টানের চোটে বহু জিনিস এখানেই এসে ঘুরতে থাকে—গর্তে আর পড়ে না।

প্রশ্ন : দুটো ব্ল্যাক হোল যদি একে অপরকে টেনে নেয়?

মা : ১+১=২ হবে না—হবে ৩! গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত চাকতির পরিসর যাবে বেড়ে। এটাও ব্ল্যাক হোলের একটা হেঁয়ালি।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোল কি গরম না ঠাণ্ডা?

মা : সেখানেও রয়েছে প্রহেলিকা। ব্ল্যাক হোল যদি সূর্যর সাইজের হয়, তাহলে তা হবে হিমশীতল। আর যদি হয় একটা প্রোটন সাইজের—তাহলে তা হবে ভয়ানক গরম। মানে, বড় ব্ল্যাক হোলরা বরফ ঠাণ্ডা, ক্ষুদেরা তেতে আগুন। সিগনাস X-I-কে বলা হয় আকাশে বরফের বাক্স।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক হোলরা কি অমর?

মা : না। হকিং সাহেবের নিয়ম অনুসারে ছোটদের আয়ু কম—ফেটে যায়। বড়রা প্রায় অনন্তকাল টিকে থাকে।

প্রশ্ন : গোটা ব্রহ্মাণ্ডটা কি ব্ল্যাক হোল হয়ে যেতে পারে?

মা : কিছু পণ্ডিত মনে করেন, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রাশি রাশি ব্ল্যাক হোল যখন আবির্ভূত হবে—গায়ে গায়ে লেগে তারা আরও বড়, আরও ঠাণ্ডা হতে থাকবে। গোটা ব্রহ্মাণ্ড হয়ে যাবে একটা ব্ল্যাক হোল। আবার অনেকের মতে ব্ল্যাক হোল থাকলেই হোয়াইট হোল-ও আছে। এদিক দিয়ে যা ঢুকছে, ওদিক দিয়ে তা অণুপরমাণুতে ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি তাই চলছে। কিন্তু কীভাবে? নতুন সৃষ্টি হচ্ছে হোয়াইট হোলে—সেটা নিয়েই তো গালগল্প। একজন লেখক বলেছেন, স্বর্গ নাকি সেখানেই—জন্মান্তরও ঘটছে সেখানে। মৃত্যুর পর আত্মা নাকি অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলে যায় আলোর জগতে! হোয়াইট হোলে!

আইনস্টাইন

প্রশ্ন : আইনস্টাইন কী জন্যে বিখ্যাত মা?

মা : তিনটে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের জন্য।

প্রশ্ন : সেগুলোর নাম?

মা : স্পেশ্যাল থিওরি অভ রিলেটিভিটি, জেনারেল থিওরি অভ রিলেটিভিটি আর ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি।

প্রশ্ন : থিওরি তিনটের মোদ্দা কথা কী?

মা : স্পেশ্যাল থিওরিতে উনি বলছেন, এই বিশ্বে একেবারে নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু অবস্থায় কিছুই নেই। সব গতিই আপেক্ষিক। জেনারেল থিওরিতে নিয়ে এলেন প্রকৃতির এক বিরাট আইনকে—অভিকর্ষ অর্থাৎ গ্র্যাভিটিকে। ব্রিলিয়ান্ট ব্যাখ্যা দিলেন গ্র্যাভিটির নিয়মকানুনের। এই থিওরি অনুসারে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এবং অন্যান্য ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে তফাত বের করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। যাকে বলি গ্র্যাভিটেশন, আসলে তা পৃথিবী লাটুর মত ঘুরছে বলে ত্বরণ বা acceleration-এর জন্যে হচ্ছে। কিন্তু তখনও ব্যাখ্যার বাইরে রয়ে গেল দুটো মস্ত শক্তি—ইলেকট্রিক ফোর্স আর ম্যাগনেটিক ফোর্স। জেনারেল থিওরিকে টেনে নিয়ে গিয়ে উনি হাজির করলেন ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি।

প্রশ্ন : শুধুই সিদ্ধান্ত? প্রমাণ করতে পেরেছেন?

মা : প্রথম দুটোর ক্ষেত্রে পেরেছেন—তৃতীয়টার ক্ষেত্রে পারেননি।

প্রশ্ন : তার মানে, ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি আজও অপ্রমাণিত?

মা : হ্যাঁ। উনি নিজেই আক্ষেপ করেছিলেন, এক্সপেরিমেন্ট করবার কোন পথই বের করতে পারলেন না। থিওরিতে যা-যা অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন, তা হাতেনাতে দেখাতে পারলেন না। যেমনটা দেখিয়েছিলেন জেনারেল থিওরির ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন : কি দেখিয়েছিলেন?

মা : সূর্যের কাছে গিয়ে আলোক রশ্মি সামান্য বেঁকে যায়। এইটেই সবচেয়ে বিখ্যাত প্রমাণ।

প্রশ্ন : স্পেশ্যাল থিওরিটাকে আরও খুলে বলবে?

মা : স্পেশ্যাল থিওরিতে উনি বলেছেন, সব কিছুই গতিময়। এবং এই গতির বেগ নানান জায়গা থেকে নানান জনের চোখে নানান রকম মনে হয়। কিন্তু পালটায় না শুধু একটা গতিবেগ: আলোর গতিবেগ। সেটা একই থেকে যায়।

প্রশ্ন : শুধু এইজন্যেই কি এই থিওরি এত স্পেশ্যাল?

মা : স্পেশ্যাল আরও একটা কারণে। ওঁর আগে পর্যন্ত সবাই জানত, স্পেস আর টাইম—দেশ আর কাল—দুটো আলাদা ব্যাপার। উনি দেখিয়ে দিলেন, মোটেই তা নয়। দুটোই জড়িয়ে মুড়িয়ে মিলেমিশে রয়েছে। জ্যামিতিতে কোনও জিনিসকে দেখানো হত শুধু তার অবস্থান দিয়ে—জিনিসটা কতটা চওড়া, কতটা লম্বা, কতটা উঁচু—এইভাবে। অর্থাৎ তার তিনটে মাত্রা, মানে ডাইমেনশন। আইনস্টাইন এর সঙ্গে যোগ করলেন চতুর্থ মাত্রা—সময়। অর্থাৎ জিনিসটা রয়েছে কোন সময়ে।

প্রশ্ন : ফোর্থ ডাইমেনশন?

মা : জানি অনেকেই জিনিসটাকে ধারণায় আনতে পারে না।

প্রশ্ন : কিন্তু এই 'কখন'টাকে বোঝবার উপায় কি?

মা : ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন। দূরত্বর মাপ আর সময়ের মাপ-এর সম্পর্কটা উনি আলোর স্পিড দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন : কীভাবে?

মা : এক সেকেণ্ড মাইনাস ৩০, ০০০, ০০০, ০০০ সেন্টিমিটারের সমান।

প্রশ্ন : মাইনাস সাইনটা কেন?

মা : দেশ আর কালের মধ্যে তফাত বোঝাবার জন্যে নিছক একটা গাণিতিক কৌশল।

প্রশ্ন : স্পেশ্যাল থিওরির চমকটা তাহলে কোথায়?

মা : চমকই বটে। বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছিলেন দুটো কথা বলে। এক, গতি যে কোনও জিনিসকে ভারি করে দেবে, অর্থাৎ তার বস্তুর পরিবর্তন ঘটবে—সেইসঙ্গে জিনিসটার দৈর্ঘ্য অন্য রকম করে ছাড়বে। দুই, এটা আরও পিলে চমকানো কথা—বস্তু পাল্টে গিয়ে শক্তি হয়ে যাচ্ছে—শক্তি হয়ে যাচ্ছে বস্তু।

প্রশ্ন : বস্তু থেকে শক্তি, শক্তি থেকে বস্তু?

মা : বিখ্যাত ইকুয়েশন $E=mc^2$ টা মনে রাখিস। এই একটা ছোট্ট সমীকরণের মাধ্যমেই বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন। E মানে এনার্জি, m মানে mass বা ভর বা বস্তু, c হচ্ছে আলোর স্পিড। কম বস্তুর বিপুল এনার্জিতে রূপান্তরিত হওয়ার এই মন্ত্র অ্যাটমবোমা আর পারমাণবিক চুল্লিতে কাজে লাগানো হয়েছে। কিছুই কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে না। একটা বস্তুর খানিকটা কাইনেটিক এনার্জি হয়ে যাওয়ার পর সেই এনার্জি আর বাকি বস্তুর যোগফল হবে আদি বস্তুর সমান।

প্রশ্ন : ছুটলে যে ভারি হওয়া যায়, তার প্রমাণ?

মা : তুই ছুটলে হাল্কাই হবি। কিন্তু ভীষণ গতিবেগে বিপুল জায়গা জুড়ে ছুটলে বস্তু বেড়ে যায়। যেমন ধর, ইলেকট্রনকে যদি প্রায় আলোর গতিবেগে ছোটানো যায়—তা ভারি হবে। আইনস্টাইনের এই ভবিষ্যৎবাণী প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন : 'প্রায়' আলোর গতিবেগে যদি হয়, তাহলে আলোর সমান গতিবেগে ছোটালে কি হয়?

মা : ছোটানো অসম্ভব। অপরিমিত ভারি হয়ে যায়।

প্রশ্ন : একজন বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত আর একজন বৈজ্ঞানিক একটু পাল্টে দেন, তাইনা?

মা : হ্যাঁ। তবে গ্যালিলিও, নিউটন এবং অন্যান্যদের সিদ্ধান্তকে একেবারে খারিজ করেনি আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা জুগিয়েছেন, অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী করেছেন—একে একে তা মিলে যাচ্ছে। ক্লাসিকাল ফিজিক্সের অঙ্ক আলোর প্রায় কাছাকাছি গতিবেগে কোনও কাজে লাগে না। সেখানে স্পেশ্যাল থিওরির প্রয়োজনটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আইনস্টাইনের থিওরিকে টেক্কা মেরেছেন কেউ?

মা : টেক্কা মারা হয়েছে এমন কথা বলব না। আজও তাঁর থিওরি অভ্রান্ত। তবে তাঁর জেনারেল থিওরির রূপান্তর ঘটিয়েছেন অনেকে। সবচেয়ে বড় রূপান্তরিত সিদ্ধান্তটার নাম কাইনেমেটিক থিওরি। সময়কে আরো সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, বিশ্ব কীভাবে এই অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতে তার কী হাল হবে?

প্রশ্ন : স্পেশ্যাল থিওরিকে 'স্পেশ্যাল' বলা হয় কেন, মা?

মা : Un-accelerated অর্থাৎ একটু একটু করে আরও বেশি দ্রুতগামী নয় এমন পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই সীমিত থিওরি বলে একে বলা হয়েছে Restricted অথবা Special.

প্রশ্ন : বস্তু থেকে এনার্জি হওয়ার একটা উদাহরণ দেবে?

মা : প্রথম অ্যাটম বোমার ইউরেনিয়াম মজ্জা থেকে এক গ্রাম ইউরেনিয়াম এনার্জি হয়ে গিয়ে বিশ হাজার টন টি-এন-টি বিস্ফোরকের সমান বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন : আলোর কাছাকাছি বেগে রকেট যেদিন ছুটবে?

মা : রকেটে যারা থাকবে, তাদের বয়স যতটা বাড়বে, তার চেয়ে অনেক বেশি বুড়ো হবে পৃথিবীর মানুষ।

প্রশ্ন : আরও খুলে বলবে?

মা : ধর, একটু একটু করে আরও বেশি দ্রুতগামী অবস্থায় গ্যালাক্সির মাঝখানে টহল দিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এল মহাকাশচারী তিরিশ বছর পরে, এসে দেখবে পৃথিবীতে চল্লিশ হাজার বছর কেটে গেছে। যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে এক ভাই থাকবে ইয়ং, আর এক ভাইয়ের নাতিপুতির মুখও হয়ত দেখতে পাবে না।

প্রশ্ন : আলোর কাছাকাছি বেগে ছুটলে কী কী হতে পারে?

মা : যেদিকে ছুটছে বস্তু, সেদিকের দৈর্ঘ্য কমে যাবে। রকেট হবে বেঁটে, আর বেজায় ভারি। সময় কমে যাবে।

প্রশ্ন : যেমন?

মা : ধর, তুই প্রায় আলোর স্পিডে সাইকেল চালাচ্ছিস। আমি দেখব তোর চেহারাটা হয়েছে কার্ডবোর্ড থেকে কেটে নেওয়া মূর্তির মত পাতলা, সাইকেলটা চলছে শামুকের গতিবেগে। তোর ওজন হবে অকল্পনীয় বেশি। সাইকেলটা প্রায় অর্ধেক লম্বা হয়ে যাবে। আমি হু-হু করে বুড়িয়ে যাব—তোর বয়স বাড়বে সামান্য।

প্রশ্ন : জেট প্লেনে তো এরকম দেখা যায় না?

মা : পৃথিবীর চৌহদ্দিতে যে মামুলি স্পিড, তাতে এ-রকম পরিবর্তন এতই কম যে ধরা যায় না। নইলে দৌড় প্রতিযোগিতায় উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটত। তবে খুবই হাইস্পিডে পরিবর্তনগুলো দারুণ গুরুত্ব নেয়। আলোর গতিবেগের নব্বই শতাংশ গতিবেগে ধেয়ে যাচ্ছে একজন মহাকাশচারী। পৃথিবীতে রয়েছে তার যমজ ভাই। দুই ভাইয়ের মধ্যে যে অবিশ্বাস্য ফারাক তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এমন অনুভূতি মহাকাশচারীর মাথাতেই আসবে

না। কিন্তু তার মহাকাশযানের বস্তু ডবলেরও বেশি হবে, অর্থাৎ বেজায় ভারি হবে, লম্বায় অর্ধেকেরও বেশি ছোট হয়ে যাবে, আর মহাকাশযানের মধে রাখা ঘড়িতে দেখা যাবে এক ঘন্টায় মাত্র ছাব্বিশ মিনিট পর্যন্ত কাঁটা ঘুরেছে: কারণ, সময় তো শ্লথ হয়ে গেছে। ফলে, মহাকাশচারীর বয়স বাড়বে তার যমজ ভাইয়ের বয়স বৃদ্ধির অর্ধেকেরও কম স্পিডে।

প্রশ্ন : আলোর স্পিডে যখন ছুটবে মহাকাশযান?

মা : অসীম হবে তার বস্তু, দৈর্ঘ্য এসে দাঁড়াবে শূন্যে এবং মহাকাশের ভেতরে সময় একেবারেই থমকে দাঁড়িয়ে যাবে।

প্রশ্ন : অসম্ভব?

মা : হ্যাঁ, অসম্ভব। তাই আলোর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না কিছুই।

প্রশ্ন : ঘড়ি চলবে শামুকের মত, এর এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে?

মা : হয়েছে। ১৯৭২ সালে সেন্সিটিভ অ্যাটমিক ঘড়ি বসানো হয়েছিল মহাকাশযানে। একই রকমের ঘড়ি ছিল পৃথিবীতে। দুটো ঘড়ির সময় মিলিয়ে দেখা গেল, মহাকাশযানের স্পিড কমছে, অর্থাৎ সেখানকার সময় ধীরে চলছে।

প্রশ্ন : বড় জটিল বিষয় এই রিলেটিভিটি থিওরি। সাধারণ বুদ্ধির ঠিক উল্টো কথা বলছে, তাই না?

মা : ঠিক তাই। অত্যন্ত হাই স্পিডে কমনসেন্সের ধারণাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়—আইনস্টাইনের অত্যাশ্চর্য এই উপলব্ধির ওপরেই দাড়িয়ে আছে তার থিওরি অভ রিলেটিভিটি।

প্রশ্ন : কমনসেন্স!

মা : কমনসেন্স বলছে, দুটো গাড়ি যখন দুদিক থেকে মুখোমুখি ধেয়ে আসে ঘন্টায় একশ কিলোমিটার স্পীডে, তখন একটা আর একটার পাশ দিয়ে চলে যাবে ঘন্টায় দু-শ কিলোমিটার রিলেটিভ স্পীডে অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিবেগে। করেও তাই। কিন্তু একটা গাড়ির বদলে যদি আলোক-রশ্মি ধেয়ে আসে, তখন আর মামুলি ধারণা টেকে না। অন্য গাড়িটা যে স্পীডেই আলোক-রশ্মির দিকে আসুক, অথবা আলোক-রশ্মির দিক থেকে সরে যাক না কেন—আলোক-রশ্মি সেই গাড়িকে একই স্পীডে ঠোক্কর মারবে, এবং সেই স্পীড মোটামুটিভাবে সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার।

প্রশ্ন : পরীক্ষিত সত্য কি?

মা : ১৮৮০ সালে এক্সপেরিমেন্ট করে ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়। আইনস্টাইনের ভাবনাচিন্তার শুরু এইখান থেকেই। উনি বলেছিলেন, আলোর স্পীড-ই তাহলে এই বিশ্বের একমাত্র ধ্রুবক। Constant। যার পরিবর্তন নেই। আয়তন, বস্তু, এমন কি সময় পর্যন্ত আপেক্ষিক: এদের যে কোনোটির মাপজোখ নির্ভর করে পর্যবেক্ষকদের অবস্থান আর আপেক্ষিক গতিবেগের ওপর।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ সালে ছেপেছিলেন থিওরি দুটো?

মা : দুই অংশে ভাগ করা থিওরির ফাস্ট পার্ট বেরোয় ১৯০৫ সালে, সেকেণ্ড পার্ট ১৯১৫ সালে।

প্রশ্ন : আইনস্টাইনের জন্ম কোথায় মা?

মা : জামানীতে—দক্ষিণ জার্মানীর উলম শহরে ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ ধরায় এসে ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল চলে গেছেন। তাঁর ব্রেন আরকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে গবেষণার জন্যে।

প্রশ্ন : ছেলেবেলায় তো পড়াশুনোয় অষ্টরম্ভা ছিলেন?

মা : তোর মত ফাঁকিবাজের কাছে গুজবটা একটা পরম সান্ত্বনা। উনি নাকি স্কুলে 'ফেল' করেছিলেন। কিন্তু স্কুল-রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে উনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। বিশেষ করে ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স আর মিউজিকে টেক্কা মেরেছেন প্রত্যেককে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের অন্যতম হিসেবে তিনি গণ্য হয়েছিলেন। ভুল বোঝাবুঝিটা হয়েছে সম্ভবত স্কুলের শেষের বছরে। পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার পদ্ধতিটা উল্টে নেওয়া হয়েছিল। গ্রেড সিক্স ছিল সবচেয়ে নিচে—গ্রেড ওয়ান সবচেয়ে ওপরে। উল্টে নেওয়ার ফলে গ্রেড সিক্স গেল ওপরে, গ্রেড ওয়ান এল নিচে। এই পাল্টাপাল্টিটা যারা জানে না, তাদের কাছে মনে হবে নিশ্চয় পরীক্ষায় ডাব্বা খেয়েছিলেন আইনস্টাইন। জুরিখের এনট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করেছিলে খুব সম্ভব ফরাসী ভাষায় ভীষণ কাঁচা ছিলেন বলে। আরও একটা কারণ থাকতে পারে, সেটা তাঁর বয়স। পরীক্ষায় বসার বয়স ছিল ১৮—উনি বসেছিলেন ১৬ বছর বয়সে।

প্রশ্ন : নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?

মা : ১৯২১ সালে পেয়েছেন। কিন্তু রিলেটিভিটি থিওরির জন্য নয়, বস্তুর রূপান্তরকরণ সিদ্ধান্তের জন্যেও নয়—বিশেষ বিশেষ ধাতুর গায়ে আলো পড়লে সেই ধাতু ইলেকট্রন বের করে দেয় কি ভাবে এবং কেন—এই ব্যাখ্যার জন্যে।

প্রশ্ন : রিলেটিভিটি থিওরির একটা হেঁয়ালি অঙ্ক বলে দেবে?

মা : বন্ধুদের বোকা বানাবি তো? শোন। দুটো রকেট আলোর গতিবেগের দশভাগের ন' ভাগ গতিবেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল স্পিডে মুখোমুখি ধেয়ে আসছে। তাদের রিলেটিভ স্পিড কত হবে? সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০+১,৬৭,৪০০=৩,৩৪,৮০০ মাইল কি? না। আলোর স্পিড যা, তার চাইতেও কম, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইলেরও কম!

প্রশ্ন : ওঁর একটা উক্তি শিখিয়ে দেবে?

মা : The most beautiful thing we can experience is the mysterious; রহস্যের অভিজ্ঞতাই আমাদের জীবনের সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা।

পরমাণু বোমা

প্রশ্ন : পরমাণু বোমা বানানোর আইডিয়া কি আইনস্টাইনের মাথায় সবার আগে এসেছিল?

মা : না। আইনস্টাইনের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটা প্রথমে ইউজিন ভিগনারের মাথায় আসে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে যদি একটু উসকে দেওয়া যায় যে, দুর্দান্ত একটা বোমা তৈরি করা সম্ভব মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম থেকে—তাহলে আর বাগড়া পড়বে না ইউরেনিয়াম বিভাজনের গবেষণায়।

প্রশ্ন : রুজভেল্টকে লেখা ঐতিহাসিক চিঠিটায় কিন্তু শুধু আইনস্টাইনের সই ছিল, তাই না?

মা : তা ছিল। ব্যাপারটা ঘটেছিল। এইভাবে: ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে যখন আমেরিকায় খবর এল যে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়াম পাচার বন্ধ করেছে হিটলারের বাহিনী, তখন অনেকেই ভাবলেন, বেলজিয়ামের ইউরেনিয়াম হিটলারের নজর থেকে বাঁচানো দরকার। পলিটিসিয়ানরা তখন ইউরেনিয়ামের গুরুত্বই বুঝতো না। অথচ বেলজিয়াম সরকারকে হুঁশিয়ার করা দরকার মার্কিন সরকারের মাধ্যমে। রুজভেল্টের টনক নড়ানোর জন্যে ব্যবহার করা হল আইনস্টাইনকে।

প্রশ্ন : আইনস্টাইন ব্যবহার করতে দিলেন নিজেকে?

মা : উনি তখন পরমাণু-বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। সেরকম বিশদ খবরও রাখতেন না—বিশেষ করে পরমাণু-বিভাজনের বৃত্তান্ত। গরমের ছুটি কাটাচ্ছিলেন লং আয়ল্যাণ্ডে। লিও জিলার্ড আর ইউজিন ভিগনার সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ঠিক হল যে, বেলজিয়াম সরকারকে চিঠি লেখা হবে, মার্কিন সরকারকেও সমস্ত ব্যাপারটা জানানো হবে এবং রুজভেল্টকে লেখা চিঠির মুসাবিদা করে আনবেন জিলার্ড আর ভিগনার—আইনস্টাইন তাতে সই করে দেবেন। কিন্তু টেলর যে চিঠিটা পকেটে করে নিয়ে গেছিলেন, তাতে আগের আলোচনা ছাড়াও একটা বাড়তি অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন : চিঠিতে বাড়তি অংশ? কী সেটা?

মা : পরমাণু বোমা তৈরির সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দেওয়া হয়েছিল এবং 'বিশ্বাসভাজন' লোককে দিয়ে গবেষণা তদারকির কথা বলা হয়েছিল। না পড়েই সই করে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন। পরমাণু বোমা তৈরির

ব্যাপারে মার্কিন সরকারকে ইন্ধন জোগানো হল সেই প্রথম।

প্রশ্ন : আইনস্টাইন তো পরে জেনেছিলেন? অনুতপ্ত হননি?

মা : সারা জীবন অনুতাপ করেছেন ওই একটি সই্-এর জন্য। চিঠির তারিখ ছিল ২ আগস্ট, ১৯৩৯।

প্রশ্ন : রুজভেল্ট আইনস্টইনের চিঠি পড়ে কী করলেন?

মা : প্রথমে আমল দিতে চাননি। চিঠি নিয়ে গিয়েছিল ওঁর এক বিশেষ বন্ধু। তাঁর নাম আলেকজাণ্ডার স্যাক্স। তিনিই শেষ পর্যন্ত কথার জাল বিছিয়ে রুজভেল্টকে পথে আনেন। সহমত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হুকুম দিয়েছিলেন রুজভেল্ট—ইউরেনিয়াম বিভাজন গবেষণায় যেন সাহায্য করা হয়, আর পরমাণু বোমা তৈরির সম্ভাবনাটা যেন মাথায় রাখা হয়।

প্রশ্ন : কিন্তু বোমাটা হিরোশিমায় ফাটিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হল কেন? জাপানীরা কি গিনিপিগ?

মা : হিরোশিমার বোমা তো প্রথম এক্সপেরিমেন্ট নয়। প্রথম পরমাণু বোমা ফাটানো হয় নিউ মেক্সিকো-তে আলবুকার্কের ১২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মরু অঞ্চলে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু একটা ইস্পাতের ফ্রেমের ওপর। তারিখটা ছিল ১৬ জুলাই, ১৯৪৫; বিস্ফোরণের সাঙ্কেতিক নাম TRINITY.

প্রশ্ন : কোথায় তৈরি হয়েছিল প্রথম পরমাণু বোমা?

মা : একটা বোর্ডিং স্কুলে। নিউ মেক্সিকোর 'লস অ্যালামোস'-এ সাত হাজার ফুট উঁচুতে ছিল এই স্কুল। বেশ ফাঁকা জায়গা। পরমাণু-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার কিছু দিন পড়াশুনা করেছিলেন বিলক্ষণ নিরিবিলি এই জায়গায় এবং মতলবটা এল তাঁরই মাথায়। ভিড়ের মধ্যে বোমা বানানো তো ঠিক নয়। হুকুম দিলেন সামরিক বিভাগের কর্তা। উঠে গেল স্কুল। ফাকা বাড়িতে শুরু হল বোমা তৈরির কাণ্ডকারখানা। বৈজ্ঞানিকদের প্রত্যেককে 'মিস্টার' বলে ডাকা হত—ডক্টর বা প্রফেসর নয়—পাছে কেউ সন্দেহ করে বসে যে, নিরালা অঞ্চলটায় হঠাৎ এত বৈজ্ঞানিক জুটল কেন? গোটা বোমাটাকে কিন্তু সেখানেও বানানো হয়নি। টুকরোগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটা গোপন জায়গায়। সেখানেই আস্ত বোমা তার আসল চেহারা ধারণ করে। সেখান থেকে ফের তাকে লুকিয়ে চুরিয়ে পাঠানো হয় মরু অঞ্চলে—ইস্পাতের টাওয়ারের ওপর।

প্রশ্ন : ফেটেছিল কী প্রথম পরমাণু বোমা?

মা : শুধু ফাটেনি, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ সম্পর্কে এতদিন কাগজে যে-সব হিসেব করা হয়েছিল—সমস্ত নস্যাৎ করে দেয়। ওপেনহাইমার অবশ্য বিলক্ষণ সন্দেহের মধ্যে ছিলেন—বোমা আদৌ ফাটবে তো? ভোর সাড়ে পাঁচটায় কনকনে ঠাণ্ডায় ফাটল বোমা। কালো চশমা পরে নিয়েছিলেন প্রত্যেকেই। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই দু-চোখের দৃষ্টি উড়ে গেল সেকেণ্ড দু-তিনের জন্যে। ঠিক তার আগেই অকস্মাৎ একদম সাদা হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল দূরের পাহাড় আর আকাশকে। নীলাভ সেই সাদা দুতিকে দুপুরের গনগনে রোদ বলাই সঙ্গত। আধ মিনিট যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেল ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য—কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল রক্ত-জল-করা বিরামবিহীন অমানুষিকী গজরানির পর গজরানি। বিস্ফোরণের ঝলক ঠিকরে গেল ১২৫ মাইল দূরে।

প্রশ্ন : খুশি হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?

মা : দিন আষ্টেক পরে (২৪ জুলাই) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলেছিলেন স্তালিনকে—যুদ্ধ জেতবার মত সাংঘাতিক অস্ত্র রয়েছে আমাদের হাতে।...স্তালিন অত না বুঝেই বলেছিলেন—তাহলে সে হাতিয়ার লাগান জাপানে।...ট্রুম্যান আর কথা বাড়াননি।

প্রশ্ন : জাপানে পরমাণু বোমা ফেলা হল বুঝি এই কারণেই?

মা : আরে না। ১৯৪৪-এর শেষের দিকে জার্মানরা তো হারতেই চলেছিল—অ্যাটম বোমা দিয়ে মহাপ্রলয় না ঘটলেও যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আমেরিকার মিলিটারি-কর্তা জেনারেল গ্রোভস চেয়েছিলেন, তার আগেই বোমা বানাতে। জামান পরমাণু-বিজ্ঞানীদের আটকে রাখা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের একটা পেল্লায় পোড়াবাড়িতে। ঠিক হয়েছিল, জাপানের এমন একটা জায়গায় বোমার রুদ্ররোষ দেখানো হবে যেখানে গিজগিজ করছে লোক। হিরোশিমা, কোকুরা আর নিগাতা—বাছা হয়েছিল এই তিনটি শহরকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা আর হয়নি। সুতরাং কী কারণে পরমাণু বোমার আবির্ভাব ঘটেছিল ঘন লোকবসতির ওপর, তা আঁচ করে নে।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, পরীক্ষামূলক বোমা ফাটিয়ে জাপানকে কজায় আনাও তো যেত?

মা : ঠিক এই কথাই বলেছিলেন জিলার্ড—যিনি আইনস্টাইনের সই জোগাড় করে প্রথমে মদত দিয়েছিলেন রুজভেল্টকে। এখন তিনিই উল্টো গান গেয়ে গেলেন। রুজভেল্টকে লিখলেন, বোমাটা জাপানে না ফাটিয়ে ফাটানো হোক একটা পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে। এক বোমার ধমকেই যুদ্ধের নেশা ছুটে যাবে জাপানের—সুড় সুড় করে আত্মসমর্পণ করবে। চিঠিখানা পৌঁছোললা রুজভেল্টের টেবিলে—কিন্তু পড়বার সুযোগ আর পেলেন না—ডাক এল পরপার থেকে (১২ এপ্রিল, ১৯৪৫)। নতুন প্রেসিডেন্ট টুম্যান কিন্তু বোমা গবেষণা শিকেয় তুলে রাখার মত মনের জোর দেখাতে পারলেন না। অনেক বৈজ্ঞানিকও তখন বোঝেননি, বোমা ফাটলে কী ঘটবে। মুখ বুঁজে থেকেছেন অনেকে, অনেকে বলেছেন—বিজ্ঞানের কৌতূহল মেটাতে গেলে যে কোনও দামই দেওয়া উচিত। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, বোমার সঙ্গে প্রচার-পুস্তিকাও ছড়িয়ে দেওয়া হোক আকাশ থেকে—সাধারণ মানুষ যেন তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকে। জেনারেল গ্রোভস্ অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের সামনেই বলেছিলেন—যদ্দুর জানি, তেজস্ক্রিয় রশ্মির ফলে মৃত্যু বড় আরামের!

প্রশ্ন : জার্মান বৈজ্ঞানিকদের আটকে রাখা হয়েছিল কেন, মা?

মা : ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে জার্মানির পরমাণু-গবেষণা কেন্দ্রের ঘাঁটি দখল করে মিত্রশক্তি। বোমা তৈরির ব্যাপারে জার্মান বৈজ্ঞানিকরা কতটা এগিয়েছে, তা জানার জন্যে কাগজপত্রও পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের পোড়া বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল নিশ্চয় তাঁদের ঠুঁটো করে রাখার জন্যে। ওই বাড়িতে সেই জার্মান বৈজ্ঞানিকরা রেডিওতে শুনলেন, সকালে বোমা পড়েছে হিরোশিমায়। মারাত্মক মানসিক চোট পেলেন অটো হান্—দায়ী মনে করেছিলেন নিজেকে—দিন রাত তাঁকে চোখে চোখে রাখা হয়েছিল—যাতে আত্মহত্যা না করতে পারেন

প্রশ্ন : জার্মান বৈজ্ঞানিকরা কি বোমা বানাতে পারতেন?

মা : কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধের সময়ে ওঁরা ইচ্ছে করেই পরমাণু বোমা তৈরি করার চেষ্টা করেননি। চেষ্টার ভান করেছিলেন হিটলারকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। দেশকে ভালবাসতেন এঁরা—আরও ভালবাসতেন মানুষকে। এটা অবশ্য অনুমানের কথা। যুদ্ধশেষের আগে সত্যিই জামান বৈজ্ঞানিকরা অ্যাটম বোমা বানাতে পারতেন কি না—সেটা বাদানুবাদের ব্যাপার।

প্রশ্ন : কোন্ বোমাটা বড়? হিরোশিমার না, নাগাসাকির?

মা : নাগাসাকির—প্লুটোনিয়াম বোমা। সাঙ্কেতিক নাম 'ফ্যাট ম্যান'; লম্বায় সাড়ে দশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট; ওজনে সাড়ে চার টনের একটু বেশি; শক্তিতে ২২ কিলো টন TNT-র সমান। তবুও ক্ষতি হয়েছে কম—খুব

সম্ভব একটু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল বলে। তার তিন দিন আগে হিরোশিমায় পড়ে যে ইউরেনিয়াম বোমা—তার সাঙ্কেতিক নাম 'লিটল বয়'—লম্বায় ছিল দশ ফুট; চওড়ায় দু ফুট চার ইঞ্চি, ওজনে চার টনের একটু বেশি। শক্তিতে ১৬ কিলো টন—কেউ বলেন সাড়ে বারো টন TNT-র সমান। ক্ষয়ক্ষতি স্তম্ভিত করে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষকে।

প্রশ্ন : হিরোশিমায় ক্ষয়ক্ষতির অনেক রকম রিপোর্ট শুনেছি। ভুক্তভোগীর কথা জানো?

মা : তার নাম মিসেস ফুতাবা কিতায়ামা, বয়স তেত্রিশ। বোমা বিস্ফোরণ তিনি দেখেছেন—কিন্তু মরেননি। পাঁচ বছর পরে বলেছেন: যাচ্ছিলাম কাজে—দল বেঁধে মেয়েরা জুরুমি সেতু পেরোচ্ছি—এমন সময়ে শত্রুদের একটা প্লেন উড়ে এল মাথার ওপরে। পাশের মেয়েটি 'প্যারাসুট' বলে চেঁচাতেই আমি সেদিকে ঘুরে গিয়ে দেখলাম একটা প্রলয়ঙ্কর আকাশভরা ঝলক। বিস্ফোরণের শব্দটাও তক্ষুনি শুনেছিলাম কিনা মনে নেই।... পৃথিবী ধসে পড়ল আমার ওপর...উঠলাম...বাতাসে ভয়াবহ গন্ধ...কোমরের তেনুগুই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতেই মুখের চামড়া উঠে এল...হাতের চামড়া খুলে গেল...কনুই থেকে আঙুলের ডগা অবধি পুরো চামড়া দস্তানার মত খুলে এল।...আকাশ ছিল নীল...এখন কালো...নদীতে অসংখ্য লোক দাপাচ্ছে...যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে...মরা কুকুরের মত মানুষ ভাসছে...ঠিক যেন বৌদ্ধ নরক-দৃশ্য!...ঘন্টা দুই ঘুরলাম...হাত দুটো থেকে হলদে পুঁজ বেরোচ্ছিল...স্কুলের রক্তাক্ত ছেলেমেয়েদের ছটফটিয়ে মরতে দেখলাম...গোটা হিরোশিমা জ্বলছে...জ্বলছে আতাগো জেলা পর্যন্ত...কুড়ি দিন পরে ফিরে পেলাম দৃষ্টিশক্তি...এখন আমার বাঁ কান অর্ধেক ছোট, বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল গলে গিয়ে জুড়ে গেছে...রক্তলাল পটি আমার মুখে, গালে, হাতে, আঙুলে...বিকৃত হয়ে গেছি চিরকালের মত!

প্রশ্ন : পরমাণু বোমার সঙ্গে রাসায়নিক বোমার মূল তফাতটা কোথায়, মা?

মা : পরমাণু বোমায় বেরোয় মারাত্মক গামা রশ্মি আর নিউট্রন—যা রাসায়নিক বোমায় হয় না—তা সে যত প্রকাণ্ডই হোক না কেন।

প্রশ্ন : তফাত কি গামা রশ্মি আর নিউট্রনের মধ্যে?

মা : গামা রশ্মি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ, নিউট্রন নিউক্লীয় কণিকা। প্রথমটাকে দেখতেই পাবি না—দ্বিতীয়টাকে কল্পনার চোখে আবছা ছোট্ট আকারে ভাবতে পারবি। দুটোই প্রাণঘাতী। নিউট্রন বিদ্যুৎহীন কণিকা বলে যে-কোন বস্তুর ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার ঢের বেশি। নিউট্রন দিয়ে অন্য পরমাণুদের চোট মেরে বিস্তর তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি করা যায় এবং যাচ্ছেও।

প্রশ্ন : পরমাণু বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা জায়গা বিশেষে কি কমে বাড়ে?

মা : ভাল প্রশ্ন। ধ্বংস করার ক্ষমতা নির্ভর করে কোথায় ফাটানো হবে তার ওপর। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে যদি মাটি থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে ফাটানো হয়; আরও চার ভাবে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে—দশ হাজার ফুট উচ্চতার ওপরে, মাটির তলায়, জলের ওপরে।

প্রশ্ন : জলের তলায় বিস্ফোরণে নিশ্চয় ক্ষতি কম হয়?

মা : যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞরা ঠিক উল্টো মনে করেন। জলের মধ্যে ঘাত-তরঙ্গ অনেক বেশি বিধ্বংসী—ছুটে যায় অনেক দূর। কিছু পরীক্ষার ফল নাকি গোপন রেখেছে মার্কিন মহল।

প্রশ্ন : জলের তলায় বিস্ফোরণের ফলাফল?

মা : দশটা জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। বিপুল পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছিল; ঘাত-তরঙ্গ আর গ্যাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় কোটি কোটি টনের একটা ফেনাময় অর্ধগোলক শূন্যে ঠেলে উঠে লোমহর্ষক দৃশ্য সৃষ্টি করে ফের আছড়ে পড়েছিল; জলস্তম্ভ ঠেলে উঠেছিল এক মাইল উঁচুতে। যদ্র জানা গেছে, গামা রশ্মি আর নিউট্রনের বিশেষ ভূমিকা থাকে না জলের তলার বিস্ফোরণে। প্রথম জলতল বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ২৪ জুলাই, ১৯৪৬—বিকিনি থেকে তিন মাইল দূরে জলের ৯০ ফুট গভীরে—৭০০০ ফুট উঁচু থেকে টুপ করে জলে ফেলা হয়েছিল সেই বোমা—ফেলেছিল আমেরিকা।

প্রশ্ন : জলের ওপর রেখে বোমা ফাটিয়ে কি দেখা গেছে?

মা : ৭৩টা মানুষশূন্য জাহাজ ছিল কাছে—ডুবে যায় দুটো। প্রথম এই পরীক্ষা চালায় আমেরিকা—৩০ জুন, ১৯৪৬—প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি উপহ্রদের ৫২০ ফুট ওপরে।

প্রশ্ন : মাটির তলায় প্রথম বোমা ফাটিয়েছিল কে?

মা : আমেরিকা—নেভাদায় ২৯ নভেম্বর ১৯৫১-এ। ৮০০ ফুট ব্যাসের ১০০ ফুট গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেছিল। অনেকের ভয় ছিল, পাতাল-বিস্ফোরণ নিশ্চয় বাড়তি ভূমিকম্পের জোগান দিয়ে যাবে—কিন্তু তা হয়নি।

প্রশ্ন : মাটির ওপর রেখে ফাটালে ক্ষতি তো বেশি হওয়া উচিত?

মা : বরং কম হয়। এই ভেবেই হিরোশিমা-নাগাসাকিতে উঁচুতে শূন্যপথে ফাটানো হয়েছিল করাল বোমাকে। এক মেগাটন বোমার ঝোড়ো হাওয়া পাঁচ মাইল দূরের মানুষকেও তুলে আছড়ে ফেলতে পারে। বিস্ফোরণের ৫০ সেকেণ্ড পরে, মানে এক মিনিটও লাগে না—ঘাত-তরঙ্গ ধেয়ে যায় ১২ মাইল দূরে।

প্রশ্ন : পরমাণু বোমা ধ্বংস করে কী ভাবে?

মা : চারটে কারণে। এক, খুব অল্প জায়গার মধ্যে এবং অকল্পনীয় কম সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি হয়ে গিয়ে জন্ম দেয় একটা আগুনের গোলার—যা গ্যাস আর বাতাস থেকে তৈরি। ভয়ানক বেগে বেড়ে যেতে থাকে এই অগ্নিগোলক, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় সেই ফায়ারবল-এর বিধ্বংসী ক্ষমতা। দুই, গামা রশ্মি আর নিউট্রনের বিকিরণ। দুটোই কঠিন বস্তুকে অনায়াসে ফুঁড়ে যায়—ক্ষমতায় এক্স-রশ্মির চাইতেও বেশি যায়। জীবদেহের পক্ষে দুটোই ভয়ানক ক্ষতিকর। তিন, ঘাত-তরঙ্গ বা শক-ওয়েভ। বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে দেয়, মানুষের পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিতে পারে। শব্দের গতিবেগকে টেক্কা মেরে কিছু ধেয়ে গেলেই বাতাসে যে ঢেউ ওঠে তারই নাম ঘাত-তরঙ্গ। যেমন ঘটে সুপারসোনিক এরোপ্লেনে। চার, দ্রুত-তেজস্ক্রিয় বিস্তর পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে আসে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বিভাজনের পর। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই পদার্থগুলো কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয়—এদের অর্ধায়ু কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ব্যাঙের ছাতার মত মেঘের রাশি কীভাবে গড়ে ওঠে?

মা : হু-হু করে বাড়তে থাকে ফায়ারবল, তারপর ওপর দিকে উঠতে থাকে গরম গ্যাসবেলুনের মত—পাশের ঠাণ্ডা বাতাস আর ধুলো টেনে নিয়ে তৈরি করে নেয় মেঘের থাম। মাইল কয়েক ওপরে উঠে আরও ঠাণ্ডা হয়ে ঊর্ধ্বগতি বন্ধ রেখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। কিন্তু মেঘদেহী থামের মধ্যে বিস্তর তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকায় আবার তা গরম হয়—আর একটা থাম উঠে যায় ব্যাঙের ছাতার মত মেঘরাশির মাথা ফুঁড়ে।

প্রশ্ন : দুটো থাম পর-পর! কত উঁচুতে ঠেলে ওঠে, মা?

মা : নাগাসাকি এবং হিরোশিমায় শেষ পর্যন্ত ৭/৮ মাইল উঠেছিল। মেগাটন বোমা ফাটালে ধোঁয়া আর মেঘের থাম উঠে যাবে দশ থেকে তেরো মাইল পর্যন্ত।

প্রশ্ন : নিরীহ পরমাণু আচমকা কালান্তক হয়ে ওঠে কী ভাবে?

মা : ইউরেনিয়াম বিভাজনের কথাই বলি। পারমাণবিক ক্রিয়াকাণ্ড ধারণাতীত দ্রুত বলেই এমনটা ঘটে। কত দ্রুত? এক কেজি ইউরেনিয়ামের বিভাজন হতে মোটামুটি ০.০০০০১ সেকেণ্ড সময় লাগে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ 'যদি' ইউরেনিয়াম^{235} হয়, তাদের এক জায়গায় জড়ো করে 'যদি' বিভাজন চালানো যায়—কর্ম সমাপ্ত হয়ে যাবে এক সেকেণ্ডেই।

প্রশ্ন : হাইড্রোজেন বোমার কারিগরি কি একই ব্যাপার?

মা : সাধারণ পরমাণু বোমার ভারি বা বড় আকারের পরমাণু কেন্দ্রকে ভেঙে অনেকগুলো টুকরো করে বিপুল শক্তি মুক্ত করে দেওয়া হয়; হাইড্রোজেন বোমায় ঘটে ঠিক তার উল্টো—অনেকগুলো হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রকে গলিয়ে একত্র করে। সূর্যের শক্তির মূলে চলেছে একই ব্যাপার।

প্রশ্ন : সূর্যের শক্তির উৎস হাইড্রোজেন বোমা?

মা : হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের কায়দাকানুন সেখানেও চলেছে—অর্থাৎ হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রদের সংযোজন হয়ে চলেছে। একই কাণ্ড ঘটছে সব নক্ষত্রদের কেন্দ্রে। পৃথিবীতেও এই ব্যাপার ঘটানো যায় কিনা ভাবতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বানিয়েছেন হাইড্রোজেন বোমা।

প্রশ্ন : খোদার ওপর খোদকারি হয়ে গেল না?

মা : প্রায় তাই। মানুষের হাতে গড়া দৈত্য হাইড্রোজেন বোমায় সংযোজন-ক্রিয়া অনেক বেশি দ্রুত-সূর্যের বা অন্য নক্ষত্রদের কেন্দ্রের চাইতে।

প্রশ্ন : সূর্যের কেন্দ্র কতটা গরম?

মা : মোটামুটি দু-কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

প্রশ্ন : হাইড্রোজেন বোমা কি বেশি ক্ষতি করে?

মা : এই বোমা থেকে যে নিউট্রন বেরোয়, তা পরমাণু বোমার নিউট্রনের চেয়ে তিন গুণ বেশি পালোয়ান। এই জন্যেই মিলিটারির মানুষরা হাইড্রোজেন বোমা বেশি চায়।

প্রশ্ন : হাইড্রোজেন বোমাকে মিলিটারির বেশি পছন্দ কেন?

মা : ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে অনেকদূরের ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় বলে। হাল্কা আর অল্পশক্তির হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে কলকারখানা সেভাবে ধ্বংস করা না গেলেও এন্তার মানুষ খুন করা যায়—তাই মানুষ-বধের লড়াইয়ে এ-বোমার এত কদর। খুনীর ভূমিকায় থাকে মারণ নিউট্রন।

প্রশ্ন : নিউট্রন বোমা কাকে বলে?

মা : হাইড্রোজেন বোমাকে। এ-বোমার স্রষ্টা এডোয়ার্ড টেলর অবশ্য বলেন—ফিটফাট বোমা! আরও সঠিক নাম, Enhanced Radiation Weapon।

প্রশ্ন : কদর্য এই হাইড্রোজেন বোমা প্রথম কোথায় ফেটেছিল?

মা : কদর্যই বটে! মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে ফাটিয়েছিল আমেরিকা ১ নভেম্বর, ১৯৫২-তে বিস্ফোরণের সাঙ্কেতিক নাম MIKE। বিশ ফুট উঁচু থামের ওপর রেখে পরখ করা হয়েছিল হিরোশিমার বোমার চাইতে ৬০০ গুণ বেশি শক্তিশালী এই মহাখুনীকে।

প্রশ্ন : পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের শক্তি কতখানি হয়, মা?

মা : বেরিয়ে আসা পুরো শক্তি প্রথমে বাতাসের একটা ছোট্ট গোল মত অঞ্চলে জড়ো হয়—সেখানকার তাপ আর চাপ তখন সূর্যের কেন্দ্র অঞ্চলের সমান হয়ে দাঁড়ায়। একটা তুলনা দিচ্ছি। তিন কোটি গ্যালন পেট্রল 'নিমেষ মধ্যে' পুড়িয়ে যে শক্তি পাবি—তা এক মেগাটন বোমা শক্তির সমান। মাত্র কয়েক ঘনফুট জায়গায় সূর্যের জঠর তখন অবতীর্ণ হয় পৃথিবীতে। কয়েক মিলি সেকেণ্ডের মধ্যেই তা নেমে আসে কয়েক লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। তাপরশ্মি মানুষ বা প্রাণীর চামড়ায় উল্কিও এঁকে দিয়ে যায়।

প্রশ্ন : উল্কি? পরমাণু বোমা উল্কি আঁকে?

মা : একটা ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল রেলিং-এর কাছে। তার চামড়া পুড়ে যায়। কিন্তু রেলিং-এর ছায়া শরীরে পরিষ্কার আঁকা হয়ে যায়, মানে, ওই ছায়ায় তার চামড়া পোড়েনি। একটা মেয়ে কিমোনো পরেছিল—চামড়া পুড়ে গেলেও কিমোনোর গাঢ় রঙের ডিজাইন চামড়ায় পাকাপাকি উল্কি এঁকে দিয়ে যায়। তাপরশ্মিতে সবচেয়ে ক্ষতি হয় চোখের।

প্রশ্ন : পরমাণু বোমার প্রলয়লীলার ফল তো অনেক পরেও টের পাওয়া যায়?

মা : প্রথম পরমাণু বোমা 'ট্রিনিটি' বিস্ফোরণের পর ২৫/৩০ মাইল দূরে গরুদের পিঠে পড়েছিল তেজস্ক্রিয় ধুলো। লোমে আটকে থাকা সেই ধুলো পিঠের লোম উঠিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে ঘা হয়ে যায় চামড়ায়। প্রায় হাজার মাইল দূরে একটা চাষের মাঠে বৃষ্টির সঙ্গে নেমেছিল তেজস্ক্রিয় ধুলো। সেখানকার ফসলের খড় থেকে প্যাকিং-এর কাগজ বানিয়ে ফটো-প্লেট মুড়ে রেখেছিল একটা কোম্পানি। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্লেটগুলো—তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্যে। বিকিরণের শিকারের ক্যান্সার অথবা বংশগত বিকৃতি দেখা দিতে পারে—তাঁর না হলেও কয়েক প্রজন্মের বংশধরদের হতে পারে। নিউট্রনের একটা অংশ বাতাসের নাইট্রোজেনকে চোট মেরে তেজস্ক্রিয় কার্বন বানিয়ে নেয়—যে-কার্বনের অর্ধায়ু প্রায় ৬০০০ বছর। এক লক্ষ বছরের বেশি বছর বজায় রাখতে পারে নিজের অস্তিত্ব। প্রতি দশ মেগাটন বিস্ফোরণে যে তেজস্ক্রিয় কার্বন তৈরি হবে, তার কুপ্রভাবে বিকৃত দেহ বা বুদ্ধি নিয়ে জন্মাবে ১৫,০০০ শিশু। এ হিসেব বৈজ্ঞানিক লিনাস পলিং-এর।

প্রশ্ন : তাহলে তো গোটা পৃথিবীর সব প্রাণীরাই বিপদে পড়বে?

মা : নিশ্চয়। মাটি থেকে দশ আর কুড়ি মাইলের মধ্যে রয়েছে ওজোন গ্যাসের একটা স্তর। সূর্যের ক্ষতিকর আলট্রা-ভায়োলেট রে-কে শুষে নিয়ে এই স্তর বাঁচাচ্ছে প্রাণী জগতকে—বিশেষ করে আমাদের চোখকে। দশ হাজার মেগাটনের বিস্ফোরণে উত্তর গোলার্ধের ওজোন স্তরের আশি ভাগ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : সর্বনাশ! তাহলে তো পৃথিবীতে সবাই অন্ধ হয়ে যাবে!

মা : বেশির ভাগ প্রাণীকে অন্ধ করার জন্যে ওজোন-স্তর কুড়ি শতাংশ ক্ষীণ হয়ে গেলেই তা হবে।

প্রশ্ন : পরমাণু বোমার ট্রিগার কে?

মা : এই মস্ত সমস্যাটার সুরাহা হয়েছে এই ভাবে। প্লুটোনিয়াম বা ইউরেনিয়ামকে গোলবলের আকারে না নিয়ে গোলকের খোলসের আকারে নেওয়া হয়। দারুণ শক্তিমান রাসায়নিক বিস্ফোরকরা ঘিরে থাকে এই খোলসকে। ইলেকট্রনিক সিসটেমে একই সঙ্গে 'জ্বালিয়ে' দেওয়া হয় বিস্ফোরক-খোলসকে। ঠিক যেন বিস্ফোরক-লেন্স দিয়ে বোমার জ্বালানিকে জড়ো করা হল আরও ছোট্ট জায়গায়, তখন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ তৈরি হয়, প্রায় এক কোটি পাউণ্ড। এবার বল, কে সেই ট্রিগার?

প্রশ্ন : ভবিষ্যতের মহাযুদ্ধে পরমাণু বোমা ফাটানো হবে?

মা : যদিও হয়, কম শক্তির বোমা বেশি সংখ্যায় ব্যবহার করা হতে পারে। আধুনিক পরমাণু বোমার কাজ-কারবার সম্বন্ধে আমরা সব কিছু জেনে বসে আছি—এটাও তো ঠিক নয়। ওরা যে কী করতে পারে, সে সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট আন্দাজ করা বিলক্ষণ কঠিন। বহু পরমাণু-বিশেষজ্ঞ মনে করেন, শক্তিমান দেশগুলোয় রীতিমত উন্নত এমন সব বোমা আছে যা ফাটিয়ে পরীক্ষা করাও হয়নি—হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ার ভয়ে।

প্রশ্ন : এত শক্তি পরমাণুর? খুব নিরেট বুঝি?

মা : ঠিক উল্টো। একটা পরমাণু-কেন্দ্র যদি ফুটবলের আকারের হত, তাহলে তাকে ঘিরে চর্বিপাক দেওয়া সবচেয়ে কাছের ইলেকট্রনটা থাকবে কয়েক মাইল দূরে। তার মানে এই: পরমাণুর বেশির ভাগ অঞ্চলই ফাঁকা—বস্তু নেই সেখানে।

পরমাণু
বোমা

আকাশের দৈত্য

প্রশ্ন : দৈত্যদের গল্প জানো?

মা : জানি। লাল দৈত্য, সাদা দৈত্য আর কালো দৈত্য থাকে আকাশে...

প্রশ্ন : তবে যে সেদিন বলেছিলে, রূপকথায় সত্যি গল্প নেই?

মা : এই দৈত্যদের জন্ম হয় আকাশে—সূর্যর মত নক্ষত্রদের শেষের অবস্থায়—ব্ল্যাক হোল হয়ে যাওয়ার আগে।

প্রশ্ন : কীভাবে?

মা : সূর্যের কথা বলা যাক। সূর্য একটা নক্ষত্র। প্রতি সেকেণ্ডে ৬০০,০০০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম হাইড্রোজেনকে ভেঙেচুরে ৫৯৫,৮০০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম হিলিয়াম তৈরি করছে। হাইড্রোজেন যখন ফুরিয়ে যাবে, ভারি হিলিয়াম জমা হবে সূর্যের ঠিক মাঝখানে। গ্র্যাভিটেশনের টান আরও বাড়বে। মাঝখানটা আরও গরম, আরও ঘন হবে। উত্তাপ তেড়েফুঁড়ে বেরোতে চাইবে—বাড়তি উত্তাপের গলাধাক্কা খেয়ে সূর্যের বাইরের অংশ অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। বাইরের টেম্পারেচার কমে যাবে অনেকখানি জায়গা নিয়ে থাকার ফলে। এখন সূর্যের বাইরের দিকের তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তখন হবে ২৫০০। সূর্য তখন লালচে গোলা হয়ে থাকবে। নাম হবে, লাল দৈত্য।

প্রশ্ন : লাল দৈত্য সত্যি কি আছে আকাশে?

মা : Betelgeuse আর Antares তারা দুটোই লাল দৈত্য।

প্রশ্ন : কতখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে যাবে সূর্য?

মা : মঙ্গল আর শুক্র—এই দুটো গ্রহকে গিলে নেবে। পৃথিবীতে তখন থাকা যাবে না। তদ্দিনে অবশ্য মানুষ অন্য গ্রহে পালিয়ে যাবে, অথবা কৃত্রিম কলোনী বানিয়ে মহাশূন্যে ঘরসংসার করবে।

প্রশ্ন : যে দুটো লাল দৈত্যের নাম করলে, তাদের একজনও যদি সূর্যের জায়গা দখল করে?

মা : Antarcs এত বড় যে সূর্যের জায়গা নিলে সে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গলকেও গিলে নেবে।

প্রশ্ন : লাল দৈত্য সূর্যের সব হাইড্রোজেন যখন ফুরিয়ে যাবে?

মা : তখন কাঁড়ি কাঁড়ি হিলিয়ামের ওপর গ্র্যাভিটেশনের প্রচণ্ড চাপে আস্তে আস্তে তা লোহা হয়ে যাবে। নিউক্লিয়র রিঅ্যাশন শিকেয় উঠবে, এনার্জি আর বে বাবে না। গ্র্যাভিটেশন টানছে ভেতরের দিকে—এনার্জি ছুটছে বাইরের দিকে...এই লেন্স আর থাকবে না। জোরদার হবে গ্র্যাভিটেশন। ফুলে-ফেঁপে ওঠা সূর্য অথবা লাল দৈত্য তখন গুটোতে শুরু করবে। গুটোতে গুটোতে ব্ল্যাক হোল হয়ে যাওয়ার আগে হবে সাদা দৈত্য আর কালো দৈত্য। বামন অবস্থায় পৌছে বাইরের টেম্পারেচার একই রেখে দিয়ে সাদা হয়ে যাবে সূর্য—হবে টিমটিমে বেঁটে সাদা দৈত্য। তারপর একদিন সে-ও ঠাণ্ডা হতে থাকবে—সাদা আভা আর থাকবে না—হয়ে যাবে কালো দৈত্য।

প্রশ্ন; আবার বলি, সত্যিই কি আছে সাদা দৈত্য?

মা : Sirius B আর Procyon B—এই দুটো নক্ষত্রই সাদা দৈত্য।

প্রশ্ন : সূর্যের কাছে ক'টা সাদা দৈত্য আছে?

মা : সূর্যের কাছে প্রায় ৩৫ আলোকবর্ষ জায়গা জুড়ে যে ৩০০টা তারা রয়েছে—তার মধ্যে ৮টাই সাদা দৈত্য।

প্রশ্ন : এই গ্যালাক্সিতে মোট ক'টা আছে?

মা : প্রায় চার বিলিয়ন। মোট নক্ষত্রদের ২ থেকে ৩ শতাংশই তো সাদা দৈত্য।

প্রশ্ন : এত সাদা দৈত্য কেন হল, মা?

মা : কয়লা ফুরিয়ে গেলেই যেমন উনুন নিভে যায়, পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেও তেমনি সূর্য সাদা দৈত্য হয়ে যায়।

প্রশ্ন : সূর্য কবে নিভবে?

মা : সূর্যের জ্বালানি ফুরোতে কয়েক বিলিয়ন বছর লাগবে। এই গ্যালাক্সির ১৩৫ বিলিয়ন নক্ষত্র-র মাত্র চার বিলিয়ন তাদের জ্বালানির ভাঁড়ার শেষ করে দিয়ে সাদা দৈত্য হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আরও বেশি নয় কেন, মা?

মা : যে নক্ষত্র যত বড়, সে তত তাড়াতাড়ি লাল দৈত্য হওয়ার পর ধসে পড়ে। এটা তো ঠিক যে বড়রা সবসময়েই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে; ছোটদের মত গাদাগাদা দেখা যায় না, বা একই দলে পড়ে না। হাতিদের সংখ্যা কি মশাদের সংখ্যার সমান? বালিকণার চেয়ে পাহাড়ের সংখ্যা কি বেশি? গ্রহাণু বেশি না গ্রহ বেশি? বিশ্বসৃষ্টির সময়ে সবাই একভাবে তৈরি হয়নি—একই সময়েও হয়নি। নিশ্চয় নাবালক নইলে কোনকালে সাদা দৈত্য হয়ে যেত।

প্রশ্ন : Sirius B কি Sirius A নক্ষত্রর আগে তৈরি হয়েছিল?

মা : সুন্দর প্রশ্ন। একই সময়ে জন্মালেও, নিশ্চয় অতি পেল্লায় ছিল Sirius B—তাই গ্র্যাভিটেশনের টানে তাড়াতাড়ি জ্বালানি খতম করে দিয়ে সাদা দৈত্য হয়েছে, দোসর Sirius A এখনও গনগনে হয়ে রয়েছে। সাইজে সূর্যের ডবল, ডবল গরম, তিরিশ গুণ বেশি ঝকঝকে। সূর্যের জায়গায় বসলে Sirius A-র আঁচে পৃথিবীর সব সাগর শুকিয়ে যেত, পৃথিবী শ্মশান হয়ে যেত।

প্রশ্ন : তাহলে বলো, নক্ষত্রগুলো তৈরি হল কীভাবে?

মা : কসমিক এগ-এর বিস্ফোরণ থেকে।

প্রশ্ন : কসমিক এগ?

মা : কেউ বলেন আদিম পরমাণু, কেউ বলেন কসমিক ডিম। ব্রহ্মাণ্ড বললে ক্ষতি কী? প্রায় পনেরো বিলিয়ন বছর আগে নাকি এই ডিম ফেটে যায়। এই বিস্ফোরণকে বলা হয় 'বিগ ব্যাং'। বিগ ব্যাং-এর পর থেকে ধুলো, গ্যাস ইত্যাদি গ্র্যাভিটেশনের টানে জমাট বাঁধতে বাঁধতে জন্ম দেয় গ্রহ-নক্ষত্রদের। বিস্ফোরণের রেশ এখনও চলছে। নক্ষত্রগুলো তাই ক্রমশ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : বিগ ব্যাং! গ্যালাক্সিগুলোও দূরে সরে যাচ্ছে?

মা : হ্যাঁ। একদিন নাকি গ্র্যাভিটেশনের টানের সীমারেখায় পৌছোলে আবার নিজে থেকেই গুটিয়ে আসতে থাকবে। ফিরে আসবে কসমিক এগ-এর মধ্যে। তারপর আবার তা ফাটবে। অনন্তকাল ধরে চলবে এই খেলা। ৮০ বিলিয়ন বছরে একবার করে গড়ে উঠবে আর ফেটে যাবে কসমিক এগ। এরই নাম Oscillating Universe। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। তারকার প্রসারণ আর বিস্ফোরণ, নোভা আর সুপারনোভা, নিউট্রন আর পালসার—এবং ব্ল্যাক হোল...সবই আসছে আর যাচ্ছে কসমিক এগ-এর সৃষ্টি, বিস্ফোরণ এবং সঙ্কোচনের লীলাখেলার মধ্যে।

প্রশ্ন : সাদা বা লাল দৈত্য হতে গেলে তাহলে কি বয়সটাই বড় ব্যাপার?

মা : মোক্ষম প্রশ্ন। বয়সটাই আসল কারণ না। কারও জ্বালানি আগে পোড়ে কারও পরে, নাকি কারও জ্বালানি কম থাকে কারও বেশি—এই সব হেঁয়ালির জবাব দিতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা বর্ণালী শ্রেণীতে সাজালেন নক্ষত্রদের। ভাগ করা হল O,B,A, F,G,K আর M—এই ক'টা শ্রেণীতে। O শ্রেণীতে তারা-রা সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ঝকঝকে, সবচেয়ে গরম, M শ্রেণীর তারা-রা সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে কম ঝকঝকে, সবচেয়ে কম গরম। প্রত্যেকটা শ্রেণীর মধ্যে রইল 0 থেকে 9 পর্যন্ত ভাগাভাগি। অর্থাৎ শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত আরও দশটা শ্রেণী। আমাদের সূর্য পড়েছে G_2 গ্রুপে। মানে, বয়স অনেক কম।

প্রশ্ন : এরা কি সবাই সমান?

মা : কী করে হবে? আমাদের এই গ্যালাক্সির চার ভাগের তিন ভাগ তারা M শ্রেণীতে অথাৎ ছোট তারা-দের দলে পড়ে। বড়রা তাহলে দলে হাল্কা। বড় হওয়ার ফলে তাদের ফুরিয়ে যাওয়ার ঝোঁকটা বেশি। সাদা দৈত্যরা তাই সংখ্যায় কম—বয়সটা এক্ষেত্রে মূল ব্যাপার নয়।

M
O
F
M
B
F
F
M
F
G
O
G

ঘুম

প্রশ্ন : মাগো, আমি জেগে থাকতে পারি না কেন?

মা : ব্রেনের মধ্যে ঘুমপাড়ানি কোষগুলো জাগানি কোষদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বলে।

প্রশ্ন : কোথায় থাকে এই কোষগুলো?

মা : ব্রেনের নিচের দিকে। হাইপোথ্যালামাস অঞ্চলে। সামনের দিকে থাকে ঘুমপাড়ানি কোষের গুচ্ছ—সিকি ইঞ্চির মত জায়গা নিয়ে। ঠিক তার পেছনেই থাকে জাগানি কোষগুলো।

প্রশ্ন : এরা নিশ্চয় বিশেষ ধরনের কোষ?

মা : হ্যাঁ। ব্রেনের স্নায়ুকোষ। যাদের বলা হয় নিউরন। মাকড়শার মত দেখতে।

প্রশ্ন : ব্রেনকে চনমনে রাখে কি এরাই?

মা : ঘুমপাড়ানি-জাগানি চক্র হাত মেলায় ব্রেন-চনমনে ব্যবস্থার সঙ্গে। শেষের এই ব্যবস্থাটাও রয়েছে এক ধরনের স্নায়ুকোষদের খবরদারিতে। এরা থাকে মেরুদণ্ডের ওপর দিকে, ব্রেনের গোড়ায়। নিজেদের মধ্যে কাজের আলোড়ন ঠেলে ওপর দিকে তুলে দেয় ব্রেনের মধ্যে। দুই চক্র মিলেমিশে মগজ তরঙ্গদের ওঠায় আর নামায়।

প্রশ্ন : মগজের মধ্যে ঢেউ?

মা : হ্যাঁরে। ব্রেন ওয়েভই তো ব্রেনের ধূসর উপাদান অর্থাৎ কর্টেক্স থেকে ঠিকরে যাওয়া বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্ফোরণ। সবসময়েই হাজির রয়েছে এই বিস্ফোরণ।

প্রশ্ন : কেউ দেখেছে এই ঢেউ?

মা : ঘুমোলেই ঢেউগুলোর ভোল্টজ আর বারংবারতার হক পাল্টে যায়। গভীর ঘুমে একরকম, পাতলা ঘুমে আর একরকম। যেহেতু ঢেউগুলো ঘটছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির কমবেশি বিস্ফোরণের জন্যে, তাদের যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের বুকে আঁকা যায়। দেখা গেছে, ঘুমের এই ছবি বা ব্রেন ওয়েভ ছোটদেব ক্ষেত্রে আর বড়দের ক্ষেত্রে একরকম হয় না। আরও অদ্ভুত এই কারণে যে, কিছু বড়দের ঘুমের ব্রেন ওয়েভ ছোটদের ঘুমের ব্রেন ওয়েভের সমান। অর্থাৎ বুড়োবুড়িরাও কচিকাঁচাদের সমান হয়ে যাচ্ছে ঘুমিয়ে কাদা হলেই।

প্রশ্ন : দুম করে ঘুম আসে না কেন, মা?

মা : তিনটে ধাপ পেরোলে তবে টনটনে জাগরণ থেকে গভীর নিদ্রায় আসা যায়; ঢুলুনি, হাইতোলা, হাত-পা মেলে দেওয়া। প্রথম অবস্থায় কোনো ব্যাপারে মন সংযত করা ঝকমারি হয়ে দাঁড়ায়। ঘুম-ঘুম ভাব একই সঙ্গে গোটা শরীরটাকে অ্যাটাক করে না। প্রথমে পেশীগুলো ঝিমোবে, তারপর কানে শোনা আর চোখে দেখায় ঢিলেমি আসবে, সবশেষে চামড়ার অনুভূতি কমবে।

প্রশ্ন : কোন্ পেশি ঝিমোয় সবার আগে?

মা : পায়ের পেশি। তারপর ঝিমুনি উঠতে থাকে ওপর দিকে ধড়, বাহু, ঘাড়, সবশেষে চোয়াল আর মুখ বেয়ে। এই জন্যেই ঘুম পেলে পা যেন আর চলে না, কানে ভোঁ-ভোঁ শুনিস, চোখে ঝাপসা দেখিস, হাই তুলিস, পা ছড়িয়ে দিস, মাথা নাড়াস ডাইনে বাঁয়ে।

প্রশ্ন : ঘুম ভাঙলে কোন পেশি জাগে আগে?

মা : ঠিক উল্টো দিক দিয়ে। আগে মাথা ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখিস, পা নামাস সবার পরে। ধড়ফড় করে উঠে খাট থেকে নামতে গেলেই পা টলে যায় এই কারণেই—পা তো তখনো জাগেনি।

প্রশ্ন : ঘুম ঠেকিয়ে রাখা যায় কীভাবে?

মা : পেশিগুলোকে শক্ত করে রাখলেই ঘুমদেবী তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে দূরে। দূরপাল্লার ট্রাক ড্রাইভার, এরোপ্লেনের পাইলট, আর মিলিটারি গার্ডরা ইচ্ছে করেই হাত-পায়ের মাস্‌ল্ শক্ত করে রাখে এই কারণেই।

প্রশ্ন : ঘুমকে ডেকে আনার মন্ত্রটা তাহলে উল্টো?

মা : পেশি ঢিলে করলেই হল। আগে করতে হয় ঘাড়, চোয়াল আর মুখের পেশিদের।

প্রশ্ন : ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি কখন, মা?

মা : 'হিপনাগোগিক' স্টেজে। দুটো গ্রীক শব্দ : মানে, ঘুম আনা হচ্ছে। ঘুমের এই পর্যায় থাকে মাত্র মিনিট কয়েকের জন্যে। তখন ঘুম আসে দু-ভাগ, জেগে থাকি এক ভাগ। চিন্তাকে সচেতনভাবে চালনা করতে পারি না; অদ্ভুত আইডিয়াদের ভাসাভাসাভাবে মনে থাকে; স্বপ্নের আনাগোনা চলে এই সময়ে। কখনো সেই স্বপ্নের দৃশ্যকে বড় সত্যি বলে মনে হয়। তখন মতিভ্রম ঘটে—মরীচিকা দর্শনের মত অলীককে সত্যি বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : দিব্যদর্শন কি হিপনাগোগিক অলীক দর্শন?

মা : সম্ভবত তাই। ভূত দেখাও তাই। এই পর্যায়ের স্বপ্ন মনে থাকে। সত্যিকারের সৃষ্টিও যেন এই স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। বিখ্যাত গানের সুর, বেহালার সুর এই সময়ে স্রষ্টাদের মাথায় এসেছে।

প্রশ্ন : কুম্ভকর্ণের ঘুমটা তাহলে কি, মা?

মা : গভীর ঘুমের অবস্থা। হিপনাগোগিক ঘুমের পরেই কুম্ভকর্ণ ঘুম। তন্দ্রার পরেই নিদ্রা। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে সে ঘুম ভাঙাতে হয়। এই ঘুম চলে ঘণ্টা দুয়েক। তারপর তা পাতলা হয়ে আসে।

প্রশ্ন : ঘুমের এই সময়েই বুঝি সবাই এপাশ ওপাশ করে?

মা : হ্যাঁ। তবে সবচেয়ে কম নড়াচড়া হয় বসন্তকালে, সবচেয়ে বেশি শরৎকালে। কারণটা আজও অজানা।

প্রশ্ন : ঘুমোলে চোখের পাতা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে কেন?

মা : ঘুমোনোর দু ঘন্টা পর থেকে শুরু হয় এই কাঁপুনি। স্বপ্নদর্শন ঘটে তখন। সেই সময়ে হঠাৎ ঘুম থেকে তুলে দিলে স্বপ্নের কথা বলা যায়—নইলে মনে থাকে না। একেই বলে REM ঘুম, অথাৎ Rapid Eye

Movement ঘুম। পাখি, কুকুর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে। তার মানে, তারাও তখন স্বপ্ন দেখে।

প্রশ্ন : নাক ডাকে কেন?

মা : নাকের ফুটো আর মুখবিবর ঘিরে যে নরম গড়ন আছে, সেগুলো কাঁপে বলেই নাক ডাকে—বিশেষ করে মুখের তালু কাঁপে বলে। সাধারণত তখন মানুষটার মুখ খোলা থাকে—চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। কখনো তাও হয় না। অ্যালার্জির আক্রমণে নাক আর গলার ঝিল্লী ফুলে গেলে নাক ডাকে।

প্রশ্ন : ঘুমোলে মুখ লালচে দেখায় কেন?

মা : চামড়ার দিকে বেশি রক্ত ছুটে যায় বলে। রক্ত বেড়ে যায় মগজেও।

প্রশ্ন : রাত্রে কম খাওয়ার সঙ্গে ঘুমের কি সম্পর্ক?

মা : ভেতরকার দেহ যন্ত্রগুলোয় রক্তের জোগান কমে যায় ঘুমোলে। তখন তাদের ওপর খাবার হজম করার চাপ কমিয়ে দিলে হজম ভাল হয়, ঘুমও গভীর হয়। শরীরের চাহিদা তো তখন কমে যায়।

প্রশ্ন : হঠাৎ জাগলে বুক ধড়ফড় করে কেন?

মা : নাড়ির গতি কমে যায়, রক্তের চাপ কমে যায় ঘুমের প্রথম দিকে—তারপর একটু বাড়ে—কিন্তু জেগে থাকা অবস্থায় যে রক্তের চাপ, সে রকম হয় না। ব্যতিক্রমও আছে। পেশির কাজের স্বপ্ন দেখলে রক্তচাপ স্বাভাবিকেরও বেশি হয়ে যায়। তখন আচমকা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে ঝাঁ করে চড়ে যায় ব্লাডপ্রেসার। বুড়ো মানুষদের ক্ষেত্রে তখন হার্ট অ্যাটাক ঘটে যেতে পারে।

প্রশ্ন : না ঘুমোল কি হয়?

মা : মন জটিল কাজ করতে পারে না। মেজাজ খিটখিটে হয়। অকারণে হাসি আর কান্না আসে। খুব বেশি ঘুম কম হলে মতিভ্রম ঘটে। চোখ নাকি নানান অদ্ভুত জিনিস 'দেখতে' পায়, কান 'শুনতে' পায় অদ্ভুত আওয়াজ।

প্রশ্ন : ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই পড়তে বলো কেন?

মা : এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে মাথা তাজা থাকে বলে। উষালগ্নে খুব জটিল মানসিক কাজ সহজে আর কম সময়ে করে ফেলা যায়।

প্রশ্ন : তবে যে শুনি বছর-বছর অনেকে না ঘুমিয়ে থাকে?

মা : খবরের কাগজের এই খবরগুলোর অন্তর্তদন্ত করে দেখা গেছে, এরা প্রায় বসে বা দাঁড়িয়ে টুক করে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

প্রশ্ন : টুক করে যে-ঘুম, তা কি লম্বা ঘুমের সমান হতে পারে?

মা : পর-পর দু-রাত জেগে থেকে মোট ষোল ঘণ্টার ঘুম হারিয়ে তারপর মাত্র এগারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে চাঙা থাকার ঘটনা আছে। তিনদিন তিনরাত না ঘুমিয়ে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে প্লেন উড়িয়ে এনে লিনডেনবার্গ মাত্র দশঘণ্টা ঘুমিয়ে চনমনে হয়ে গেছিলেন।

প্রশ্ন : ঘুমের ঘোরে অনেকে কথা বলে কেন?

মা : তাদের সোমনিলোকুইজ্ম্ আছে। এটাও একটা ঘুম-রোগ। ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের ঘুম-রোগে ভোগে। ঘুমপাতলা হলে, স্বপ্ন দেখলে এরকমটা হয়।

প্রশ্ন : যারা ঘুমিয়ে হাঁটে?

মা : তারা সোমনামবুলিজ্ম্ ঘুম-রোগের রুগী। মনে আবেগ জমে থাকলে এ রোগ দেখা দেয়।

প্রশ্ন : ইনসোমনিয়া কি রোগ?

মা : ঘুম না পাওয়ার রোগ। এ রোগ ঘটে আবেগ আর উদ্বেগ যখন মনের মধ্যে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে—তখন। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা সাময়িক—পরীক্ষা চুকে গেলেই স্বাভাবিক। অনেকের ক্ষেত্রে এটা ক্রনিক—নিয়মিত রোগ। তখন তাদের মানসিক চিকিৎসার দরকার হয়। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ইনসোমনিয়ায় ভোগেন।

প্রশ্ন : 'স্লিপিং সিকনেস' কি ধরনের রোগ, মা?

মা : কালঘুম রোগ। এর বৈজ্ঞানিক নাম 'আফ্রিকান ট্রিপানোলোমিয়াসিস'। মাছি বয়ে নিয়ে যায় 'ট্রিপানোসোমা' প্যারাসাইট অথাৎ পরজীবীদের। মাইক্রোসকোপ ছাড়া তাদের দেখা যায় না। রক্তে ঢুকে এরা মেরুমজ্জায় সেঁধিয়ে গিয়ে রুগীর আলসেমি এনে দেয়, তারপর একটানা ঘুম—সে ঘুম আর ভাঙে না। আফ্রিকান কঙ্গোয় এক সময়ে এই রোগ অনেক মানুষ মেরেছে।

প্রশ্ন : দিবানিদ্রা কি ক্ষতি করে?

মা : আধুনিকতম গবেষণায় জানা গেছে, ঠিক তার উল্টোটা করে। দিনের বেলা অল্প ঘুমিয়ে নিলে মাথা চাঙা হয়ে যায়—জটিল কাজ সহজতর হয়। নইলে বিকেল নাগাদ গা ম্যাজম্যাজ করে, মন ঢিলেঢালা হয়ে যায়। যারা টুক করে কাজের ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেয়—তাদের হার্টও ভাল থাকে। গ্রীকরা দিবানিদ্রার ভক্ত। হার্টের রোগে ভোগে কম। গরমপ্রধান দেশে যারা দুপুরে ঘুমোয়, তাদের মধ্যেও কম। আমেরিকানরা দিবানিদ্রার নামে লজ্জা পায়। তাদের মধ্যে হার্টের রোগ বেশি। সামান্য দিবানিদ্রায় বিকেলের কাজে ভুল কমিয়ে দেয়, স্মৃতি তীক্ষ্ণ থাকে, মেজাজ শরিফ থাকে। স্বাস্থ্য যার ভাল, তার আয়ু তো বেশি হবেই। জীবন আর মৃত্যু, ব্যর্থতা আর সাফল্য, আলসেমি আর প্রাণচাঞ্চল্য—এ সবের হেরফের ঘটিয়ে দিতে পারে সামান্য দিবানিদ্রা।

প্রশ্ন : দিবানিদ্রার গুণ কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত?

মা : ব্রেন-ওয়েভ টেস্ট করে দেখা গেছে, মানুষের মধ্যে সহজাত ঝোঁক রয়েছে দিনে দুবার ঘুমোনার: রাত্রে বেশি, দুপুরে কম।

প্রশ্ন : কুকুরেরও সেই ঝোঁক আছে, তাই না, মা?

মা : কুকুর শুধু দিবানিদ্রা দেয় না, তখন স্বপ্নও দেখে। নিশ্চয় মনিবের স্বপ্ন! পাখিও দেখে!

প্রশ্ন : ঘোড়ারও তাহলে ঘুম রোগ আছে?

মা : ঘোড়া আর অনেক জানোয়ার দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে নেয়—কিন্তু সেটা ঘুমরোগের জন্যে নয়। নানান জীবের নানান অভ্যেস আর চাহিদা। কোনো জীব সমস্ত শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। দাঁড়ের পাখি নখ দিয়ে দাঁড় খামচে ধরে ঘুমোয়—যাতে ঘুমের ঘোরে পড়ে না যায়—যেমন তুই খামচে থাকিস আমার শাড়ি।

প্রশ্ন : দুপুরে ঘুমোলে যে গা-ভারি হয়, মাথা গোলমাল থাকে?

মা : সেটা তো Sleep Inertia; ঘুম-জড়ত্ব। আচমকা ঘুম ভাঙলে এরকম হয়। তখন মিনিট পনেরো ব্যয় করতে হয় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে।

প্রশ্ন : ঘুমিয়ে ককিয়ে ওঠা, মাসল-এর খিঁচুনি—এগুলোও কি ঘুমরোগ?

মা : নিশ্চয়। উদ্বেগ থেকে ভয়ের স্বপ্ন জন্ম নিলেই ঘুমিয়ে চেঁচাস গাঁ-গাঁ করে। পেশির কাজ বেশি করলেও পা ছুঁড়িস—নয়তো শিরা পা টেনে ধরে।

প্রশ্ন : ঘুমন্ত অবস্থায় পা ছোঁড়ার জন্যে আসলে কে দায়ী, মা?

মা : হাইপোথ্যালামাসের নার্ভ সেন্টার।

প্রশ্ন : ঘুমোলে ঘামি কেন?

মা : খুব সম্ভব তখন চামড়ায় বেশি রক্ত ছুটে যায় বলে।

প্রশ্ন : মটকা মেরে পড়ে থাকলে ধরে ফেলো কি করে?

মা : ঘুমোলে শরীরের ভেতরকার টেম্পারেচার একটু কমে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসও পাল্টে যায়। জেগে থাকলে তুই যেমন গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিস আর ফেলিস—ঘুমের সময় তা হয় না। এই দেখেই বুঝি, সত্যিই ঘুমোচ্ছিস না, মটকা মেরে আছিস।

প্রশ্ন : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঘোড়ায় চড়ে ঘুমোতেন কি করে?

মা : খুব সম্ভব ঘুমরোগে ভুগতেন বলে। এ রোগের নাম নারকোলেপ্সি। কাজ করতে করতে হঠাৎ মোষের ঘুম ছুটে আসে—কয়েক সেকেণ্ড থেকে বিশ মিনিট পর্যন্ত। অনেকে আঁচ করেন এ জন্যে দায়ী হাইপোথ্যালামাসের গণ্ডগোল।

প্রশ্ন : সম্মোহন, ভর হওয়া, মূর্ছা যাওয়া—এ সব কি ঘুম?

মা : সত্যিকারের ঘুম নয়। এই জন্যে সম্মোহনে পা ঝাঁকুনি দেয়, অন্যান্য রিফ্লেক্স বা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া দেখা দেয়; শরীরের ভেতরকার অন্য পরিবর্তনগুলোও প্রকৃত ঘুমের সময় যেমন ঘটে—সম্মোহন ঘুমে সেরকম পুরোপুরি হয় না। ভর হওয়াও ঠিক সম্মোহন ঘুমের মতন। অনেকে ভর হওয়াকে বলেন, আত্ম-সম্মোহন। মূর্ছায় পেশীর আক্ষেপ বেড়ে যায়—ঘুমে সেরকমটা হয় না।

প্রশ্ন : ছ-মাস যদি ঘুমোই একটানা?

মা : কুম্ভকর্ণের মত? তাহলে তো ১৩/১৪ ফুট বেড়ে যাওয়ার কথা—যদিও তা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা দরকার।

প্রশ্ন : কেন মা? ঘুমোলে কি লম্বা হওয়া যায়?

মা : প্রায় আট মিলিমিটার। পরের দিন তা আগের মত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : কেন এমন হয়, মা?

মা : কার্টিলেজ ডিস্কে চাপ পড়ে না রাতে—দিনে পড়ে গ্র্যাভিটির চাপ।

টেলিস্কোপ

প্রশ্ন : টেলিস্কোপ কার আবিষ্কার, মা?

মা : কৃতিত্বটা অনেককেই দেওয়া হয়। গ্রীস দেশে ডেমোক্রিটাস নামে এক দার্শনিক ছিলেন। দেশ ভ্রমণ ছিল তাঁর প্রচণ্ড নেশা। বিখ্যাত এই চিন্তাবিদের নামা উদ্ভট ভাবনা-চিন্তার জন্যে সবাই তাঁকে 'লোক হাসানো দার্শনিক' বলে ডাকতো। যিশুখ্রিস্ট ধরায় আসার ৩৫৭ বছর আগে ইনি দেহ রাখেন। শোনা যায়, ইনি নাকি এমন একটা যন্ত্রের ব্যবহার জানতেন, যা 'দূরের জিনিসকে কাছে নিয়ে আসত'। আমাদের এই 'মিল্কি ওয়ে' গ্যালাক্সি যে অগণিত নক্ষেত্রের সমষ্টি, এমন কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।

প্রশ্ন : কোথায় সেই যন্ত্র?

মা : মনে তো হয় না এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সত্যিই তিনি করেছিলেন। করলে কি যন্ত্রটা থেকে যেত না? তবে হ্যাঁ, তাঁর সময়কার মানুষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে তিনি পেরেছিলেন। আর একজন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, নাম রজার বেকন।

প্রশ্ন : কী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন রজার বেকন?

মা : ১২৬০ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'অবিশ্বাস্য রকমের দূরত্বে থেকে ক্ষুদ্রতম হরফ-ও আমরা পড়তে পারি। খুব খুদে সৈন্যবাহিনী খুব বিরাট হয়ে দেখা দিতে পারে, এবং খুব দূরে থাকলেও খুব কাছের বলে মনে হতে পারে। ঠিক এইভাবে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রদের চেহারাগুলোকে নামিয়ে আনা যেতে পারে এবং শত্রুবাহিনীর ঠিক মাথার ওপর দেখানো যেতে পারে।' এইরকম আরো উদ্ভট কথা বলার বাকি ছিল রজার বেকনের। যা শুনে মনে হয়, কোনওটাই ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়—সবই পিলে-চমকানো ভবিষ্যৎবাণী।

প্রশ্ন : এভাবে ভবিষ্যৎ-টেলিস্কোপের কথা আর কেউ বলেছেন?

মা : টমাস ডিগেস নামে এক ভদ্রলোক রানি প্রথম এলিজাবেথের আমলে তাঁর সৈন্যবাহিনীর মনে সাহস জোগাতে মহা ওস্তাদ ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্যা সম্পর্কে বেশ কিছু লেখাও লিখেছিলেন। ইনিই বলতেন—'আমার বাবা লিওনার্ড ১৫৭০-এ পরলোকে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছে এমন কাঁচ ছিল, যা দিয়ে

সাত মাইল দূর থেকেও গোপন জায়গার সমস্ত দৃশ্য তিনি দেখতে পেতেন।' এ কথায় কতটা রঙ চড়ানো ছিল তা না জানা গেলেও, ডিগেস-এর মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই হ্যান্স লিপারসে নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই একখানা টেলিস্কোপ বানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : প্রথম টেলিস্কোপ? কোন সালে, মা?

মা : ১৬০৮ সালে। দ্বিতীয় টেলিস্কোপও তৈরি হয় ওই একই সালে। তৈরি করেন একজন ওলন্দজ, নাম, জোহানেস অ্যানড্রিয়ান জুন।

প্রশ্ন : তাহলে গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করলেন কবে?

মা : ১৬০৮ সালের আবিষ্কারের খবর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ার পর। শুনল অনেকেই, কিন্তু গুরুত্বটা ধরতে পারলেন শুধু গ্যালিলিও। অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন। অপরিসীম ধৈর্য আর দক্ষতায় নিজেই বানালেন একটা টেলিস্কোপ। বানালেন কিন্তু একটা বাজনার টুকরো অংশ থেকে।

প্রশ্ন : বাজনা থেকে টেলিস্কোপ বানালেন গ্যালিলিও?

মা : অরগ্যানের একটা পাইপ নিলেন, তার দুই প্রান্তে দুটো লেন্স বসালেন। তাতে বিবর্ধন অথাৎ ম্যাগনিফিকেশন ঘটল মাত্র তিন গুণ। পরে অবশ্য তিরিশ গুণ বিবর্ধন করতে পারে এমন একটা টেলিস্কোপ বানিয়েছিলেন গ্যালিলিও। এই দিয়েই দেখেছিলেন চন্দ্রপৃষ্ঠের পাহাড়দের, দেখেছিলেন 'মিল্কিওয়ে' গ্যালাক্সিতে খুব আবছা তারাদের সমষ্টি, এবং আবিষ্কার করেছিলেন বৃহস্পতি গ্রহের চারটে বড় উপগ্রহকে। দেখেছিলেন, শনি গ্রহের অদ্ভুত আকৃতি; মস্ত একটা আংটি অথবা বেশ কয়েকটা আংটি শনিকে ঘিরে রয়েছে বলেই যে-চেহারাটা এরকম বিদঘুটে—জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্য ছাত্ররা তা পরে দেখিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : টেলিস্কোপে কী থাকে, মা?

মা : সব টেলিস্কোপেই অবশ্য থাকে (১) একটা কনভেক্স লেন্স (অবজেকটিভ) অথবা একটা কনকেভ আয়না (রিফ্লেক্টর অথবা স্পেকুলাম); থাকে নলের এক প্রান্তে—যাতে দূরের জিনিস থেকে এসে পড়া আলো-কে এক জায়গায় জড়ো করে ঝকঝকে প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলতে পারে। (২) একটা লেন্স—তার নাম আইপিস—প্রতিবিম্বর বিবর্ধন ঘটিয়ে চোখের সামনে নিয়ে আসার জন্যে।

প্রশ্ন : রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ আর রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপের মধ্যে তাহলে তফাতটা তাহলে কী?

মা : যে-টেলিস্কোপের অবজেকটিভ (কনভেক্স লেন্স) থাকে, তাকে বলা হয় রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ; স্পেকুলাম (কনকভ আয়না) থাকলে তার নাম রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ।

প্রশ্ন : দুটোর মধ্যে সেকেলে টেলিস্কোপ কোনটা?

মা : রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ।

প্রশ্ন : শুধু চোখে তারা দেখা যায় না, টেলিস্কোপে দেখা যায় কীভাবে?

মা : তারাদের আলোকরশ্মিগুলো টেলিস্কোপে ঢুকে সমান্তরালভাবে নেমে এসে অবজেক্টিভের ফোকাস বিন্দুতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে—আই পিস তার বিবর্ধন ঘটিয়ে দেয় বলে চোখ তাকে দেখতে পায়। 'আইপিস'টা আসলে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। বিস্তর আলোকরশ্মি চোঙা আকারে অবজেক্টিভের মধ্যে ঢুকে ঘন আর ছোট্ট হয়ে যায় আইপিস দিয়ে বেরিয়ে আসার সময়ে। ফলে, অনেক বেশি আলো ঢোকে চোখে—টেলিস্কোপ না থাকলে যা হত না। তারাদের উজ্জ্বলতাও বেড়ে যায় এর ফলে।

প্রশ্ন : আদি রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপে কি কোনো অসুবিধে ছিল?

মা : লেন্সগুলো বেজায় ভারি হত বলে কিনারা বরাবর ফিটিং-এর পর ওজনের জন্যেই আলোকরশ্মির বিপথন ঘটত; ফলে, বিকৃত হত প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ, আলোকরশ্মি পথ চলার নিয়ম না মেনে বিপথে চলে যেত। এই বিপথন ছিল দু-রকমের: এক, লেন্সের কিনারা দিয়ে ঢোকা আলোকরশ্মি অন্যদের আগে এসে পড়ত ফোকাস বিন্দুতে; দুই, লাল রশ্মিদের আগে নীল রশ্মিরা এসে যেত ফোকাস বিন্দুতে।

প্রশ্ন : এই ত্রুটি মেরামতের চেষ্টা কেউ করেননি?

মা : প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে একজন ইংরেজ চশমা নির্মাতা আলোকরশ্মির এহেন বেয়াড়াপনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন অবজেক্টিভে দুটো কাঁচ লাগিয়ে; বাইরের দিকে ক্রাউন কাঁচ থেকে তৈরি কনভেক্স কাঁচ—ভেতর দিকে ফ্লিন্ট কাঁচ থেকে তৈরি কনকেভ কাঁচ।

প্রশ্ন : নিউটন কোন্ টেলিস্কোপ তৈরি করেছিলেন?

মা : উনি আবিষ্কার করেছিলেন রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ ১৬৬৬-৬৯ সালে। ১৬৭১ সালে তৈরি টেলিস্কোপটা এখন ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটির সম্পত্তি। এ টেলিস্কোপে বর্ণবিপথন ঘটে না।

প্রশ্ন : আকাশ দেখতে কোন্ টেলিস্কোপ কাজে লাগে?

মা : দুটোই। সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপগুলো অবশ্য রিফ্লেক্টিং।

প্রশ্ন : ম্যাগনিফাইং করার ক্ষমতাটাই যখন টেলিস্কোপের আসল ক্ষমতা, তখন সব ক্ষেত্রেই তা করে নেওয়া হয় না কেন?

মা : প্রতিবিম্বর সঙ্গে অপবস্তুগুলোও বিবর্ধিত হয়ে যায় বলে। আবছা বস্তুকে কিছু দূর পর্যন্ত বিবর্ধিত করা যায়—তারপর করলে এত আবছা হয়ে যাবে যে আর দেখাই যাবে না।

প্রশ্ন : টেলিস্কোপ তৈরি কি খুব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার?

মা : শখের টেলিস্কোপ তুই নিজেও বানাতে পারিস। কিন্তু বড় বড় টেলিস্কোপে তৈরি চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। খুব হুঁশিয়ার হয়ে বানাতে হয় অবজেক্টিভ লেন্স অথবা আয়নাকে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায় একখানা মাত্র অবজেক্টিভ বানাতে। তাপমাত্রার সামান্য হেরফের ঘটলেই অবজেক্টিভ জখম হতে পারে বলে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসনের দশ হাজার পাউন্ড ওজনের একশ ইঞ্চি আয়নাকে দিনের বেলায় রেখে দেওয়া হয় জলের জ্যাকেটে, গম্বুজঘরে থাকে ইনসুলেটেড অবস্থায়।

প্রশ্ন : টেলিস্কোপে নাকি উল্টো ছবি দেখা যায়?

মা : আকাশ দেখার টেলিস্কোপে সেই রকমই দেখায়। পৃথিবীর পিঠে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর জিনিসকে দেখার টেলিস্কোপে আরও খানকয়েক বাড়তি লেন্স বসিয়ে উল্টো প্রতিবিম্বকে সিধে করে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন : 'অপেরা গ্লাস' কি জিনিস, মা?

মা : একজোড়া গ্যালিলিও-টেলিস্কোপ। 'আই পিস'-এর জায়গায় থাকে কনকেভ লেন্স। আধুনিক বাইনোকুলার বা প্রিজম ফিল্ড গ্লাস-এর প্রতি নলে থাকে একটা করে রিফ্লেক্টিং প্রিজম—অনেক স্পষ্ট দেখা যায়।

প্রশ্ন : টেলিস্কোপের ব্যবহার কি শুধু আকাশ দেখার জন্যে?

মা : অনেক যন্ত্রপাতিতেও টেলিস্কোপ লাগানো থাকছে। যেমন, সারভেয়রের লেভেল আর থিয়োডোলাইট রেঞ্জ ফাইণ্ডার, টেলিস্কোপিক রাইফেলসাইট, এমন ল্যাবোরেটরির সূক্ষ্ম দাড়িপাল্লাতেও।

প্রশ্ন : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ তা হলে কাকে বলব?

মা : আজ যে বড়, কাল তাকে টেক্কা মেরে যাচ্ছে আর একটা। মাউন্ট উইলসনের হুকার রিফ্লেক্টর অনেক দিন ধরেই বৃহত্তম হয়ে বসেছিল। তারপর তার চাইতেও বড় দানবিক রিফ্লেক্টরের আবির্ভাব ঘটল ১৯৪৮ সালে আমেরিকার মাউন্ট পালামোরে। ৪৫০ টন ওজনের বিশাল এই টেলিস্কোপকে চালানো হত যে মোটর দিয়ে, তার হর্স পাওয়ার খুবই কম—এক হর্স পাওয়ারের বারো ভাগের এক ভাগ। আয়নার ব্যাস ৫ মিটার। কিন্তু একেও হারিয়ে দিল রাশিয়ার ক্রিমিয়া অঞ্চলের ৬ মিটার রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ। এই মুহূর্তে আরও বড় বড় রিফ্লেক্টর তৈরি হয়ে চলেছে পৃথিবীর নানা জায়গায়—এদের ব্যাস ৮ থেকে ১০ মিটারের মধ্যে। সবচেয়ে বড়টার মাপ ১০ মিটার।

প্রশ্ন : ১০ মিটার ব্যাস-এর রিফ্লেক্টর! এ টেলিস্কোপ বসছে কোথায়?

মা : হাওয়াই-তে। মাউন্ট মনা কিয়া পাহাড়ের ওপরে ১০,০০০ ফুট উঁচুতে—যেখানে বাতাস খুব পাতলা। এটাও কিন্তু আর পৃথিবীর সবসেরা রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ নয়।

প্রশ্ন : আরও ভাল টেলিস্কোপ? কোথায় মা?

মা : আকাশে।

প্রশ্ন : আকাশে দূরবীন ঝুলছে?

মা : ঝুলছে নয়, ঘুরছে। পৃথিবীকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। ফ্লোরিডার কেপ কার্নিভাল থেকে ১৯৯০ সালের ২৪ এপ্রিল তাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে 'ডিসকভারি' শাটল-এর পিঠে চাপিয়ে শূন্যে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : কে সে?

মা : হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ; সংক্ষেপে H.S.T, বিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল-এর নাম অমর হয়ে রইল বিশ্বের এই অষ্টম বিস্ময়ের নামের মধ্যে। ১৯২০ সালে ইনিই তো প্রথম জেনেছিলেন, বিশ্ব জগৎ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের এই গ্যালাক্সির মত হাজার হাজার গ্যালাক্সি রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে।

প্রশ্ন : ভুঁইফোড় বিস্ময় নাকি? এতদিন শুনিনি তো?

মা : কিন্তু শুনেছেন তামাম দুনিয়ার সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। অথচ H.S.T. মোটেই সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ নয়। মূল আয়নাটার ব্যাস মোটে ২.৪ মিটার।

প্রশ্ন : কেন H.S.T. পৃথিবীর সবসেরা টেলিস্কোপ?

মা : পাহাড়ে বসানো যে-কোনও দূরবীনের চাইতে এর ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। বৃহত্তম না বলে একে পৃথিবীর সূক্ষ্মতম টেলিস্কোপ বলাই সঙ্গত। তারা কাঁপে কেন আমরা সবাই জানি। বাতাসের স্তরের মধ্যে দিয়ে আসবার সময়ে তারার আলোর প্রতিসরণ আর বিকৃতি ঘটে বলে। খুব অস্পষ্ট আলোকরশ্মিকে শুষে নেয়। নক্ষত্র আর ছায়াপথ থেকে আসা আলট্রা ভায়োলেট আর ইনফ্রা-রেড বিকিরণকেও ফিলটার করে বের করে দিয়ে পৃথিবীতে বসানো দূরবীন পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। অথচ এই সব বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে জ্যোতিষ্কদের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায় অনেক তথ্য। আকাশ-দূরবীনের নেই এ-সব অসুবিধে।

প্রশ্ন : কেন নেই, মা?

মা : H.S.T. পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে মাটি থেকে ৩৭০ মাইল ওপরে। বাতাসের ঝগড়া সেখানে নেই। ফলে, অনেক দূর পর্যন্ত 'দেখতে' পায় স্পষ্টভাবে। প্রতিবিম্বর স্পষ্টতা মতের দূরবীনের চেয়ে দশগুণ বেশি। দূরের বস্তু যদি ৪০ গুণ বেশি অস্পষ্ট হয়, H.S.T. তাকেও কড়া নজরে রাখে। তার মানে, চাঁদের বুকে ম্যাড়ম্যাড়ে মোমের আলোও এর নজর এড়ায় না। চার হাজার কিলোমিটার দূরের মোটরগাড়ির বাঁদিকের আর ডানদিকের হেডলাইটের তফাত ধরবার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাও আছে H.S.T.-র। আরও অনেক সুবিধে আছে আকাশ-দূরবীনের। সংক্ষেপে জেনে রাখ, হাব্‌ল্‌ স্পেস টেলিস্কোপ চার গুণ বেশি গভীরে উঁকি মারতে পারে, ২৫ গুণ বেশি ক্ষীণ বস্তুকে ঠাহর করতে পারে, দশ গুণ বেশি খুটিনাটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে মর্ত্যের বৃহত্তম দূরবীনের চেয়ে।

প্রশ্ন : আবহাওয়া খারাপ হলে?

মা : মর্ত্যের দূরবীনেরা অকেজো হয়। বছরে ১২০ থেকে ১৫০টা রাত কাজ দেয় আকাশ স্পষ্ট থাকে বলে। আকাশ-দূরবীন দিয়ে কিন্তু প্রতিদিনই ১০/১২ ঘন্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন : ওজন কত H.S.T.-র?

মা : মাত্র সাড়ে এগারো টন—আকাশে তুলে দেবার সময়ে। বেশির ভাগই তো কমপিউটার। মূল আয়নার ব্যাস ২.৪ মিটার—আগেই বলেছি। তৈরি হয়েছে টাইটানিয়াম সিলিকেট কাঁচ দিয়ে—তার ওপরে আছে অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা প্রলেপ—এক সেন্টিমিটারের ষাট লক্ষ ভাগের এক ভাগ পুরু। সাইজ মোটামুটি একটা স্কুল বাসের মতন—জোড়া লাগানো প্রকাণ্ড দুটো সিলিণ্ডার।

প্রশ্ন : পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা আকাশ-দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখেন কী করে?

মা : উপগ্রহ মারফত ছবি চলে আসে পৃথিবীতে।

প্রশ্ন : ক্যামেরা নেই আকাশ-দূরবীনে?

মা : দুটো অত্যন্ত হালফ্যাশনের ক্যামেরা আছে। একটা দিয়ে ছড়িয়ে থাকা অনেকখানি দৃশ্যর ছবি তোলা যায়। সৌরজগতের সব কিছুর আর অন্যান্য নক্ষত্রদের সম্ভাব্য গ্রহ-উপগ্রহের ছবি তোলার উপযুক্ত এই ক্যামেরা। আর একটা ক্যামেরা অনেক দূরের অতি-অস্পষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ, ইস্ক্রুপের পাকের মত প্যাঁচালো গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সি-পুঞ্জদেরও ছবি তুলতে পারে। অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে একটা হাইস্পিড ফটোমিটার; সেকেণ্ডে ৫০,০০০ বার আলোর হেরফের ঘটলেও চুলচেরা হিসেব দেয় আলোর তীব্রতার। আর আছে দুটো স্পেকট্রোমিটার।

প্রশ্ন : নিজে চরকি পাক খেতে খেতেও জ্যোতিষ্ককে নজরে রাখতে পারে আকাশ-দূরবীন?

মা : পারে বইকি। নজর থেকে সরে যায় না। একটা উপমা দিলেই ক্ষমতাটা আন্দাজ করতে পারবি। দেড় কিলোমিটার দূর থেকে মানুষের একগাছি চুল কতখানি চওড়া—তার ঠায় হিসেব রাখতে পারে H.S.T.; সেকেণ্ডে চল্লিশবার অবস্থানের হিসেব চলে যায় কমপিউটারের কাছে।

প্রশ্ন :আকাশ-দূরবীন টিকবে কতদিন?

মা : বছর পনেরো তো বটেই। ২/৩ বছর অন্তর শাটল্‌-রা উড়ে গিয়ে মেরামতি চালিয়ে আসবে—আরও জবরদস্ত করে তুলবে।

প্রশ্ন : কতদূরের ছবি তুলবে আকাশ-দূরবীন?

মা : ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সির ছবি তুলবে। মাউন্ট পালোমারের দূরবীনের দৌড় ৩০ কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত। এক আলোকবর্ষ মানে সেকেণ্ডে ১,৮৬, ২৮১ মাইল স্পিডে আলোকরশ্মি এক বছরে যতটা পথ যেতে পারে। এ ছাড়াও ক্ষীণ আশা আছে, অন্য নক্ষত্রদের ছানাপোনা গ্রহ-উপগ্রহদেরও দেখতে পাবে।

প্রশ্ন : আরও কী কী অসম্ভব কাণ্ড করতে পারে আকাশ-দূরবীন?

মা : কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা, পৃথিবী থেকে ব্রহ্মাণ্ডের দশ শতাংশ মাত্র দেখতে পাই। বাকি নব্বই শতাংশকে বলা হয় ‘কৃষ্ণ বস্তু’—হয়ত খুব অস্পষ্ট নক্ষত্র আর গ্যালাক্সি দিয়ে গড়া। আরও অজানা বস্তু থাকতে পারে এই ‘কৃষ্ণ বস্তু’র মধ্যে। যদি থাকে, হাবল্ তাকে আঁচ করবার সূত্র ধরিয়ে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় রহস্যটাকেও ভেদ করবে; বিগ ব্যাং-এর পর ব্রহ্মাণ্ডর জন্ম হল কীভাবে, নিখিল বিশ্ব গড়ে উঠল কীভাবে —সেই সূত্র ধরিয়ে দেবে। জীবদেহের ‘বিল্ডিং ব্লক’ অর্থাৎ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এল কোথেকে, তাও বলে দিতে পারে। ধারেকাছে ‘ব্ল্যাক হোল’ ঘাপটি মেরে থাকলে, তার ঠিকানাও দিয়ে দেবে।

প্রশ্ন : আকাশ-দূরবীনকে কী ধরনের টেলিস্কোপ বলব, মা?

মা : নিউটনীয় ধাঁচের টেলিস্কোপ। অথাৎ নিউটন যে-ধরনের টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন—সেই ধরনের। আজও আমরা তিন ধরনের টেলিস্কোপ ব্যবহার করে চলেছি। রিফ্লেক্টিং দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। রিফ্র্যাক্টর-এর দৌড় ৪০ ইঞ্চি লেন্সের ওপরে যেতে পারেনি—Yerkes টেলিস্কোপে যা আছে। এ ছাড়াও আছে রেডিও টেলিস্কোপ।

প্রশ্ন : রেডিও দূরবীন?

মা : জ্যোতিষ্কদের রেডিও-তরঙ্গকে ধরে—আলোক-তরঙ্গকে নয়। ধাতুর চাদর দিয়ে তৈরি একটা কনকেভ ‘আয়না’ রেডিও-তরঙ্গদের প্রতিফলিত করে কেন্দ্রীভূত করে আয়নার ফোকাস বিন্দুতে রাখা একটা এরিয়েল-এর দিকে। সঙ্কেতগুলো যে খুব বোধগম্য, তা নয়। ইংলণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্কে আছে একটা বিরাট রেডিও টেলিস্কোপ—একসময়ে তা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম। এখন আর নয়।

প্রশ্ন : আজকের বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ তা হলে কে?

মা : দোলনার মত যে ঝুলছে Arrciboতে দুটো পাহাড়ের মাঝে; তৈরি হয়েছিল ১৯৬৩-তে। চাকতিটার ব্যাস হাজার ফুট। নিউ মেক্সিকোতে প্রকাণ্ড আকারে ২৭টা চাকতি জুড়ে ১৯৮০-তে যেটা বানানো হয়েছে, তা একখানা ১৭ মাইল ব্যাসের চাকতি দিয়ে আকাশের রেডিও পর্যবেক্ষণের সমান। সত্যিকারের প্রথম রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি হয়েছিল আমেরিকায় ১৯৩৭ সালে।

প্রশ্ন : সব তো বুঝলাম, কিন্তু কনকেভ আর কনভেক্স কাঁচের তফাতটা কি?

মা : বাংলায় বললেও বুঝবি না। ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কনকেভ → ; কনভেক্স → ; প্রথমটা পেট পাতলা, দ্বিতীয়টি পেটমোটা।

প্রশ্ন : সবচেয়ে অদ্ভুত টেলিস্কোপ কোন্‌টি, মা?

মা : গোরস্থানের দূরবীন সেটি। তাকে খাড়া করা হয়েছে যে থামটার ওপর, সেই থামের মধ্যে রয়েছে জেমস লিক নামে এক ধনী, দানবীর, জমিদারের কঙ্কাল। তাঁর টাকাতেই তৈরি হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার লিক মানমন্দির—সমাধি-স্তম্ভটা রয়েছে এইখানেই।

ভূমিকম্প

প্রশ্ন : ভূমিকম্প হলেই সবাই শাঁখ বাজায় কেন, মা?

মা : সবাই বাজায় না। যাদের ধারণা, এই পৃথিবীটা রয়েছে বাসুকির ফণার ওপর—তারাই বাজায়। বাসুকি মাথা নাড়লেই পৃথিবী না কি নেচে নেচে ওঠে। অর্থাৎ ভূমিকম্প ঘটে। তখন শাঁখ বাজিয়ে বাসুকিকে তোয়াজ করা হয়।

প্রশ্ন : সাহেবদের মধ্যে এসব কুসংস্কার নেই, তাই না, মা?

মা : বিলক্ষণ আছে। গ্রীকদের দেবতা পোসিডন শুধু সমুদ্রের দেবতা নন, তিনি নাকি ভূমিকম্পেরও দেবতা। গোটা পৃথিবীর কাঁপুনি তিনি ম্যানেজ করছেন একা—কেননা ডাঙাগুলো তো রয়েছে সমুদ্রেরই কোলে; অর্থাৎ সমুদ্রের দেবতা বহন করছে পৃথিবীটাকে। আবার এমন কিংবদন্তীও শোনা যায় যে, ককেসাস পাহাড়ের মাথা থেকে জীবনদায়িনী জল চুরি করতে গিয়ে এক ভয়ানক দৈত্য বড্ড দাপাদাপি করে বলেই পৃথিবী এত কাঁপে। গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়াস-কে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তো এই ককেসাস পাহাড়েই।

প্রশ্ন : পাঁজি দেখে বলা যায় না কবে কোথায় কখন ভূমিকম্প হবে?

মা : এ রকম গণনা এক সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যেই ছিল। কিন্তু এখন তা লোপ পেয়েছে বললেই চলে। তাই পাঁজিপুঁথি দেখে আর ভূমিকম্পের ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না।

প্রশ্ন : পৃথিবীর কাঁপুনি নিয়েও রহস্য?

মা : এক সময়ে ভূমিকম্প ব্যাপারটাই ছিল রহস্যে ঘেরা। কিন্তু যে-বিজ্ঞান রহস্যের ঘোমটা খুলে দিয়েছে, তার নাম সাইজ্‌মলজি। এ-নামের মধ্যে আছে দুটো গ্রীক শব্দ; তাদের মানে, ভূমিকম্প বিজ্ঞান। ভূমিকম্প বৈজ্ঞানিকদের বলা হয় সাইজ্‌মলজিস্ট।

প্রশ্ন : ভূমিকম্পের আসল কারণটা তা হলে কী?

মা : মাটির তলায় পাথর-টাথরগুলো যে-ভাবে সাজানো রয়েছে, আচমকা সেগুলো নড়েচড়ে যায়, কোথাও খসে যায়, কোথাও ছিটকে যায়। প্রচণ্ড চাপ আর টানের ফলে এমনটা ঘটে। পায়ের তলায় মাটি তখন থর থর করে কাঁপবেই। এই ধরনের ভূমিকম্পকে বলা হয় টেক্টনিক।

প্রশ্ন : টেক্টনিক মানে?

মা : গ্রীক শব্দ টেকটন মানে, যে-ব্যক্তি বাড়ি ঘরদোর বানায়; টেক্টনিক ভূমিকম্প মানে, পৃথিবীর বিল্ডিংটাকে তছনছ করে ছাড়ে যে কাঁপুনি।

প্রশ্ন : কেন হয় টেক্টনিক ভূমিকম্প?

মা : নানা মুনির নানা মত শুনে কী করবি? যে তত্ত্বটাকে সবচেয়ে বেশি আমল দেওয়া হয়েছে, সেটা শোন; বিল্ডিং ব্লকের এই ধরনের স্থানচ্যুতি ঘটে আইসোসট্যাসির জন্যে। আইসোসট্যাসি মানে, পৃথিবীর ওপর দিকের স্তরে পাশাপাশি লেগে থাকা অংশগুলোর মধ্যে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাওয়া। মাথা চাড়া দেয় ফোর্স অব গ্র্যাভিটি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ভারসাম্যহীন বস্তুগুলোকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পেটের দিকে। মাটি কাঁপে এই কারণেই।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, উঁচু পাহাড়ের পাশেই নিচু সমতলভূমির ভারসাম্য তাহলে থাকছে কী করে?

মা : অর্থাৎ আইসোসট্যাটিক থিওরি এ-ক্ষেত্রে ধোপে টিকছে না, এই তো? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, একই তত্ত্ব এ-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেন না, পাহাড়দের যতটা ভারি বলে মনে করা হয়, তারা ততটা ভারি নয়।

প্রশ্ন : পাহাড় ভারি নয়! বলছ কী, মা?

মা : পাহাড়ের পাশে সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে একটা ওলন ঝুলিয়ে দিলেই প্রমাণ পাবি। ওলন পাবি রাজমিস্ত্রীদের কাছে। একটা সুতোর ডগায় ঝোলানো ভারি ধাতু। পাহাড়ের পাশে সমতলভূমিতে ঝোলালে ওলন-টা পুরোপুরি লম্বভাবে থাকবে না—পাহাড়ের ওজন আর আয়তন তাকে একটু নিজের দিকে টেনে রাখবে। কিন্তু যতটা টানা উচিত, ততটা নয়। কারণ, পাহাড়ের ভেতরের আর তার নিচের পাথর নিচু জমির পাথরের মত অত ঘন নয়। সব পাহাড়েই 'শেকড়' ছড়িয়ে থাকে মাটির মধ্যে দিয়ে। সমুদ্রে ভাসমান হিমবাহর মতন।

প্রশ্ন : বেশ, বেশ, পাথুরে গঠনের ব্যালেন্সটা নষ্ট হচ্ছে কী করে?

মা : পৃথিবীর এই মুখখানার অদলবদল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী নিজেই; এরই নাম ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। পাহাড়ের গা বেয়ে জল নামছে পাহাড়কে ক্ষইয়ে দিয়ে, ঝড়বাতাসেও ঘটছে সেই কাণ্ড, রাবিশ জমছে পাশের চ্যাটালো জমিতে, টন-টন ধুলো এক জায়গা থেকে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে আর এক জায়গায়। এ সবের ফলে ব্যালেন্স নষ্ট তো হবেই।

প্রশ্ন : মাধ্যাকর্ষণ তখন কী অপকর্মটা করছে?

মা : অপকর্ম বলছিস কেন? মাধ্যাকর্ষণ তো চাইছে আগেকার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে যাওয়া দরকার। তখন পাথর বয়ে যেতে থাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়—ছাঁচে ফেলে শীতল ইস্পাতকে চাপ মারলে যা হয়, ঠিক তাই। ফলে, আশপাশের পাথুরে গঠনে চাপ পড়ে আর টানাটানি চলে প্রচণ্ড রকমের; শেষে তাতে ফাটল ধরে।

প্রশ্ন : তবে যে শুনি পৃথিবী তরল থেকে শক্ত হচ্ছে বলেই ছোট হচ্ছে, খোসা ফাটছে, পাহাড় ঠেলে উঠছে, জমি ঢেউ খেলে যাচ্ছে—ভূমিকম্পও হচ্ছে। এ-তত্ত্ব কি ভুল?

মা : অনেকেরই আপত্তি আছে এ-তত্ত্বে। প্রথমত, পৃথিবীর জন্ম যে এইভাবেই হয়েছে, তাতে কোনও নিশ্চয়তা নেই। যদি তাই হত, তাহলে আপেলের খোসা কুঁচকে যাওয়ার মত পৃথিবীর জমিও অসংখ্য জায়গায় গায়ে-গায়ে লেগে কুঁচকে থাকত। কিন্তু তা তো নয়। বড় পর্বতমালাগুলো বেশ দূরে দূরে রয়েছে বিশেষ কয়েকটা বলয়ের মধ্যে। স্থানচ্যুতি তত্ত্ব আরও আছে। যেমন, ভূত্বকের অনেক নিচে পরিচলন প্রবাহ মহাদেশের মত পাথরের চাইগুলোকে শম্বুকগতিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেই যাত্রাপথে তারা মাটিকে কুঁচকে দিয়ে পাহাড়দের ঠেলে তুলছে—এবং ভূমিকম্প হচ্ছে। আর একটা তত্ত্ব অনুসারে, ভূত্বকের তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থরা এত বেশি উত্তাপ সৃষ্টি করে চলেছে যে, আশপাশের পাথর প্রসারিত হচ্ছে—ফলে, চাপ মেরে ভূমিকম্প ঘটাচ্ছে।

প্রশ্ন : অগ্ন্যুৎপাত থেকেও তো ভূমিকম্প হয়?

মা : তা তো হয়ই। আগ্নেয়গিরির ভেতরে বিস্ফোরণের ফলে অথবা পাথুরে গঠনে ফাটল ধরে বলেই ভূমিকম্প হয়। তবে হ্যাঁ, আগ্নেয় ভূমিকম্পের দাপট হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় আগ্নেয়গিরির ধারেকাছে। দূরে-দূরে তা বোঝা যায় না। কিন্তু পাথুরে গঠনের ওপর চাপ জমতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে—তারপর আর সইতে পারে না। বেদম বোঝায় কাতর উটের পিঠে একটি মাত্র ঘাস ফেললে যা হয়—এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। চাপ সইতে-সইতে পৃথিবীর পাথুরে গঠন যখন হাঁসফাঁস করতে থাকে, তখন সামান্য কারণেই চৌচির হয়ে যায় পাথর—ঘটে ভূমিকম্প। আচমকা সরে যায় চাপ আর টানে কাতর পাথুরে স্তর—কেঁপে ওঠে গোটা পৃথিবীটা।

প্রশ্ন : গোটা পৃথিবী ঝাঁকুনি খায় কেন?

মা : পুকুরের জলে ঢিল ফেললে ঢেউ ছুটে যায় চারদিকে। কিন্তু পৃথিবীর এক জায়গায় কাঁপুনি শুধু পৃথিবীর ওপর দিক দিয়ে যায় না—সব দিক দিয়েই যায়। যে-জায়গাটা কাঁপুনির উৎস তাকে বলা হয় ফোকাস বা কেন্দ্র। আর খাড়া ওপরে ভূপৃষ্ঠের জায়গাটাকে বলা হয় এপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র। তীব্রতম ভূমিকম্প ঘটে শুধু উপকেন্দ্রর জায়গাগুলোতেই। তখন তা মারাত্মক আর প্রলয়ঙ্কর।

প্রশ্ন : জাপানে কি ধরনের ভূমিকম্প হয়, মা?

মা : আগ্নেয়গিরির শক্তির জন্যে।

প্রশ্ন : অন্য সব ছোটখাট ভূমিকম্পের কারণ?

মা : কারণ অনেক। একটা হচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চলে বড় রকমের ধস।

প্রশ্ন : কাঁপুনির ঢেউ নিশ্চয় অনেক রকমের হয়?

মা : সবচেয়ে হাইস্পিডের ঢেউটা ছোটে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল গতিবেগে—মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে। সবার আগে আসে এই তরঙ্গ। তাই এর নাম primary wave বা P-wave; তারপরেই আসে ঘণ্টায় প্রায় তিন মাইল বেগে secondary wave বা S-wave। P-wave পৃথিবীর বস্তুকণার আয়তন পাল্টে দেয় বলে ভূত্বকে ফাটল ধরে। এই কাঁপুনির ফলে বস্তুকণা পেণ্ডুলামের মতো সামনে পিছনে দুলতে থাকে তরঙ্গ যেদিকে ধেয়ে

যেতে চাইছে সেই বরাবর। S-wave বস্তুকণার আকার পাল্টে দেয়—বস্তুকণাকে কাঁপাতে থাকে—ছুটে যায় সবদিকে।

প্রশ্ন : ভূমিকম্প নাকি মাটিকে হাঁ করিয়ে বাড়ি-গ্রাম গিলিয়ে নেয়?

মা : অনেকের বিশ্বাস, এহেন ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মাটি কাঁপে ভয়ানক ভাবে ঠিকই, ঠিকরে পড়ে চেয়ার-টেবিল, ছিটকে যায় আসবাব। নড়ে যায় বাড়ির ভিত, চিড় ধরে দেওয়ালে। কাঁপুনি বেজায় রকমের হলে ভিত ছেড়ে বাড়ি সরে যায় অন্য জায়গায়, নয়তো হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে। আরও ভয়ঙ্কর কাঁপুনি মাটি ফাটিয়ে দেয়, ফাটল বরাবর জমি বিশ ফুট পর্যন্ত ছিটকে যেতে পারে; মাটি কোথাও খাড়াভাবে বসে যায়, কোথাও উঠে আসে। মাটিতে হাঁ দেখা দেয় ঠিকই—কিন্তু গোটা বাড়ি বা আস্ত একটা গ্রামকে কোঁৎ করে গিলে ফেলতে পারে—একদল বৈজ্ঞানিক এই বিশ্বাসকে পাত্তা দেন না। অথচ আলাস্কায় এই রকম ঘটনাই ঘটেছিল।

প্রশ্ন : বাড়ি গিলেছিল পৃথিবী?

মা : বাড়ি-গাড়ি সব তলিয়ে গিয়েছিল আলাস্কা-র অ্যাঙ্কোরেজ শহরের রাস্তা দু-ফাঁক হয়ে যাওয়ায়। একশ মাইল দূরের এপিসেন্টার থেকে মাটির কাঁপুনি তেড়ে এসে এই কাণ্ড ঘটিয়েছিল ১৯৬৪-র গুড ফ্রাইডে-র দিনটিতে। আশি হাজার বর্গ মাইল জুড়ে জমি যে উঠছে আর নামছে—তা চোখে দেখা গেছিল।

প্রশ্ন : ভূমিকম্পের আওয়াজে নাকি পিলে চমকে যায়?

মা : মাথার চুল খাড়া করে দেয় বইকি। এই আওয়াজের সবটা অবশ্য পৃথিবীর পেট থেকে আসে না। বাড়ি চৌচিরের শব্দ, ইঁট পাথর আছড়ে পড়ার কানে তালা লাগানো আওয়াজ, আতঙ্ক আর্তনাদ—সব মিলিয়ে সে এক অবর্ণনীয় শব্দ-লহরী। এর সঙ্গে মেশে মাটি ফুটিফাটা হওয়ার আওয়াজ। লোমখাড়া তো হবেই।

প্রশ্ন : ভূমিকম্প শুধু ডাঙায় হয় কেন, মা?

মা : সমুদ্রেও হয় রে—তখন তার নাম সমুদ্রকম্প। ধারেকাছে জাহাজগুলোর আছাড়ি-পাছাড়ি দেখে মনে হয় বুঝি চোরা পাহাড়ে ধাক্কা মেরেছে। বড় বড় ঢেউ ধেয়ে যায় ডাঙার ভূমিকম্পের রেশ নিয়ে। সমুদ্রের তলায় চ্যুতির জন্যে দানবিক তরঙ্গ ভয়ঙ্কর করে তোলে সমুদ্রকে। পুকুরের বা হ্রদের জল চঞ্চল হয় কিন্তু অদ্ভুতভাবে—দোলকের মত দুলতে থাকে সামনে পেছনে।

প্রশ্ন : সমুদ্রের তলায় জমিতেও ভূমিকম্প হয়?

মা : কেন হবে না? তখন তাকে সাবমেরিন ভূমিকম্প বলা হয়। এর ফলে জাগে জলোচ্ছ্বাস—জাপানিরা যার নাম দিয়েছে সুনামি। সুনামি-র আগে একটা 'ৎ' আছে, বাঙালি জিভে আসে না বলে উচ্চারণ করতে পারলাম না।

প্রশ্ন : জলোচ্ছ্বাসের নাম সুনামি?

মা : জলোচ্ছ্বাসকে ইংরেজিতে বলা হয় Tidal wave; ভুল নাম। এর পেছনে Tide অর্থাৎ জোয়ার-ভাঁটা নেই—আছে ডুবো ভূমিকম্প। সুনামির স্পিড শুনলে হাঁ হয়ে যাবি। ঘন্টায় ৪৫০ মাইল পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। গভীর সমুদ্রে কিন্তু সুনামির অস্তিত্ব টের পাবি না। একটা দানব-তরঙ্গ থেকে আরেকটা দানব-তরঙ্গের ব্যবধান কমসেকম ১০০ মাইল—অথৈ জলে তাই টের পাওয়া যায় না। কিন্তু হাড় হিম করে দেয় তীরের কাছে এসে—বিশেষ করে যদি তীরভূমি হয় বেশ ঢালু। প্রথমেই মনে হবে যেন হঠাৎ ভাটার টান এসেছে—ঝাঁ করে

নেমে যাবে জল। তারপরেই ফিরে আসবে পঞ্চাশ থেকে দু-শ ফুট কি তারও বেশি উঁচু ঢেউ সৃষ্টি করে—ডুবিয়ে দেয় গ্রাম, শহর—ডাঙার অনেক ভেতর পর্যন্ত চালিয়ে যায় তাণ্ডব নৃত্য।

প্রশ্ন : ভূমিকম্প মাটি কাঁপাচ্ছে, জল ক্ষেপাচ্ছে, আর কী করছে?

মা : শহরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। জ্বলন্ত উনুন থেকে আগুন ধরে গেলে নিভোনোর জল পাওয়া যায় না, জলের পাইপ ফেটে যায় বলে। যা হয়েছিল লিসবন শহরে—মারা গিয়েছিল বিশ হাজার মানুষ। তিন দিন ধরে আগুন তাথৈ-তাথৈ নাচ নেচেছিল সানফ্রান্সিসকোয়—ডিনামাইট ফাটিয়ে বাড়ি শুইয়ে দিয়ে ঠেকাতে হয়েছিল আগুয়ান আগুনকে। মেসিনা অন্তরীপের (Strait) দু-পাশের দুটো শহরে এক লাখেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল শুধু বাড়ি চাপা পড়ে। বেজায় অলিগলির শহর তো—ভূমিকম্প তেমন জোরালো হয়নি—কিন্তু পাথরের বাড়ি তাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়েছে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা পেল্লায় সুনামি তেড়ে এসে দুটো শহরেই উদ্দাম নাচ নেচে গেছে। জাপানেও আগুন লেগে মারা গিয়েছিল এক লাখ মানুষ। মাটিতে মিশে গিয়েছিল পাঁচ লাখ বাড়ি। জলের তোড়ে ক্ষয়ে গোল হয়ে যাওয়া বিশাল-বিশাল পাথরের চাঁইকে বোমার মত ফাটিয়ে দিয়েছে উত্তর আসামের পাহাড়ি ভূমিকম্প ১৯৫০-এর অগাস্টে। এ-দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন বৃটিশ প্রকৃতিবিদ কিঙডন-ওয়ার্ড। থর থর কাঁপুনির চোটে আবছা হয়ে গিয়েছিল আশপাশের গাছ-পাথর—জমিতে জেগেছিল লম্বা লম্বা ফাটল। সাহেবের তাঁবুতে কিন্তু উল্টে গিয়েছিল শুধু এক গেলাস জল। একেই বলে সাহেবি কপাল!

প্রশ্ন : এ রকম ভয়ানক ভূমিকম্প ভারতে আর ঘটেনি?

মা : বিখ্যাত ভূমিকম্পের লিস্টে পাঁচবার নাম উঠেছে ভারতের। ১৭৩৭-এ কলকাতায়, ১৮৯৭-এ আসামে, ১৯০৫-এ কাংরায়, ১৯৩৪-এ বিহার আর নেপালে, ১৯৫০-এ তিব্বত, চীন, বর্মায়। আসামে পাহাড় ঠেলে উঠেছিল পাঁচ থেকে বিশ ফুট, ইমারত থেকে জঙ্গল—অক্ষত থাকেনি কিছুই। পঞ্জাবের কাংরায়, হিমালয়ের পায়ের তলায়, পনের লক্ষ বর্গ মাইল জায়গায় মারা গেছিল বিশ হাজার মানুষ। প্রায় বিশ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে মাটি কেঁপেছিল বিহার আর নেপালে—পর-পর ধস নামায়। তিব্বতের পাহাড় ঠেলে ওঠায় পাল্টে গেছিল চীন, তিব্বত, ভারত, ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন : সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেছে কোন্ ভূমিকম্পে?

মা : চীন দেশের সাঙক্সি জেলায় ভূমিকম্পে। ১৫৫৬ সালে। মারা গেছিল আট লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষ। গুহা ধসে জ্যান্ত চাপা দিয়েছিল, তারপর লেগেছিল দুর্ভিক্ষ আর মড়ক।

প্রশ্ন : অ্যাঙ্কোরেজ শহরের মাটির নাচুনি কিন্তু দেখবার মত দৃশ্য; তাই না, মা?

মা : আরও নাচিয়েছিল নাকি ইংল্যাণ্ডের কোলচেস্টার শহরকে ১৮৮৪-র ২২ এপ্রিল—কাঁপিয়ে ছেড়েছিল গোটা ইংল্যাণ্ডকে। ভূমিকম্প মাটি হাঁ করিয়ে বাড়ি গেলায় এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরাও কিন্তু জানেন, ১০৩ সালে সমারসেটের একটা আস্ত শহর গিয়েছিল ধরিত্রীর উদরে—অথচ ভূমিকম্প বলয়ের মধ্যে পড়ছে না ব্রিটেন দেশটা।

প্রশ্ন : ভূমিকম্প বলয় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে?

মা : ভূমিকম্প যে-যে জায়গায় সবচেয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটায়, সেই সব জায়গার ম্যাপ বানিয়ে দেখা গেছে, এগুলো কটিবন্ধের মত ঘিরে আছে প্রশান্ত মহাসাগরকে। প্রশান্তের জলপূর্ণ গর্তটাও তো আগ্নেয়গিরি দিয়ে

আংটির মত ঘেরা। একে বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়। এখানে ঘটে ৬৮ শতাংশ ভূমিকম্প। আরেকটা হল ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্প। —দক্ষিণ ইউরোপ থেকে হিমালয়ের পায়ের তলা পর্যন্ত—এখানে ঘটে ২১ শতাংশ ভূমিকম্প। বাকি ১১ শতাংশের জন্যে বিশেষ কোনও বলয় নেই—যেখানে-সেখানে।

প্রশ্ন : যেখানে-সেখানে ঘটে ভূমিকম্প?

মা : এদের মধ্যেই পড়ে ক্ষুদেকম্প বা মাইক্রোসাইজমস—যা যন্ত্রে ছাড়া ধরা পড়ে না; এই কাঁপুনির কারণ-টারণগুলো সঠিক জানা যায়নি। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, সমুদ্রের ঢেউ উপকূলে আছড়ে গোটা মহাদেশকে কাঁপিয়ে চলেছে। অথাৎ মহাদেশকম্প থেকে ক্ষুদেকম্পের উৎপত্তি। মোট কথা, বলয়ের বাইরেও ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটেছে। বৈজ্ঞানিকরা ভূমিকম্পের কুসংস্কার কাটিয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন না কবে কখন কোথায় কাঁপবে মাটি। সে রকম যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে সাইজমোগ্রাফ কাজ দিয়েছে যথেষ্ট।

প্রশ্ন : সাইজমোগ্রাফ?

মা : যে-যন্ত্র ভূমিকম্প-তরঙ্গদের ফর্দ বানাতে পারে, তার নাম সাইজমোগ্রাফ; এই ফর্দ বা লিস্টের নাম সাইজমোগ্রাম। ভূমিকম্পের এই তরঙ্গ-তালিকা থেকে কিন্তু পৃথিবীর ভেতরকার গঠনবৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা এসে গেছে। এমনকি, কোথায় তরল সোনা, মানে, পেট্রল আছে—এই যন্ত্র তা বলে দেয়। তরঙ্গ-তালিকা ঘেঁটেই প্রায়-নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, পৃথিবীর খোসাটায় রয়েছে কঠিন স্তর, তার নিচেও রয়েছে কঠিন আবরণ কেন্দ্রের দিকে; কেন্দ্রটা কিন্তু তরল—কিছু ভূমিকম্প বিজ্ঞানীর মতানুসারে। আর একটা তত্ত্ব বেশি সমর্থন পেয়েছে: পৃথিবীর কেন্দ্রের বাইরেটা তরল, ভেতরটা নিরেট।

প্রশ্ন : সাইজমোগ্রাফ যন্ত্রটা তো তাহলে দারুণ?

মা : গোড়ায় কিন্তু একটা পেণ্ডুলাম—এই হল সাইজমোগ্রাফ। দোলকের নিচে একটা কলম কাগজ ছুঁয়ে থাকে। মাটি কাঁপলেই লম্বভাবে সেই কলম কাগজে রেখাচিত্র এঁকে যায়। মোদ্দা ব্যাপারটা এই।

প্রশ্ন : ভূমিকম্পের তেজ মাপবার কোনও স্কেল কি আছে?

মা : আছে বৈকি। দুটো স্কেল। রিখটার স্কেল দিয়ে বলা যায়, ভূমিকম্পের ফলে কতটা শক্তি বেরিয়ে এল। এক পয়েন্ট বৃদ্ধি মানেই বুঝতে হবে, তার নিচের সংখ্যার দশগুণ বৃদ্ধি। তার মানে, ৫ সংখ্যক ভূমিকম্পের তীব্রতা ৪ সংখ্যকের চেয়ে দশ গুণের বেশি, ১০০ গুণ বেশি ৩ সংখ্যকের চেয়ে, ১০০০ গুণ বেশি ২ সংখ্যকের চেয়ে। সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পের তেজ ৮.৯—লিসবন শহরে ঘটেছিল ১৭৫৫ সালে। ক্যালিফোর্নিয়ার চার্লস রিখটার ১৯৩৫ সালে এই স্কেল আবিষ্কার করেছিলেন। তারও আগে ১৯০২ সালে ইটালির মার্কালি সাহেব ভূমিকম্পগুলোকে ১৩ ভাগে ভাগ করেছিলেন; এই স্কেলের নাম মার্কালি স্কেল। প্রথম ভাগের ভূমিকম্প শুধু যন্ত্রে ধরা পড়ে, সবশেষ ভাগে কাঁপুনিতে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়—মাটির ঢেউ চোখে দেখা যায়।

প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় সুনামি কোথায় দেখা গেছে, মা?

মা : পশ্চিম প্রশান্তের ঈশিগাকি দ্বীপের ওপর দিয়ে গজরাতে গজরাতে ছুটে গিয়েছিল ২৭৮ ফুট উঁচু একটা ঢেউ ১৯৭১-এর এপ্রিলে। দ্বীপ ভাসিয়ে দিয়ে মিশে গিয়েছিল খোলা সমুদ্রে। শুনলে অবাক হবি, সবচেয়ে উঁচু সমুদ্র-তরঙ্গটা কিন্তু সুনামি নয়।

প্রশ্ন : সে কি! দানব-তরঙ্গের নাম সুনামি নয়?

মা : কারণ তার জন্ম ভূমিকম্প থেকে নয় বলে। ১৯৫৮ সালে আলাস্কা-র লিটুয়া উপসাগরে ন'-কোটি টন ওজনের পাথর খসে পড়ে। একটি মাত্র অতিকায় ঢেউ ঠেলে উঠে রে-রে করে ধেয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেয় উল্টো দিকের পাহাড়। ১৭০০ ফুট উঁচু এই ঢেউ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জব্দ হয়ে গিয়ে মাথা হেঁট করে ফিরে আসে একই উপসাগরে—তখনও তার মাথা ছিল ২০০ ফুট উঁচুতে!

প্রশ্ন : অ্যাঙ্কোরেজ শহরের জমির নাচ জলকে নাচায়নি কেন?

মা : নাচিয়েছিল বৈকি। জমির ওঠানামার একটু পরেই তেড়ে এসেছিল সুনামির দানব-তরঙ্গ। তার কয়েক ঘণ্টা পরে আর একটা সুনামি মার-মার করে ধেয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল ১৮০০ মাইল দূরের ক্যালিফোর্নিয়ার শহর ক্রেসেন্ট সিটিতে।

প্রশ্ন : সবচেয়ে বেশি লোক মেরেছে কোন্ সুনামি?

মা : ১৮৮৩-র ২৭ অগাস্ট ক্রাকাতোয়া-র অগ্ন্যুৎপাতে পর-পর সুনামি জন্ম নিয়ে খতম করেছিল প্রায় ছত্রিশ হাজার মানুষ।

প্রশ্ন : কলকাতায় সুনামি আসবে না তো?

মা : এলে তো কলকাতার জঞ্জাল কয়েক মিনিটেই সাফ হয়ে যেত!

আগ্নেয়গিরি

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরির নাম ভলক্যানো হল কেন, মা?

মা : বিশ্বকর্মা দেবতাদের এঞ্জিনীয়ার—বলছে আমাদের পুরাণ। রোমানদের পুরাণ বলছে—দেবলোকের কারিগরের নাম ভলকান। ভলকানের কামারশালা ছিল নাকি ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে। গুড় গুড় গুম্‌গুম্ আওয়াজ শোনা গেলে, সেই সঙ্গে চুড়ো দিয়ে আগুন আর ধোঁয়া বেরোলেই রোমানরা বলত, এইরে! ভলকান কাজ শুরু করে দিয়েছেন কামারশালায়—হাতুড়ি পিটছেন নেহাইয়ে—বানাচ্ছেন আকাশের বাজ! এইভাবেই আগ্নেয়গিরির নাম হয়ে গেল ভলক্যানো। রোমানদের কাছ থেকে শিখল গোটা ইউরোপের মানুষ। ভলক্যানো মানেই ভলক্যানোর কামারশালা!

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরির মধ্যে পালের গোদা তাহলে ভিসুভিয়াস?

মা : যে অন্ধবিশ্বাস থেকে ভলক্যানো নামকরণ, সে-কথা বলতে গেলেই ভিসুভিয়াসের কথা বলতে হয়। অনেকদিন দামালি বন্ধ রেখেছিল ভিসুভিয়াস। ভলকানের কারখানা লাটে উঠেছে, ভেবেছিল রোমানরা। হাজার বছর গেল কেটে। ভিসুভিয়াসের সারা গা সবুজ হয়ে উঠল গাছপালা ফলফুলে। অনেক শহর গড়ে উঠল তলায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর দুটোর নাম হারকুলেনিয়াম আর পম্পেই। বড়লোকদের শহর। আনন্দে ভরা শহর। নিরানন্দ নেমে এল কিন্তু একদিনেই। আজ থেকে প্রায় উনিশ'শ বছর আগে—৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগাস্ট।

প্রশ্ন : কামারশালা ফের চালু করলেন বুঝি ভলকান?

মা : বড় ভয়ানক ভাবে শুরু করলেন। ২৩ অগাস্ট খুব মাটি কেঁপেছিল, গল্ গল্ করে ধোঁয়া উঠেছিল চুড়ো দিয়ে। শান্ত সুন্দর পাহাড়টার আচমকা বেয়াড়াপনা দেখে হতভম্ব হল সবাই। ২৪ অগাস্ট মাটি কাঁপল আরও জোরে, গুম্ গুম্ গজরানি শোনা গেল ভিসুভিয়াসের পেটের মধ্যে—তারপরেই এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সাদা ধোঁয়ার মত মেঘ বেরিয়ে এল চুড়ো থেকে—মুহূর্তের মধ্যে সাদা মেঘ হয়ে গেল কালো মেঘ—মুষলধারে ছাই আর পাথর আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল পম্পেই শহরের ওপর। সেই সঙ্গে ভূমিকম্প। দমাদম

ধরাশায়ী হল বাড়ির পর বাড়ি। শুরু হয়ে গেল অগ্নিকাণ্ড। বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল শহরময়। পাতালঘরে আর বন্ধ ঘরে ঢুকেও কেউ রেহাই পেল না। মণিমুক্তোর থলি নিয়ে পালাতে গিয়ে বড়লোকরা যেমন রাস্তায় শেষ হয়ে গেল—সেইভাবে মৃত্যুবিষের ধোঁয়ায় বদ্ধঘরেও শেষ হয়ে গেল ছোট বড় গরিব বড়লোক—সব্বাই। আট দিন আট রাত আগুন, পাথর আর ছাই বমি করে গোটা পম্পেই শহরটাকে নিখুঁতভাবে কবর দিয়ে গেল একা ভিসুভিয়াস।

প্রশ্ন : হারকুলেনিয়াম শহরকে খতম করল কীভাবে?

মা : ধোঁয়া ওঠা ফুটন্ত, জ্বলন্ত আর তরল কাদার স্রোত বইয়ে দিয়ে। মন্থর গতিতে এগিয়ে এসে ডুবিয়ে দিল অত বড় শহরটাকে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল হারকুলেনিয়াম।

প্রশ্ন : তাহলে এমন নিখুঁত বর্ণনা কে দিল?

মা : রোমান লেখক 'কনিষ্ঠ প্লিনি'। সতেরো বছর বয়েসে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। দু-দুটো শহরকে ধ্বংস হতেও দেখেছিলেন। লিখে রেখেছিলেন, ২৪ অগাস্টের ছাই-মেঘ বন্যার আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল ধরিত্রীর ওপর দিয়ে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিবরণ তাঁর সেই চিঠির গোছা।

প্রশ্ন : প্লিনি তখন কোথায় ছিলেন?

মা : কুড়ি মাইল দূরে। অতদূর থেকেও দেখেছেন, কীভাবে কুচকুচে কালো আর ভয়ানক চেহারার মেঘ মোচড় মেরে-মেরে বেরিয়ে ঠিক যেন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দমকে দমকে...আগুনের লকলকে জিভ দেখা গেছে অবিকল বিদ্যুৎশিখার মতন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরে বড় বড় বাড়িগুলোর গোড়া পর্যন্ত এক-এক টানে উপড়ে আনা হয়েছে। পরের দিন প্লিনি চলে গেলেন সমুদ্রের ধারে। দেখলেন, মাটি এমনই থরথর করে কাঁপছে যে সমুদ্র পর্যন্ত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে—তলা দেখা যাচ্ছে। সেইদিনই বিকেল নাগাদ কালো মেঘ তেড়ে এল প্লিনির দিকে—গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক—প্লিনির তখন মনে হয়েছিল, ঠিক যেন বদ্ধঘরে বন্দী হয়েছেন—আলো পর্যন্ত ঢুকছে না সে ঘরে। ঘণ্টা কয়েক পরে কেটে গেল মেঘ—দেখা গেল ধুধু ভূদৃশ্য—পুরু ছাইয়ে ঢাকা ঠিক যেন বরফের চাদর পাতা, বিশ হাজার মানুষ বলি হয়ে গিয়েছিল ভিসুভিয়াসের রুদ্ররোষে। লুঠপাট চলেছিল শহরে শহরে—তারপর চম্পট দেয় প্রত্যেকেই। ১৭৪৮ সালে পরিত্যক্ত শহর দুটোকে নতুন করে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরলেন আলকুবিয়েরে নামে এক এঞ্জিনীয়ার—নেপলস-এর রাজার হুকুমে।

প্রশ্ন : প্লিনির বর্ণনা যে বৈজ্ঞানিক, তা জানছো কীভাবে?

মা : বৈজ্ঞানিকরা এ যুগে অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে যা জেনেছেন, তার সঙ্গে যে মিলে যাচ্ছে। যেমন ধর, গ্যাস আর শক্ত জিনিস আগ্নেয়গিরির পেট থেকে সোজা উঠে যায় অনেক ওপরে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা পাইন গাছ। লেখক প্লিনির কাকা ঠিক সেই উপমাই দিয়েছেন। ইনি ছিলেন বিজ্ঞান-জানা মানুষ আর নৌ-সেনাপতি। পাহাড়ের মাথার ফুটো দিয়ে শক্ত জিনিস ঠেলে বেরোলে ঘষাঘষি তো লাগবেই। তখন তৈরি হয় স্থির বিদ্যুৎ। চিরুনি দিয়ে শুকনো চল অনেকক্ষণ ধরে আঁচড়ালে যা হয়—তাই। স্পার্কের আওয়াজ তখন বাজের আওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়—সাপের চেরা জিভের মত বিদ্যুৎশিখার ঘন ঘন ঝলক দেখা যায়, জ্বালামুখের জ্বলন্ত লাভার আলোয় গনগনে দেখায় গ্যাস আর পাথরের থাম—মনে হয় যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে অপরূপ পাইন গাছ। কখনো কখনো এই স্তম্ভ বা পাইন গাছ এত ঘন হয় যে, সূর্যের মুখ ঢেকে দিয়ে আচমকা

অমাবস্যার অন্ধকার বানিয়ে নেয়। তেড়েমেড়ে উঁচুতে উঠে গিয়ে বাষ্প জমে জল হয়ে যায়—মুষল ধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। বৃষ্টির জল কাদাটে নদীর আকারে নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ধারায়—ডুবিয়ে দেয় সানুদেশের শহর।

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরির গ্যাসে কী কী থাকে, মা?

মা : বেশির ভাগই বাষ্প—অতিমাত্রায় গরম—হাজার ডিগ্রি ফারেনহিট পর্যন্ত হতে পারে। অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে থাকতে পারে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর আরগন। গন্ধকের নানারকম যৌগিক পদার্থ—যেমন, হাইড্রোজেন সালফাইড আর সালফার-ডাই-অক্সাইড। গ্যাস শুধু আগ্নেয়গিরির ফুটো দিয়ে বেরোয় না—লাভা থেকেও বেরোয়। অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হয়ে যাবার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরেও দেখা যায় ভুর ভুর করে গ্যাস বেরোচ্ছে লাভার স্রোত থেকে।

প্রশ্ন : লাভা বেরোবেই অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে, তাই না, মা?

মা : অগ্ন্যুৎপাত ঘটলেই যে লাভা বেরোবে—এমন কোনও কথা নেই। প্রথমে 'কেশে গলা সাফ' করে নেয় আগ্নেয়গিরি—অতিগরম বাষ্প আর গ্যাস ঠেলে তুলে দেয় শূন্যে—তরল ধাতুর ফোয়ারার মতন লাভার স্রোতও উঠে যেতে পারে সেইসঙ্গে। সাধারণত লাভা গড়িয়ে নামে পাহাড়ের গা বেয়ে। কম গরম বলে, ভেতরে কম গ্যাস থাকে বলে আর বেশি থকথকে হলে ফাটলের চারধারে জমে গিয়ে খাড়াই গম্বুজ বানিয়ে নেয়। একে বলে 'প্লাগ ডোম'। লাসেন ভলক্যানিক ন্যাশনাল পার্কে এইরকম মোচার মতন দেখতে গম্বুজ ভলক্যানো আছে তেরোটা পঞ্চাশ বর্গমাইলের মধ্যে। এর ব্যতিক্রমও আছে। ১৯০২ সালে মাউন্ট পিলী-র আগুন-বমিতে লাভা ছিল না এক কণাও।

প্রশ্ন: অগ্ন্যুৎপাতে লাভা ছিল না? কেন, মা?

মা : ফাটলের কাছে এসে লাভা জমে গিয়েছিল যে। অস্বাভাবিক একটা 'প্লাগ ডোম' তৈরি হয়ে গিয়েছিল মাউন্ট পিলীর চুড়োয়—হাজার ফুট উঁচু। অদ্ভুত সেই গড়ন দেখে লোকে বলেছিল, মাউন্ট পিলী মেরুদণ্ড বানিয়ে নিচ্ছে! কিন্তু সে মেরুদণ্ড টেকেনি। ঘন ঘন গ্যাসের বিস্ফোরণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয় গিয়েছিল শিরদাঁড়া।

প্রশ্ন : লাভা কত রকমের হয়, মা?

মা : ব্লক লাভা আর কর্ডেড লাভা। বেশি থকথকে হলে ব্লক লাভা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে পাথরের রকমারি চাঙর বানায় বলে—হাওয়াই ভাষায় এর নাম aa; লাভা যখন বেশি তরল থাকে, তখন তার নাম কর্ডেড লাভা—শুকিয়ে গেলে দড়ির মত পাকিয়ে যায় বলে—হাওয়াই ভাষায় এর নাম pahoehoe.

প্রশ্ন: লাভা ঠাণ্ডা হতে কত সময় নেয় বলবে?

মা : তোর মাথার মতই বড্ড বেশি সময় নেয়। ১৮৩০ সালে দেখা গিয়েছিল সিসিল-এর এটনা আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে বাষ্প বেরোচ্ছে। অথচ সেই লাভা এটনা-র পেট থেকে বেরিয়েছিল তেতাল্লিশ বছর আগে। ১৭৫৯ সালে লাভার স্রোত নেমেছিল মেক্সিকো-র জোরুল্লো আগ্নেয়গিরি থেকে। সাতাশি বছর পরে দেখা গেল, লাভা থেকে দু-দুটো থামের আকারে বেরোচ্ছে বাষ্প।

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরি থেকে কী কী জিনিস বেরোয়, মা?

মা : লাভা ছাড়াও বেরোয় পাথর, আধপোড়া কয়লা বা অঙ্গার আর ছাই। ১৭৭৯ সালে ভিসুভিয়াস আর একবার রেগে গিয়ে দশ হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত আধপোড়া কয়লা ছুঁড়ে মেরেছিল। ১৮১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ সুমবাওয়া-র আগ্নেয়গিরি তামবোরা থেকে এত ঝামাপাথর বেরিয়ে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ঠেলে যেতেও পারেনি জাহাজের দঙ্গল। উত্তর-মধ্য ইকুয়েডর-এর আগ্নেয়গিরি টোটোপাক্সি নাকি দু-শ টন ওজনের একটা পাথরের চাঁই ছুঁড়ে দিয়েছিল ন' মাইল দূরে। আগ্নেয়গিরির ধারেকাছে লাভা, পাথর আর বালি কি ধরনের অবিশ্বাস্য অনুপাতে জমতে থাকে, তার পিলে-চমকানো নিদর্শন। পারিকুটিন আগ্নেয়গিরির জন্ম।

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরির জন্ম! সে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কে দেখেছে, মা?

মা : দুলর্ভ সেই সৌভাগ্য হয়েছিল মেক্সিকোর এক রেড ইণ্ডিয়ানের—নাম তার ডাইয়োনিসিয়ো পোলিডো। চাষী মানুষ। কিছুতেই ফসল ফলাতে পারেনি এক টুকরো নিচু জমিতে। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রোদে কাহিল ডাইয়োনিসিয়ো পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলেছিল সেই জায়গায়। আগে থেকেই তেতে ছিল জায়গাটা। এখন দেখা গেল, ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে, সিগারেটের ধোঁয়া নয়। মাটি ফেটে গেছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে তার ভেতর থেকে, সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে গুড়-গুড় পাতাল গজরানি। আচমকা দুলে উঠল পায়ের তলার মাটি। সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা যেন ফেটে গেল ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে—চৌচির হয়ে গেল নিচু জায়গাটা। মাটিতে ঠিকরে পড়েই উঠে দাঁড়িয়ে চোঁ-চোঁ দৌড়েছিল ডাইয়োনিসিয়ো। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে ছানাবড়া-চোখ মেলে দেখেছিল, ফাটলের মুখে পাথরের টুকরোর এক অকল্পনীয় ফোয়ারা তৈরি হয়ে গেছে—বিপুল বেগে সটাসট পাথর ছিটকে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

প্রশ্ন : গল্প বলছ নাকি?

মা : সত্যি ঘটনা গল্পকেও হার মানায়। তিন মাইল দূরে সানজুয়ানে গিয়ে পুরুতঠাকুরের পায়ে আছড়ে পড়েছিল ডাইয়োনিসিয়ো দলবল নিয়ে ফিরে এসে দেখেছিল অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য। নিচু জমিটায় একটা পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে—পাথর আর ছাই দিয়ে তৈরি কালো পাহাড়। চুড়োর ফুটো দিয়ে বিরামহীনভাবে ঠিকরে বেরোচ্ছে পাথর, গল গল করে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। বালি আর পাথরের পরেই অবিরাম ধারায় বেরোতে থাকে লাভা। এই জিনিসগুলোই জমতে জমতে ফ্যানটাসটিক স্পিডে জন্ম নিল নতুন এক আগ্নেয়গিরি। কাছের গ্রামের নাম অনুসারে তার নাম দেওয়া হল পারিকুটিন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই উচ্চতা দাঁড়ালো ভিসুভিয়াসের তিন ভাগের এক ভাগের বেশি। ভিসুভিয়াস এই উচ্চতায় পৌঁছোতে সময় নিয়েছে কিন্তু অনেক হাজার বছর। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের হাতে-কলমে অনেক শিখিয়ে গেছে এই পারিকুটিন—এখন সে ঘুমোচ্ছে—চুড়োটা শুধু উঁচু হয়ে রয়েছে শঙ্কু বা মোচার মত।

প্রশ্ন : ধুলোও তো বেরোয় আগ্নেয়গিরি থেকে?

মা : প্রচুর বেরোয়। ১৮১৫ সালে তাম্বোরা-র অগ্ন্যুৎপাতের ধুলো গিয়ে পড়েছিল ৮৭০ মাইল দূরে বোর্নিও দ্বীপে। ১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়া-র অগ্ন্যুৎপাতের বেলায় ১৫০ মাইল দূরেও আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ধুলোর দাপটে, ধুলোর পাহাড় জমে গিয়েছিল হাজার মাইল দূরে। ধুলো যেমন আগ্নেয়গিরির ধারেকাছে গা-ছমছমে আঁধার সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি আশ্চর্য আতশবাজির খেলাও দেখায়। ধুলো ভেদ করে জ্বালামুখের ভেতর থেকে ছিটকে আসে আলোর ঝলক আর গলিত লাভার দ্যুতি। তারপরেও আকাশ জুড়ে শুরু হয় ধুলোর মেঘে অপরূপ আলোর নাচন। অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে ভূগোলক প্রদক্ষিণ করার সময়ে আগ্নেয়ধুলোয়

সূর্যের বিভিন্ন রঙের প্রতিফলন আর প্রতিসরণ ঘটতে থাকে, চোখ ঝলসানো জমকালো সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আবির্ভূত হতে থাকে গোটা পৃথিবী জুড়ে। আগ্নেয়ধুলোর মহিমায় তখন স্তম্ভিত হয়ে যায় পৃথিবীর মানুষ।

প্রশ্ন : বাষ্প জমে গিয়ে যে-জল বানায়, তার কীর্তি কী?

মা : শুধু অপকর্মই করে বেড়ায়। আগ্নেয়ধুলোকে কাদা বানিয়ে হুড় হুড় করে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে সবকিছু ডুবিয়ে দেয়। যেমন ডুবিয়েছিল হারকুলেনিয়াম-কে কোটোপাক্সি-ও দেখিয়েছে ওই একই কীর্তি— জঙ্গলের পর জঙ্গল ঢেকে গিয়েছিল কাদায়। ভলক্যানোরা এই কারণেই ভয়ঙ্কর। অথচ চোখ জুড়িয়ে যায় সাবমেরিন ভলক্যানোদের কাণ্ড দেখলে।

প্রশ্ন : সাবমেরিন ভলক্যানো! সেটা কী?

মা : পৃথিবীর সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো আগ্নেয়গিরি তো এরাই। সমুদ্রের তলায় এরা জন্মায়। যেমন জন্মেছে এটনা, স্ট্রম্বলি, পীক অভ টেনেরিফ এবং আরও অনেকে। মহাসমুদ্রের তলায় ঘাপটি মেরে রয়েছে আরও নওজোয়ান আর নবজাতক, মহাজাতক আর মহাদামাল আগ্নেয়গিরি—কেউ জানে না সংখ্যায় তারা কত। মাঝেমধ্যে অঙ্গার আর বাষ্প উগড়ে দিয়ে তোলপাড় করে তোলে সমুদ্রের ওপরকার জল—তলদেশে কিন্তু লাভার উদগীরণ চলে সমানে। কখনো সখনো এই লাভাই স্তরে স্তরে জমতে-জমতে জন্ম দেয় নতুন দ্বীপের। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়মেখলা তৈরি হয়েছে ঠিক এইভাবে। বড় বিশ্বাসঘাতক হয় কিন্তু এই সাবমেরিন আগ্নেয়গিরিরা।

প্রশ্ন : বিশ্বাসঘাতক আগ্নেয়গিরি? কীভাবে, মা?

মা : নতুন দ্বীপের জন্ম যেমন দেয়, তেমনি আচমকা কোলেও টেনে নিতে পারে পুরনো দ্বীপকে। গড়ছে আর ভাঙছে। একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

প্রশ্ন : দ্বীপ ভাঙা-গড়ার খেলা কেউ দেখেছে?

মা : ভূমধ্যসাগরে ঘুরঘুর করলে তুই নিজেও দেখতে পাবি। সাবমেরিন আগ্নেয়গিরিদের মস্ত ঘাঁটি ওইখানেই। ১৮৩১ সালে সেখানেই জন্ম নিয়েছিল গ্রেহাম দ্বীপ, জল ছেড়ে উঠেছিল ২০০ ফুট উঁচুতে। কিন্তু আলগা পাথরে তৈরি বলে ঢেউয়ের ধাক্কাতেই চোর'পাহাড় হয়ে গেল মাস কয়েকের মধ্যেই। সিসিলি আর গ্রীস দেশের মধ্যে আকছার জন্মাচ্ছে আগ্নেয়দ্বীপ, অদৃশ্যও হয়ে যাচ্ছে ঝটপট।

প্রশ্ন : আগ্নেয়দ্বীপরা বুঝি স্থায়ী হয় না?

মা : হয় বৈকি। বেরিং সাগরের তিনটে দ্বীপ তার চাক্ষুষ প্রমাণ।

প্রশ্ন : লাভার কাজ কি শুধু জমে গিয়ে পাহাড় তৈরি করা?

মা : সব সময়ে নয়। কখনও কখনও অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে—আগ্নেয়শঙ্কু বানায় না। এ-ধরনের লাভা উদগীরণকে বলা হয় ফাটল অগ্ন্যুৎপাত; অথবা, মালভূমি প্রবাহ—কেন না, চ্যাটালো জমি বা মালভূমিকে ঢেকে দেয় এই লাভা। এ লাভা খুব থলথলে আঠার মত হয় না।

প্রশ্ন : কোথায় কোথায় হয়েছে ফাটল অগ্ন্যুৎপাত?

মা : হয়েছে এই ভারতেই। পশ্চিম ভারতের দক্ষিণাপথ অঞ্চলের দু-লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা ঢেকে রয়েছে লাভায়। এখন তা ব্যাসাল্ট পাথর হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় এই লাভা-পাথর দু-হাজার ফুট পুরু। লাভা-মরুভূমিও দেখতে পাওয়া যায় এই পৃথিবীর ওডাহারাউন অঞ্চলে। আগ্নেয়পাথরের আশ্চর্য মরুভূমি।

প্রশ্ন : সর্বনাশ! ভারতেও আগ্নেয়গিরি আছে?

মা : আঁতকে উঠলি দেখছি। বিচিত্র সুন্দর এই আগুন-পাহাড় একটিও নেই ভারতে।

প্রশ্ন : হিমালয় যদি আগ্নেয়গিরি হয়ে যায়?

মা : কোনও কালে হবে না। হিমালয়ের জন্ম পৃথিবীর প্রথম দিকে যখন ভূত্বকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে—তখন। দুপাশের ঠেলা খেয়ে উঠেছিল হিমালয়। তার জন্মরহস্য আর আগ্নেয়গিরির জন্মরহস্য তো এক নয়।

প্রশ্ন : কোন রহস্যময় শক্তি এত জিনিসকে পাতাল থেকে মর্ত্যে তুলে দিচ্ছে, তা কি জানা গেছে?

মা : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অথবা ফাটল অগ্ন্যুৎপাত ঘটে পৃথিবীর জঠরের উত্তাপের জন্যে। এই উত্তাপের সঠিক উৎস কী, এখনও জানা যায়নি। রহস্যটা এইখানেই। একদল ভূতত্ত্ববিদের মতে, সৃষ্টির প্রথমপর্বে গোটা পৃথিবীটাই ছিল গলিত আর তরল অবস্থায়। তারই কিছু এখনও রয়ে গেছে পেটের মধ্যে—এত গরম আর এত আগুন বমি সেই কারণেই—পেট গরম থাকলে যা হয় আর কি।

প্রশ্ন : এত বছরেও পৃথিবীর পেট ঠাণ্ডা হয়নি?

মা : প্রথম দলের বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, তাপ পরিবহণে পাথর তেমন দুরন্ত নয় বলেই গরমকে আটকে রেখেছে ভেতরে। দ্বিতীয় দলের বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, ইউরেনিয়াম আর থোরিয়ামের মত তেজস্ক্রিয় পদার্থরা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে বলেই এত উত্তাপ তৈরি হয়ে চলেছে। সব পাথরেই আছে এই দুটো জিনিস—সাধারণত খুব কম মাত্রায়। কারণ যাই হোক, কিন্তু এত ম্যাগমা সৃষ্টি তো কম কথা নয়।

প্রশ্ন : ম্যাগমা! মানে?

মা : গলিত পাথরকে বলে ম্যাগমা। ম্যাগমার বড় অংশ জুড়ে থাকে সিলিকেট সলিউশনের সঙ্গে মেশানো অক্সাইড আর সালফাইড। চাপের চোটে বাষ্প আর অন্যান্য গ্যাসও ঢুকে থাকে সলিউশনের মধ্যে। তরল পাথর অর্থাৎ ম্যাগমা আশপাশের পাথরের চেয়ে হাল্কা হয়—গ্যাস গুলে থাকে বলে আরও হাল্কা। এই কারণেই ম্যাগমা ভেসে ওঠে ওপর দিকে—তলার চাপে ঠিকরে যায় ফুটোফাটা দিয়ে।

প্রশ্ন : ম্যাগমা আর লাভার মধ্যে তফাতটা তাহলে কী?

মা : ম্যাগমা থেকে যখন বেশির ভাগ গ্যাস বেরিয়ে যায়—পৃথিবীর ওপর পৌঁছে তখন সেই ম্যাগমা-ই লাভা হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরিকে পোষ মানিয়ে মানুষের কাজে লাগানো যায় না?

মা : আগ্নেয় অঞ্চলের প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। ইটালিতে মাটি ছেঁদা করে স্টীম জেট বের করে টারবাইন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। স্টীম থেকে বোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট আর সোডিয়াম কার্বোনেট টেনে নেওয়া হচ্ছে। এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে ইংলণ্ডে। আমেরিকার অ্যাটমিক এ্যানার্জি কমিশন আড়াই মাইল গভীর ফুটো বানিয়েছিল পৃথিবীর গা ফুঁড়ে। ধরণীর উনুনকে কাজে লাগিয়ে, পৃথিবী জোড়া ভলক্যানিক বেল্ট থেকে অবিশ্বাস্য শক্তি উদ্ধার করার স্বপ্ন খুব বেশি দিন নিছক স্বপ্ন আর থাকবে না।

প্রশ্ন : আগ্নেয়গিরিকে তাহলে কী বলব? দোস্ত না দুশমন?

মা : উপকারের খতিয়ান করলে তুই নিজেই বুঝবি। আগ্নেয়গিরির লাভা বানিয়ে দিয়েছে অনেক দেশ আর অনেক দ্বীপ। লাভার মঞ্চ তৈরি না হলে প্রবাল পোকারা তাদের পাঁজর জমিয়ে দ্বীপ তৈরি করতে পারত না।

আগ্নেয় ছাইতে প্রচুর পটাশ থাকে। জমির সার হিসেবে পটাশের তুলনা নেই। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির আশপাশের অঞ্চল এই জন্যেই চির-উর্বর—চাষীদের কাছে লোভনীয়। যেমন, জাভা। ম্যাগমার সঙ্গে পৃথিবীর ভেতর থেকে অনেক দামি ধাতু আর খনিজ উঠে এসে মানুষের কাজে লাগছে। কিছু ধাতু ওপর পর্যন্ত উঠতে না পারলেও ম্যাগমা থেকে আলাদা হয়ে যায়। রাজস্থানে সীসে আর দস্তার খনি আছে। মাইশোরে সোনার খনি। তার মানে অতীতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল এসব জায়গায়। সবচেয়ে দামি জিনিসটা বানিয়ে উপহার দেয় আগ্নেয়গিরিরাই। নাম তার হিরে। কয়লাকে প্রচণ্ড চাপ আর তাপ দিয়ে হিরে বানিয়ে রেখে দেয় পুরনো সুড়ঙ্গের মধ্যে। অবিসিডিয়ান অর্থাৎ বাহারি আগ্নেয় কাঁচের জন্যে হাওয়াই বিখ্যাত। এ ছাড়াও রয়েছে ঝামাপাথর অর্থাৎ পিউমিস শিলা—এত হাল্কা যে জলে ভাসে—যা গুঁড়িয়ে মাজনে ব্যবহার করা হয়। আগ্নেয়পাথর দিয়ে রাস্তাঘাট বাড়িও তৈরি হচ্ছে। সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে ব্যাসাল্ট গুঁড়োয়। এবার তুই-ই বল, আগ্নেয়গিরি তোর দোস্ত না দুশমন।

প্রশ্ন : অগ্ন্যুৎপাত কি হুঁশিয়ারি ছাড়াই দামালি শুরু করে?

মা : আগে থেকে সাবধান হতে চাস তো? যদি মাটি কাঁপে, পাতালে বাজ পড়ার মত গুড়্ গুড়্ আওয়াজ শোনা যায়, সেই সঙ্গে যদি গ্যাস আর গলিত পাথর বেরোতে থাকে, অথবা যদি আগ্নেয়গিরির ধারেকাছে আচমকা গরম জলের ফোয়ারা জেগে ওঠে, অথবা হু-উ-উ-স করে কাছাকাছি লেক-এর জল কমে যায় বা ঠেলে ওঠে, অথবা সাঁ করে লেক-এর সমস্ত জল যদি তলা দিয়ে বেরিয়ে যায়—তাহলেই জানবি অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন। এরপরেও যদি সাধ থাকে, দেখতে পাবি প্রকৃতির আশ্চর্য সুন্দর তুবড়ির খেলা, টের পাবি সর্বনাশা আগ্নেয় ঝড়, আরও অনেক কিছু।

প্রশ্ন : দরকার নেই টের পাওয়ার। শুধু বলো কলকাতার মাটি কি কাঁপবে?

মা : মাঝে মাঝেই তো কাঁপে। মোলায়েম কাঁপুনি। তবে হ্যাঁ, কলকাতা কেঁপেছিল বটে ১৭৩৭ সালে। তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। এই শহরেই। বিশ্বের জঘন্যতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের লিস্টে তাই রয়েছে কলকাতার নাম।
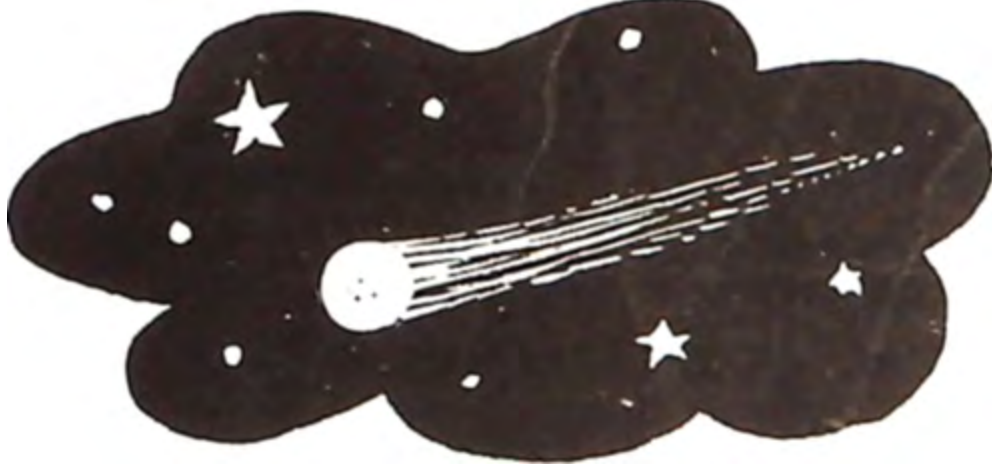
ধূমকেতু

প্রশ্ন : ধূমকেতু মানে কি, মা?

মা : ধোঁয়া হয়েছে যার কেতু অর্থাৎ পতাকা বা চিহ্ন, তারই নাম ধূমকেতু। ঝাঁটার মত জ্যোতির্ময় পদার্থ। ইংরেজিতে কমেট।

প্রশ্ন : কমেট? এরকম নাম কেন?

মা : লম্বা-চুলো তারা। রাতের আকাশে রহস্যজনক বিনুনিওলা প্রেতচ্ছায়া দেখে সেকালের মানুষ তাদের নাম দিয়েছিল Kometes—একটা গ্রীক শব্দ, যার মানে, লম্বা-চুলো। ইংরেজিতে Comet। ঠিক যেন বিনুনি দুলিয়ে উড়ে যাচ্ছে ধোঁয়াটে প্রেতিনী।

প্রশ্ন : শাস্ত্রে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে?

মা : শাস্ত্রে লেখা আছে, ধূমকেতু দেখা দিলেই অনিষ্ট হবে। বিশেষ করে যে ধূমকেতু আকারে ইন্দ্রধনুর মত, অথবা যার মাথায় দুটো বা তিনটে চুড়ো থাকে, তা নিদারুণ অমঙ্গল ডেকে আনে। ধূমকেতু যদি দক্ষিণ দিকে দেখা দেয়, ঘোর অনিষ্ট হয়। বিলেতের লোকেও একসময়ে বিশ্বাস করত, ধূমকেতু ভয়ানক অমঙ্গলসূচক—প্লেগ বা দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাজারাজড়ার মৃত্যুর আগে ধূমকেতু দেখা দেয়। ধূমকেতু ছিল তাদের কাছে বিভীষিকা। এমনও হয়েছে যে, বহু মানুষ আগেই আত্মহত্যা করেছে ধূমকেতু দর্শনের পর বেঘোরে মরার ভয়ে।

প্রশ্ন : মহাশূন্যের এরকম ক'টা ভয়ঙ্কর আগন্তুককে চেনেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা?

মা : ডজনখানেকের গতিপথ জানা গেছে। কেউ উপবৃত্তাকার বা এলিপটিক্যাল কক্ষপথে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ফিরে আসে; কেউ পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে যায় মাত্র একবারই, পরাবৃত্ত বা হাইপারবোলা কক্ষপথে উড়ে যায়। শেষের এই বৃত্তের দু-মুখ খোলা—তাই অজানা জন্মভূমি থেকে এসে অজ্ঞাত পরিণতির পানে এরা চলে যায়—আর ফিরে আসে না।

প্রশ্ন : ধূমকেতু তাহলে আজও রহস্য?

মা : ধূমকেতুর গঠন, উৎপত্তি আর পরিণতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মহলে এখনও মতভেদ আছে।

প্রশ্ন : ধূমকেতুকে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায়?

মা : যায়। সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণের মত নয়—সব জায়গা থেকে দেখা যায়। তবে বড়দের মধ্যে শুধু হ্যালির ধূমকেতুকেই দেখা যায় খালি চোখে—দূরবীনের দরকার হয় না।

প্রশ্ন : হ্যালির ধূমকেতু? কবে আসবে?

মা : ১৯৮৫-৮৬-তে টহল দিয়ে গেছে—ফের আসবে ৭৬ বছর পরে। ১৯৯০-তে Faye ১৯৯৪-তে Tuttle ২০১১-তে Crommelin। ১৯১৪ সালের 'ডেলাভান' ফিরে আসবে নাকি দু-কোটি চল্লিশ লক্ষ বছর পরে।

প্রশ্ন : এত ছুটোছুটি করেও কি এরা আস্ত থাকে?

মা : সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যাওয়ার পর ধূমকেতুরা ছোট হতে থাকে। সাধারণত এরা অতিকায় নোংরা তুষার-গোলক—মহাশূন্যে পাথুরে আবর্জনাকে এক জায়গায় রেখে দেয় জমাট গ্যাস আর জল দিয়ে। কিন্তু যতবার সূর্যের কাছে আসে, ততবারই রোদের আঁচে উবে যায় কিছুটা বরফ, ফুটে উড়ে যায় কিছুটা গ্যাস। ফলে, আগের চাইতে ছোট হয়ে যায় ধূমকেতু।

প্রশ্ন : ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যায় না?

মা : উনিশ শতকে যাদের নিয়মিত দেখা যেত, তাদের অনেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। সূর্য তাদের ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অনেকে আতশবাজির খেলা দেখিয়েছে সূর্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : যেমন?

মা : ১৮৪৬ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়ে আচমকা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল Biola ধূমকেতু। ৬.৭৫ বছর অন্তর একবার করে দেখা যেত তাকে। দুটো টুকরোই শেষবারের মত ফিরে আসে ১৮৫২ সালে। প্রতি নভেম্বর এরই ভাঙা টুকরোটাকরা থেকে হাজার হাজার উল্কা খসে পড়ত পৃথিবীর আকাশে। ১৯৯০-এর দশকে এই বর্ষণ কমে আসে অনেকটা। আর একটা ধূমকেতুর মাথা ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছিল, সূর্যের তিন লক্ষ মাইল দূরে এসেই ভাঙা টুকরোগুলো মিলিয়ে গিয়েছিল বহু দূরে।

প্রশ্ন : ধূমকেতু কি শুধুই অমঙ্গলের সূচনা ঘটায়?

মা : ১০৬৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু হেস্টিংস যুদ্ধের আগে জ্বলন্ত চেহারা দেখিয়ে পিলে চমকে দিয়েছিল স্যাক্সনদের। নরম্যান হানাদার উইলিয়ামের কপাল খুলে দিয়েছিল কিন্তু এই একই ধূমকেতু। ১৪৫৬-তে যখন ফিরে এল হ্যালির ধূমকেতু, পোপ ক্যালিক্সাস তৃতীয় তার নাম দিলেন শয়তানের দূত। তা সত্ত্বেও কিন্তু খ্রীস্টান আর তুর্কিদের যুদ্ধে ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল খ্রীস্টানদেরই। বেলগ্রেডের যুদ্ধে ধূমকেতুর ল্যাজ খোলা তলোয়ারের মত ডগা উঁচিয়ে ছিল তুর্কিদের দিকে, দেখে সাহস পায় খ্রীস্টানরা—জিতে যায় যুদ্ধে।

প্রশ্ন : ১৯৮৫-৮৬-তে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে হ্যালির ধূমকেতুকে?

মা : মোটামুটি পাঁচটা মহাকাশ তদন্ত অভিযান হয়েছে। জাপান থেকে দুটো, রাশিয়া থেকে দুটো, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি থেকে একটা।

প্রশ্ন : ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে মহামারীর কোনো যোগসূত্র পাওয়া গেছে?

মা : স্যার ফ্রেড হয়েল এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি বলেন, ধূমকেতুই এক গ্যালাক্সি থেকে আর এক গ্যালাক্সিতে রোগ জীবাণুদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীহারিকার মধ্যে যেখানে নতুন সৃষ্টি হয়েই চলেছে, অসংখ্য সজীব কোষ

যেখানে নানা অঞ্চল থেকে এসে জমা হচ্ছে, সেখানকার জীবাণু-মেঘ থেকে জীবাণু ঝেঁটিয়ে আনছে মহাশূন্যের পথে। কনকনে ঠাণ্ডায় গুটির মধ্যে আস্ত থাকছে জীবাণুরা—এক্স-রে আর কসমিক-রে তাদের ক্ষতি করতে পারছে না। সূর্যের আঁচে এরা ধূমকেতুর শির থেকে শিখায় চলে এসে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর ওজোন স্তরের ওপরে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে করতে অনুকূল অবস্থা পেলেই নেমে আসছে পৃথিবীর ওপর।

প্রশ্ন : তাহলে কি পৃথিবীর প্রথম সজীব কোষ ধূমকেতুই আমদানী করেছিল?

মা : পৃথিবীর জীব পৃথিবীতেই সৃষ্টি হয়েছে—এই তত্ত্ব নাকচ করে দিচ্ছেন স্যার ফ্রেড হয়েল। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তর সমর্থনে একটাও নজির নেই। কিন্তু ভুরি ভুরি নজির আছে যে, পৃথিবীর প্রথম সজীব কোষ এসেছিল পৃথিবীর বাইরে থেকে। ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাসের বায়োকেমিস্ট্রি উন্নত জীবের আলাদা আলাদা কোষের বায়োকেমিস্ট্রির সমান। এবং ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাস অনবরত আসছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। 'আদিম সুরুয়া থেকে প্রথম সজীব কোষ সৃষ্টির 'বায়োকেমিক্যাল মির্যাকল' -এর অলীক গল্প তথ্য দিয়ে নস্যাৎ করেছেন হয়েল সাহেব।

প্রশ্ন : মহাকাশ ভ্রমণের ধকল সইবার ক্ষমতা আছে জীবাণুদের?

মা : আন্ত নক্ষত্র ধুলো বা দানা-মেঘে লম্বা বা গোল দানাগুলো ব্যাকটিরিয়াদের আকৃতিদের সমান এবং RCC সিমেন্টের চাইতেও কঠিন ব্যাকটিরিয়াদের খোলস।

প্রশ্ন : ধূমকেতুর ওজন কত, মা?

মা : ১০,০০০,০০০,০০০ টন তো বটেই।

প্রশ্ন : ধূমকেতু থেকে জীবাণুরা পৃথিবীর বায়ুস্তর ফুঁড়ে ঢুকছে কি করে?

মা : গড়ে রোজ ১০০ টন উপাদান ধূমকেতু উৎস থেকে ঢুকছে বায়ুস্তরে। খুব ছোট দানা না পুড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসে ভূপৃষ্ঠে।

প্রশ্ন : কী কী রোগের জীবাণু থাকে তাদের মধ্যে?

মা : ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, প্লেগ, বসন্ত, ইংলিশ ঘেমো জ্বর এবং আরো অনেক নতুন জীবাণু। মেডিক্যাল ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে, আগে অনেক রোগ ছিল না—পরে এসেছে; আবার অনেক রোগ মড়ক সৃষ্টি করে এক্কেবারে চলে গেছে। আবার কোথাও ঠিক যেন আকাশ থেকে একটা জায়গায় এসে নেমেছে—সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ পায়নি।

প্রশ্ন : ধূমকেতু অত মাথামোটা কেন, মা?

মা : মাথায় যে দুটো অংশ আছে: মাঝখানের ঘন, জ্বলজ্বলে কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস; তাকে ঘিরে একটা হাল্কা আবরণ বা কোমা। নিউক্লিয়াসের ব্যাস ১০০ মাইল হতে পৃথিবীর ব্যাসের সমান হয়। কোমা-র ব্যাস দশ হাজার হতে এক লক্ষ মাইল পর্যন্ত দেখা গেছে। সবচেয়ে লম্বা ল্যাজের মাপ কুড়ি কোটি মাইল পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ১৮১১ সালের ধূমকেতুর মাথা ছিল সূর্যের চেয়েও বড়।

প্রশ্ন : সব ল্যাজওলাদের মত ধূমকেতুরও কি একটাই ল্যাজ?

মা : বেশির ভাগের তাই। কারও কারও দুটো কি বেশি থাকে। ১৭৪৪ সালের ঝকঝকে ধূমকেতুর ছিল ছ'টা।

প্রশ্ন : ল্যাজ হয় কি করে?

মা : সূর্যের তাপে নিউক্লিয়াসের বস্তু উবে যায়—সূর্যের বিকিরণের চাপে ল্যাজ হয়ে পিছনে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : সূর্যের কাছ থেকে পালানোর সময়ে ল্যাজ গুটিয়ে নেয়?

মা : সূর্যের দিকে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে ল্যাজ ওড়ে পেছনে—সরে পড়ার সময়ে অনেকটা কুর্নিশ করার ধরনে মাথা সামনে রেখে ল্যাজ রাখে পেছনে—অনেক সময়ে দেখা যায় না—বেঁকে থাকে গরু-মোষের শিং-এর মত!

প্রশ্ন : ধূমকেতু জন্মায় কোথায়, কেউ কি জানে না?

মা : নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে, গ্রহ তৈরির পর পড়ে থাকা রাবিশ, কেউ বলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রহ জগৎ। সবই নিছক অনুমান। আর একজনের মতে, দশ হাজার কোটি ধূমকেতুর একটা গুদাম আছে হয়ত গ্রহদের কক্ষপথের অনেক দূরে হিমশীতল তল্লাটে যে নীহারিকা থেকে সৌরজগতের জন্ম—সেই অঞ্চলে। পাশ দিয়ে কোনো নক্ষত্র হইচই করে বেরিয়ে গেলেই তারা আড়মোড়া ভাঙে।

প্রশ্ন : ধূমকেতু ছায়া ফেলে পৃথিবীতে?

মা : ১৮৬১ সালের ধূমকেতু আকাশের তিনভাগের দু-ভাগ জুড়েছিল। এত ঝকঝকে ছিল যে সেই আলোর ছায়া পড়ত পৃথিবীতে।

প্রশ্ন : কি থাকে ধূমকেতুর মধ্যে?

মা : অনেক রকমের গ্যাস। সায়ানোজেন, কার্বন, মিথাইন, হাইড্রক্সাইল, আর নাইট্রোজেন হাইড্রাইড। আর, একজনের মতে ধূমকেতুর বেশির ভাগটাই বরফ ঠাণ্ডা উপাদান।

প্রশ্ন : সায়ানোজেন তো ভীষণ বিষ-গ্যাস?

মা : হ্যাঁ। অনেকের ধারণা ছিল ধূমকেতুর সায়ানোজেন আর কার্বন মনোক্সাইড পৃথিবীর জীবজগতের দফারফা করে ছাড়বে। ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুর ল্যাজ পৃথিবীকে শ্মশান করবে ভেবে আঁতকে উঠেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তা হয়নি। আগেও অনেক ধূমকেতু ল্যাজ ঝেঁটিয়ে গেছে পৃথিবীকে—কিস্‌সু হয়নি। তার কারণ, ল্যাজে অণুর সংখ্যা অসম্ভব কম।

প্রশ্ন : ধূমকেতু আতঙ্ক দূর করেছেন কে?

মা : এডমণ্ড হ্যালি। স্যার আইজাক নিউটনের বন্ধু। দার্শনিক ছিলেন, হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ১৬৮২-তে উনিই প্রথম প্রমাণ করে দিলেন যে, ধূমকেতুরা মহাশূন্যের অকস্মাৎ দানো নয়—নিয়মিত অতিথি। তারা গ্র্যাভিটেশনের নিয়ম মেনে চলে—রুষ্ট দেবতার হুকুমে কোপ মারতে আসে না।

প্রশ্ন : ধূমকেতুরা কি গ্রহদের ন্যাওটা হয়?

মা : অল্প সময়ের ব্যবধানে ফিরে আসে প্রায় তিরিশটা, তাদের টহলবাজি চলে বৃহস্পতির কক্ষপথের কাছাকাছি। দানবগ্রহের টান তো বেশি হবেই। তাই এদের বলা হয় বৃহস্পতির ধূমকেতু-ফ্যামিলি। এরকম ফ্যামিলি শনি-রও আছে, তবে সংখ্যায় কম। নেপচুনের ছোট্ট ফ্যামিলির অন্যতম হল হ্যালির ধূমকেতু।

প্রশ্ন : পাগলা ধূমকেতুরা যদি ধাঁই করে ধাক্কা মারে পৃথিবীকে?

মা : ল্যাজের ধাক্কায় কিছু হবে না—কিন্তু মাথা দিয়ে ঢুঁ মারলে পৃথিবীর বাতাস ফুঁড়ে ঢুকতে না ঢুকতেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে—যেমন পড়েছিল অ্যারিজোনার উল্কা-গহ্বরে।

প্রশ্ন : ধূমকেতু-গহ্বর নাম নয় কেন?

মা : পণ্ডিতরা বলেছেন, ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের বস্তুর বেশির ভাগই ধাক্কার চোটে উবে যায়—বেশি রাবিশ পড়ে থাকে না। বাতাসেও বিস্ফোরণ ঘটে। যেমন দেখা গেছে সাইবেরিয়ায় ১৯০৮ সালে টুঙ্গুসকা নদীর কাছে। নেমে আসা বস্তুটার শূন্যপথে বিস্ফোরণ নর্থ আমেরিকা থেকে বৃটেন পর্যন্ত থরথরিয়ে কাঁপিয়েছিল। দেড়শ মাইল দূর পর্যন্ত মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ধুলো পৃথিবীকে ঘিরে ধরেছিল—কয়েক হপ্তা পর্যন্ত সেখান থেকে রোদুর ঠিকরে গিয়ে রাতকে উজ্জ্বলতর রেখেছিল।

প্রশ্ন : সাইবেরিয়া নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব? সেটা যে ধূমকেতুর ধাক্কা তার প্রমাণ?

মা : মস্ত গহ্বর দেখা যায়নি, উল্কার টুকরো-টাকরাও নেই। খুব সম্ভব Encke কমেট আছড়ে পড়েছিল সেখানে।

প্রশ্ন : এরকম টুঁ এর আগেও কি মেরেছিল কোনো ধূমকেতু?

মা : টেকটাইট রহস্য আজও অব্যাখ্যাত। বড় মার্বেলগুলির মত গলা কাঁচের এই বলগুলো কি ধূমকেতু ধ্বংস হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল! এরকম বৃহৎ বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে মহাকাশের আগন্তুককে মাইল দশেক বড় হতে হবে। দশ লক্ষ বছর অন্তর এই রকম আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটতে পারে। ডাঙায় পড়লে প্রচুর ধুলো ওড়াবে, জলে পড়লে জল ছুঁড়ে দেবে, উভয় ক্ষেত্রেই আকাশ দূষিত হবে, গোটা পৃথিবীর টেম্পারেচার পাল্টে যাবে, গাছপালা জন্তু-জানোয়ার বড় রকমের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে। এরকম একটা সংঘাত ঘটেছিল সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে—যখন পৃথিবীর বেশির ভাগ গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার খতম হয়ে গিয়েছিল—অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল 'ফসিল রেকর্ড' থেকে—এদের মধ্যে ছিল অতিকায় ডাইনোসররাও। হয়তো সবটাই কাকতালীয়—সেটা তো মেনে নিতেই হয়। অর্থাৎ ধূমকেতুর ধাক্কাই যদি হয়—তাতে পৃথিবীর আখেরে ভালই হয়েছে।

প্রশ্ন : টাইকো ব্রাহি কে?

মা : ষোড়শ শতাব্দীর প্রণম্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ধূমকেতুরা পৃথিবীপৃষ্ঠের জ্বলে ওঠা বাষ্প—প্রাচীন এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করেন উনি।

প্রশ্ন : শখের ডিটেকটিভের মতন শখের ধূমকেতু শিকারী নাকি আছে?

মা : বেশির ভাগ নতুন ধূমকেতুদের আবিষ্কার করেছেন শখের ধূমকেতু-শিকারীরা। তাদের যন্ত্র বলতে ছোট্ট টেলিস্কোপ—তবে 'ফিল্ড অফ ভিউ' চাঁদের ব্যাসের চার পাঁচ গুণ হওয়া চাই। চ্যাম্পিয়ন শিকারীর নাম জাঁ লুই পন্স—আটাশটা ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন বাড়িতে তৈরি টেলিস্কোপ দিয়ে। ব্রুক্স করেছিলেন পঁচিশটা, বার্নার্ড বাইশটা।

১৯৮৫-৮৬
হ্যালি

অদৃশ্য ইলেকট্রন

প্রশ্ন : ইলেকট্রিসিটি আর ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে তফাত কী, মা?

মা : দুটোর মধ্যেই রয়েছে ইলেকট্রন প্রবাহ। ইলেকট্রন যখন বয়ে যাচ্ছে তার অথবা কোনও কনডাকটরের মধ্যে দিয়ে—তখন তা ইলেকট্রিসিটি; ভ্যাকুম অথবা সেমিকনডাকটরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেলে তা ইলেকট্রনিক্স। এক কথায়, ইলেকট্রন বিদ্যুৎ-পরিবাহী বস্তুর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে—তাদের বাইরে দিয়েও যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটি—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স।

প্রশ্ন : বিদ্যুৎ-পরিবাহী বস্তু কী জিনিস?

মা : যাদের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বয়ে যেতে পারে; যেমন, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টাংস্টেন, নাইক্রোম ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ভ্যাকুম আর সেমিকনডাকটার?

মা : ভালভ, ট্রানজিস্টার ইত্যাদি।

প্রশ্ন :ইলেকট্রন?

মা : নেগেটিভ বিদ্যুযুক্ত খুব ছোট্ট কণিকা। যে কোনও পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে ইলেকট্রন পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে থাকে ১টা, সিলিকনের পরমাণুতে ১৪টা।

প্রশ্ন : কত ছোট্ট হয় এই ইলেকট্রন?

মা : ২২০ ভোল্টে ৬০ ওয়াটের বাল্‌ব জ্বালালে প্রতি সেকেণ্ডে বালবের তারের মধ্যে দিয়ে ২৩,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টা ইলেকট্রন বয়ে যায়। দু-হাজার সালে আমাদের এই পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ছ-শ চল্লিশ কোটি। তাহলে হিসেব করে নে, কতকগুলো পৃথিবীর লোক এক সেকেণ্ডে চলে যাচ্ছে বাল্‌বের মধ্যে দিয়ে—যদি অবশ্য লোকগুলো হয় ইলেকট্রনের মত পুঁচকে।

প্রশ্ন : দেখা যায় ইলেকট্রনকে?

মা : অত্যন্ত শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপেও এরা অদৃশ্য। কোনও দিনই দেখা যাবে না।

প্রশ্ন : তাহলে বুঝব কী করে ওদের চেহারা কীরকম?

মা : চেহারা কথাটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে খাটে না। বোঝবার সুবিধের জন্যে ধরে নেওয়া যাক গোলমত রেণু—অতিশয় ছোট্ট গোলক। পরমাণুরা ইলেকট্রনদের চেয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ গুণ বড় হয়। কল্পনাতীত ছোট্ট চেহারা বলে এবং চোখে দেখা যায় না বলে, বৈজ্ঞানিকরা রীতিমত সুচতুর প্রক্রিয়ায় এদের ক্ষুদ্রতার মাপ বের করেছেন।

প্রশ্ন : যাদের চোখে দেখা যায় না, তাদের অস্তিত্ব আছে, বিশ্বাস করব কেন?

মা : ইলেকট্রিক তারে হাত দিয়ে ছিটকে পড়লেই বিশ্বাস হবে। এদের চোখে দেখা যায় না, এদের কাণ্ড কানে শোনা যায় না—কিস্‌সু টের পাওয়া যায় না—শুধু শক্‌ খাওয়ার সময় ছাড়া। সিল্ক দিয়ে কাঁচ ঘষলে কিন্তু কাঁচ থেকে ইলেকট্রন চলে যায় সিল্কে—অর্থাৎ চলমান ইলেকট্রন তৈরি করে ইলেকট্রিসিটি। গরমে, আলোয়, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি এবং আরও অনেক শক্তির প্রভাবে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে ছুটে যায়। এদের এই ছুটোছুটি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কাজে লাগানোর তত্ত্ব আর শাস্ত্র-ই ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান।

প্রশ্ন : ইলেকট্রিক কারেন্ট বলতে তাহলে বুঝব ইলেকট্রনের ছুটে যাওয়া?

মা : হ্যাঁ। সার্কিটের দুটো পয়েন্টের মধ্যে সব সময়েই বিরাজ করছে একটা ফোর্স। তার নাম ভোল্টেজ। পয়েন্ট দুটো জুড়ে দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ফোর্স। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ইলেকট্রনদের মধ্যে। তখন কারেন্ট বয়ে যায় কনডাকটার আর রেসিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে।

প্রশ্ন : রেসিস্ট্যান্স কী, মা?

মা : রেসিস্ট্যান্সকে বাংলায় বলা হয় প্রতিবন্ধ। একমাত্র সুপার-কনডাকটর ছাড়া সব বস্তুই ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহে বাধা দেয়—কিছু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে আলো আর তাপ বানিয়ে দেয়। ইলেকট্রিক বাল্বের টাংস্টেন ফিলামেন্টে আলো জ্বলে এই কারণেই। নাইক্রোম দিয়ে তৈরি হিটারের তার তেতে লাল হয়ে যায় ভ্যাকুয়ামের মধ্যে দিয়ে।

প্রশ্ন : ভ্যাকুম মানে তো যেখানে বাতাস নেই। ইলেকট্রন যায় কীভাবে?

মা : ভালভ-এর মধ্যে বাতাস থাকে না—কিন্তু থাকে ক্যাথোড নামে একটা ধাতু। ইলেকট্রিক দিয়ে তাকে গরম করলেই ছুটে যায় বিদ্যুতের ধারাস্রোত অ্যানোড নামে বিদ্যুৎ-বুভুক্ষু আর একটা ধাতুর দিকে। অর্থাৎ, ভালভের দুটো দরজা—তাই এর নাম ডায়োড। এরপর ১৯০৭ সালে এল তিনটে দরজাওলা টিউব—তার নাম ট্রায়োড—তখন থেকেই সূচনা ঘটল ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানের। ইলেকট্রনের কম প্রবাহকে বেশি প্রবাহ করে তুলতে পেরেছিল ট্রায়োড। ১৯৪৮ সালে ট্রানজিসটরের আবিষ্কার বিপ্লব এনে দিল ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানে।

প্রশ্ন : ট্রানজিসটর বিপ্লব ঘটিয়েছে সব্বাই বলে। কিন্তু কীভাবে?

মা : ভালভের চেয়ে অনেক ছোট, বিদ্যুৎ চায় কম অর্থাৎ কম বৈদ্যুতিক শক্তিতে বেশি কাজ করতে পারে, অযথা তাপ বানায় না অর্থাৎ হুটমুট গরম হয় না, অনেক বেশি সময় চালু থাকতে পারে। ট্রানজিসটর দিয়ে তৈরি যন্ত্র খুব হাল্কা বলে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন : ট্রানজিসটরে বিদ্যুতের চাহিদা কম বললে। কত কম?

মা : $১০^{৬}$ ওয়াট থেকে $১০^{৩}$ ওয়াট পর্যন্ত সীমার মধ্যেই বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক যন্ত্র চালু থাকে।

প্রশ্ন : ট্রানজিসটর কী দিয়ে তৈরি হয়, মা?

মা : সিলিকন দিয়ে—সিলিকোন নয় কিন্তু। সব সেরা আর সবচেয়ে কাজের সেমিকনডাকটর। বিদ্যুৎ এর মধ্যে দিয়ে যেতে বেগ পায়—কিন্তু একেবারে থেমে থাকে না—যেমন থাকে কাঠ প্লাস্টিকের মত ইনসুলেটরের মধ্যে। ইনসুলেটরের বাংলা মানে অন্তরক; যা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন : সিলিকন জিনিসটা কী, মা?

মা : মাইক্রোচিপের রক্তমাংস—মাইক্রোচিপ দিয়েই তো তৈরি হয় বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। আজকের দিনে সিলিকন আমাদের সবাইকেই কোনও না কোনওরকমভাবে ছুঁয়ে আছে, অথচ এর আবিষ্কারের সময়ে আমরা কেউই জন্মাইনি। সুইডিশ কেমিস্ট বারজেলিয়াস ১৮১৭ সালে সর্বপ্রথম সিলিকনকে আলাদা করে বের করেন—তখনও অনেক অপবস্তু ছিল তার মধ্যে। Silicon শব্দটা এসেছে ল্যাটিন Silex বা Silicis থেকে—যার মানে চকমকি পাথর—আদিম যুগে এই পাথর দিয়েই বানানো হত হাতের কাজের যন্ত্র। একা সিলিকন নায়ক হয়ে রয়েছে উপন্যাসের চাইতে বিস্ময়কর সুদীর্ঘ এই কাহিনীর—যার নাম হওয়া উচিত : 'চকমকি মানুষ থেকে মাইক্রোপ্রসেসর।'

প্রশ্ন : সিলিকন পাওয়া যায় কোথায়?

মা : অপবস্তু মিশানো সিলিকনকে দেদার পাওয়া যায় প্রকৃতির মধ্যে—তখন তা সিলিকন আর অক্সিজেনের যৌগ পদার্থ। বালির প্রধান উপাদান সিলিকা—মরুভূমি আর সমুদ্রসৈকত জুড়ে রয়েছে এই সিলিকা। প্রতিটা বাড়ির ইঁটের মধ্যে রয়েছে সিলিকা। পাখির পালকে, তামাকের ছাইয়ে, স্পঞ্জের কঙ্কালে, অ্যামেথিস্ট এবং আরও অনেক দামি পাথরে রয়েছে সিলিকা। রঙিন মণিপাথর ওপ্যাল-এর রামধনু রঙটা হয় সিলিকা জলের সঙ্গে থাকে বলে।

প্রশ্ন : সিলিকা দিয়ে আর কী কী জিনিস তৈরি হয়, মা?

মা : কাঁচ, কাগজ, ডিটারজেন্ট, বালি-পাথর, কংক্রিট, এনামেল, মাটির বাসন, সুতোর কাপড় আর আঠার উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে সিলিকার ওপর। কোয়ার্জ জিনিসটা আসলে সিলিকন ডায় অক্সাইড। সঠিক স্পন্দাঙ্ক আর সময়ের জন্যে এর ব্যবহার রয়েছে রেডিও ট্রান্সমিটারে, মাইক্রোপ্রসেসরে। সিলিকন আর লোহা থেকে তৈরি হয় সিলিকন ইস্পাত; ইলেকট্রিক মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মারে কাজে লাগে। হাই-টেম্পারেচার তেল, রবার-ছাঁচ, হাইড্রলিক ফ্লুইড, জল-প্রতিরোধক মোম আর পালিশে থাকে সিলিকোন—যা তৈরি হয় সিলিকন, কার্বন আর হাইড্রোজেন থেকে। ১৯৫৮ সালে 'চিপ' আবিষ্কারের সময়ে তাই তো বলা হয়েছিল—আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পদার্থ এই সিলিকন।

প্রশ্ন: সিলিকন কতখানি বিশুদ্ধ হলে 'চিপ' তৈরি সম্ভব?

মা : শুনে মাথা ঘুরে না যায়। একশ কোটি সিলিকন পরমাণুর সঙ্গে একটার বেশি অপবস্তু মেশানো পরমাণু থাকলে সেই সিলিকনকে আর বেজায় খাঁটি বলা চলবে না। এহেন অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভব করেছে বিজ্ঞান। মজা কি জানিস, এমন খাঁটি সিলিকন বানিয়েও তার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে দেওয়া হয় ইচ্ছে করেই।

প্রশ্ন : খাঁটি সিলিকনে খাদ মিশনো হয়! কেন?

মা : সিলিকনের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বাড়ানোর জন্যে। যাতে আরও ইলেকট্রন আরও জোরে ছুটতে পারে। এই পদ্ধতির নাম ডোপিং। খেলাধুলোর দুনিয়ায় ডোপিং চলছে। সিলিকনেও 'ডোপান্ট' বস্তু মিশানো হয় অল্প পরিমাণে। পাঁচ লক্ষ ভাগে মাত্র এক ভাগ। তখন সিলিকন আরও ভাল কনডাকটর হয়ে যায়। মাইক্রোচিপ

বিপ্লব সম্ভব হয়েছে যে-যে কারণে তাদের একটি এই ডোপিং। ভাল কথা, প্রথম ট্রানজিসটরে কিন্তু সিলিকন ছিল না।

প্রশ্ন : সেকী! প্রথম ট্রানজিসটরে সিলিকন ছিল না! কী ছিল?

মা : জারমেনিয়াম। আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে 'শতাব্দীর আবিষ্কার' ঘটানো হয়েছিল ১৯৪৭-এর ২৩ ডিসেম্বর। বৈদ্যুতিক সংকেতের অতি সামান্য শক্তিকে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে এই এক্সপেরিমেন্ট। এক ওয়াটের পাঁচ লক্ষ ভাগের একভাগ শক্তিওলা এই সংকেতকে ট্রানজিসটরে ঢুকিয়ে দিতেই তা বিয়াল্লিশ গুণ বেড়ে গিয়ে পৌঁছে গেল হেডফোনে। এরই নাম অ্যামপ্লিফিকেশন—যা সব রেডিও আর অডিও যন্ত্রে দরকার। আগে এ-কাজ করানো হত বিদ্যুৎ-বুভুক্ষু ভ্যাকুম টিউব দিয়ে—যা অতি-ক্ষুদে সার্কিট দিয়ে তৈরি করতে পারেনি কোনওদিনই—ট্রানজিসটরের দৌলতে সম্ভব হল পুঁচকে সার্কিটের উৎপাদন।

প্রশ্ন : একটা প্রশ্ন। ভ্যাকুম টিউব আর ভালভ কি আলাদা জিনিস?

মা : একই জিনিস। ভ্যাকুম টিউবের বৃটিশ নাম ভালভ।

প্রশ্ন : 'শতাব্দীর আবিষ্কার' কারা করেছিলেন?

মা : জন বারজীন, ওয়ালটার ব্র্যাটেন আর উইলিয়াম শকলী। তিনজনেই এ জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন —অবশ্য অনেক পরে—১৯৫৬ সালে।

প্রশ্ন : ট্রানজিসটরে জারমেনিয়াম-কে বাদ দেওয়া হল কেন, মা?

মা : এক যুগ ব্যবহার করার পর দেখা গেল, খুবই অল্প তাপসীমার মধ্যে জারমেনিয়াম কাজ করতে পারে। এ ছাড়াও, কাঁচ দিয়ে বিশেষ আস্তরণ বানাতে হত জারমেনিয়াম ট্রানজিসটরে। সিলিকন ব্যবহারে এসব অসুবিধে প্রায় চলে গেল। তিন যুগ ধরে তাই একা সিলিকন দাপট বজায় রেখেছে বেশির ভাগ ট্রানজিসটরে।

প্রশ্ন : ট্রানজিসটর খুব ছোট বলেই তো এই বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। কত ছোট?

মা : কল্পনা করে নে একটা কিউব বা ঘনক। যার সব দিকের মাপ এক ইঞ্চি। ১৯৪০ সালে তার মধ্যে একটা মাত্র ভ্যাকুম টিউব বা ভালভ রাখা যেত। ১৯৯০ সালে সেখানে পাতলা চ্যাপ্টা সিলিকন মাইক্রোচিপ বা ইনটিগ্রেটেড সার্কিট রাখা যায় এক কোটি। প্রতিটি মাইক্রোচিপ বা আই-সি'তে থুক থুক করছে আলপিনের ডগার মত ছোট্ট ছোট্ট ট্রানজিসটর।

প্রশ্ন : এত ছোট হয় ট্রানজিসটর?

মা : মাইক্রোচিপের সাইজ বাড়ছে, তার মধ্যে আরও বেশি গিজগিজ করছে ট্রানজিসটর; অর্থাৎ আরও ঘন হয়ে থাকছে। যেমন ধর, ১৯৬২-র মাইক্রোচিপে একটা রাস্তার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ধরা থাকত। ১৯৯০-তে আমেরিকায় তৈরি একটা মাইক্রোচিপে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের দুই তৃতীয়াংশের রাস্তাঘাটের বিবরণ থাকতে পারে। যতই জটিল হচ্ছে মাইক্রোচিপ, ততই তার ডিজাইনে দরকার হচ্ছে খোদ কমপিউটারকে—আবার কমপিউটারের দরকার হচ্ছে মাইক্রোচিপকে। ঠিক যেন অগুন্তি ক্ষুদে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হয়ে চলেছে খুব অল্প জায়গায়।

প্রশ্ন : দুর ভবিষ্যতে তাহলে যন্ত্রই বানিয়ে নেবে যন্ত্রকে?

মা : ঘটনার স্রোত সেইদিকেই তো চলেছে।

প্রশ্ন : ডোপান্ট কিভাবে পাল্টে দেয় সেমিকনডাকটরের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি?

মা : পরমাণুর ইলেকট্রনকে সরিয়ে দেয়; সেই ফাঁকা জায়গায় অন্যদিকের ইলেকট্রন ধেয়ে আসে। এইভাবে তৈরি শূন্যস্থানকে বলে hole; এই 'হোল' মানে ফুটো নয়—বলা যায় ভ্যাকান্সি—ঘর খালি বা চাকরি খালির মত। hole নিজেও কিন্তু সরে সরে যাচ্ছে সেমিকনডাকটরের মধ্যে—ইলেকট্রন ছুটছে সেই জায়গার দিকে। ভাবতেও মজা লাগে।

প্রশ্ন : খাঁটি সিলিকনে hole বানায় কোন্ ডোপান্ট?

মা : খুব কম মাত্রায় আর্সেনিক অথবা ফসফরাস। তখন তার নাম P-টাইপ সিলিকন। খুব কম মাত্রায় গ্যালিয়াম বা বোরন দিলে সিলিকনের নাম হয় N-টাইপ সিলিকন।

প্রশ্ন : সিলিকনকে বলেছিলে মাইক্রোচিপের রক্তমাংস, জটিল ট্রানজিসটররা তাহলে কী?

মা : মাইক্রোচিপের নার্ভ আর মাসল।

প্রশ্ন : ইলেকট্রিক কারেন্টকে কন্ট্রোল করছে সুইচ। ইলেকট্রনিক্সকে করছে কে?

মা : ট্রানজিসটর। এক সেকেণ্ডের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। অকল্পনীয় স্পিডের অধিকারী বলেই ট্রানজিসটর মির‍্যাকল-মেকার। একেই বলে 'মাইক্রোইলেকট্রনিক সুইচ'। পকেট ক্যালকুলেটর, রিস্টওয়াচে রয়েছে এই ধরনের ট্রানজিসটর সুইচ।

প্রশ্ন : 'সোলার সেল' আর মাইক্রোচিপ কি এক জিনিস?

মা : না। সূর্যের আলো ধাবমান ইলেকট্রন আর 'হোল' তৈরি করে নেয়—সোলার সেল-এর মধ্যে দিয়ে তখন কারেন্ট বইতে থাকে। সিলিকন সেল-এর সঙ্গে বিশেষভাবে তৈরি অ্যালুমিনিয়াম আর গ্যালিয়াম আরসেনাইড 'সেল' জুড়ে গড়া হয় 'সোলার সেল'।

প্রশ্ন : এই কম সময়ে সুইচ-অফ সুইচ-অন করে লাভ কি ট্রানজিসটরের?

মা : রাশি রাশি হিসেবনিকেশ চক্ষের নিমেষে করে ফেলা যাচ্ছে। নইলে কাজ জমেই যাবে পাহাড়ের মত।

প্রশ্ন : বেশি জোড়ে দৌড়োলে বেশি এনার্জি লাগে। ট্রানজিসটরেও তো লাগে?

মা : নিশ্চয়। এই জন্যেই যত দ্রুতগতি মাইক্রোচিপ তৈরি হয়ে চলেছে, ততই তার দাম বেড়ে চলেছে। সিলিকনে তৈরি মাইক্রোচিপের সুইচিং সময় নিত এক ন্যানো-সেকেণ্ড—এক সেকেণ্ডের ১০০,০০,০০,০০০ ভাগের এক ভাগ। এখন তৈরি হয় এক ন্যানোসেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের সুইচিং—এই সেমিকনডাকটর তৈরি হচ্ছে গ্যালিয়াম আর আরসেনাইড দিয়ে।

প্রশ্ন : রেডিও আর টেলিভিশনেও মাইক্রোচিপ থাকে?

মা : অন্য ধরনের মাইক্রোচিপ থাকে—তাদের কাজ সুইচিং স্পিড বাড়ানো নয়—হাই-ফ্রিকোয়েন্সি বানানো। হাইস্পিডে সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফাই করা।

প্রশ্ন : 'চিপস্পিড'কে ক্যামেরায় লাগানো হচ্ছে?

মা : আধুনিক ক্যামেরার শাটারস্পিড এক সেকেণ্ডের দু হাজার ভাগের একভাগ তো এই কারণেই।

প্রশ্ন : কত স্পিডে তাহলে ছুটছে ইলেকট্রন?

মা : উপগ্রহের স্পিডে ছোটে সিলিকন মাইক্রোচিপে। কিন্তু এর চাইতে তিন হাজার গুণ বেশি জোরে ছুটলে তবেই রেডিও বা আলোর গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে। কিছু ইলেকট্রনকে এই স্পিডের কাছাকাছি

তোলা হয়েছে—কিন্তু অনেক খরচ করে অনেক দামি মেশিনের ভ্যাকুমের মধ্যে। এই মেশিনের নাম 'অ্যাটম স্ম্যাশার'।

প্রশ্ন : কত ভোল্ট লাগে এই স্পিড তুলতে?

মা : আলোর স্পিডের অর্ধেক স্পিডে ইলেকট্রনকে ছোটাতে লাগে এক লক্ষ ভোল্ট। অর্থাৎ, চিপ যত দ্রুতগতি হবে, ব্যাটারি অথবা কারেন্ট খরচ তত বাড়বে।

প্রশ্ন : মাইক্রোচিপ তাহলে কত রকমের হয়?

মা : এনার্জি-চাহিদা আর সুইচিং-স্পিডের হিসেবে মাইক্রোচিপ.টেকনোলজিকে মোটামুটি ন-টা ভাগে ভাগ করা হয়। সর্বাধুনিকটায় সিলিকন নেই মোটেই—আছে গ্যালিয়াম আরসেনাইড—অত্যন্ত হাইস্পিড মাইক্রোপ্রসেসরের জন্যে।

প্রশ্ন : মাইক্রোচিপ কি দিয়ে তৈরি হয়?

মা : সিলিকন যাদের মধ্যে আছে, সেইসব বস্তু দিয়ে। আগেই বলেছি, সিলিকন থাকে বালি, কাদামাটি, চকমকি এবং আরো অনেক জিনিসের মধ্যে। পৃথিবীর খোসা অর্থাৎ ভূত্বকের চার ভাগের একভাগেরও বেশি অংশ শুধু এই সিলিকন। খনিজ লোহার মধ্যে থাকে তিন শতাংশ—ইস্পাত বানাতে দরকার হয়। এই সব জিনিসকে প্রথমে কেমিক্যাল দিয়ে শোধন করে নেওয়া হয়—'মোটামুটি বিশুদ্ধ' সিলিকন পাওয়া যায়—৯৮ শতাংশ বিশুদ্ধ সিলিকন আলাদা করে নেওয়া হয়। নিদারুণভাবে খাঁটি সিলিকন বানানো হয় 'জোন রিফাইনিং (Zone Refining) পদ্ধতিতে। সিলিকন রড থেকে বেশির ভাগ অপবস্তু বিদেয় হবার পর CZ পদ্ধতিতে বড় বড় কৃস্ট্যাল তৈরি করা হয় সিলিকন রডের মধ্যে। বিদ্যুৎ চালিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় বিশুদ্ধতা। এরপর মেশানো হয় ডোপান্ট।

প্রশ্ন : কারা তৈরি করে মাইক্রোচিপ?

মা : চিপ তৈরির কারখানাগুলোর ভেতরে ঢুকলে মনে হবে যেন হাসপাতাল বা ওষুধ তৈরির কারখানায় ঢুকেছিস। কর্মীদের বেশির ভাগই মেয়ে—দশ জনের মধ্যে ন' জন। সাদা কোট, হেলমেট, দস্তানা আর জুতো পরে যেন এক-একজন সার্জন। কাজ হয় অত্যন্ত শোধিত পরিবেশে: এক কিউবিক ফুট বাতাসে একশটার বেশি ধূলিকণা থাকে না, এই একশটার কোনোটাই আধ মাইক্রোমিটারের বেশি বড় হয় না। কাজ শুরু করার আগেই নিখুঁতভাবে মেঝেকে ভ্যাকুম করে নেওয়া হয়। তাপমাত্রার ওঠানামা ঘটে ঠিক দু-ডিগ্রীর মধ্যে—১৯ থেকে ২১ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে। সবসময়ে শুকনো রাখা হয় বাতাসকে ডিহিউমিডিফায়ার দিয়ে।

প্রশ্ন : প্রস্তুতিপর্বে কতটুকু ভুলচুক ঘটলে চিপস তৈরির বারোটা বেজে যাবে?

মা : এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ সাইজের যদি একটা ধূলিকণা ঢুকে পড়ে, অথবা জলের বাষ্পর ক্ষুদে একটা অণু যদি এসে যায়, অথবা তাপমাত্রার সামান্য এদিক-ওদিক ঘটলেই তৈরির দফারফা হয়ে যাবে যে-কোনো পর্যায়ে।

প্রশ্ন : এবার বলো কীভাবে তৈরি হয় চিপ?

মা : যেভাবে শসা-র ফালি কাটা হয়, সেইভাবে সিলিকনের একটা কৃস্ট্যালকে কেটে স্লাইস বানানো হয়। অত্যন্ত শক্ত হয় এই কৃস্ট্যাল—তাই হিরের করাত দিয়ে কাটতে হয়—বঁটি দিয়ে নয়। প্রতিটি চাকতি হয় এক মিলিমিটার পুরু আর দেড়শ মিলিমিটার ব্যাসের। বিউটিফুল আয়না বানিয়ে নেওয়া হয় হিরে দিয়ে

পালিশ করে। অতি-সূক্ষ্ম ফটোগ্রাফিক আর কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় পঞ্চাশ থেকে দু'শটা চিপ-এর জায়গা রাখা হয় এক-একটা চাকতিতে। একই সঙ্গে তৈরি হয়ে যায় হাজার কয়েক ক্ষুদে ট্রানজিসটর।

প্রশ্ন : মাইক্রোচিপের চেহারা-চরিত্র কি নিজে থেকেই তৈরি হয়?

মা : ডিজাইন করে একদল এক্সপার্ট। তারপর কমপিউটার দিয়ে ডিজাইনকে চিপ-সাইজের ২৫০ গুণ করে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় ফটোএনগ্রেভিং। ক্ষুদে নেগেটিভ বানানো হয়। চাকতিকে ফারনেসে ঢুকিয়ে অক্সিজেন দিয়ে সিলিকন ডায়-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। ফটোরেসিস্ট নামে একরকম কেমিক্যালের প্রলেপ থাকে সেই পাতলা চাকতিতে। এক্সপোজ করা হয় আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে। অদরকারি অংশ ধুয়ে ফেলা হয় অরগ্যানিক সলভেন্ট দিয়ে। তারপর ধোয়া হয় হাইড্রোক্লোলিক এবং আরও একটা অ্যাসিড দিয়ে। এক্সপোজড ফটোরেসিস্ট একেবারেই চলে যায়—সিলিকন ডায় অক্সাইডের প্যাটার্ন বেরিয়ে পড়ে। এত কাণ্ড করা হয় এক মাইক্রোমিটার নির্ভুলতা রক্ষা করার জন্যে। ধর, একটা চাকতিতে ৭৬টা চিপ তৈরি হল। এরপর তাদের হিরের করাত দিয়ে কেটে আলাদা করা হয়। কয়েক মিলিমিটার চৌকো চিপকে ঝালাই করে দেওয়া হয় প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে।

প্রশ্ন : প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড?

মা : ক্যালকুলেটরের পেছনের ঢাকনা খুললেই দেখতে পাবি। সরু সরু ধাতুর পাত, আর উঁচু উঁচু গর্ত। সবচেয়ে ছোট্ট অংশটা মাইক্রোচিপ। মাইক্রোচিপ আর প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে মিল আছে শুধু একটা জায়গায় —দুটোকেই তৈরি করতে দরকার হয় ফটোগ্রাফিক টেকনিকের। বড় ডিজাইন থেকে বানিয়ে নিতে হয় ছোট নেগেটিভ। তারপর ইনসুলেটিং পাত কেটে, বা ফাইবার গ্লাস কেটে বোর্ড বানিয়ে, তাতে হাল্কা তামার পাত লাগিয়ে, তার ওপর ফটোরেসিস্ট মাখিয়ে—চিপ তৈরির মতই ধাপে ধাপে একই রশ্মি আর রসায়ন প্রয়োগ করে যেতে হয়।

প্রশ্ন : মাইক্রোচিপে এত সূক্ষ্ম ছাঁচ ওঠে কী করে, মা?

মা : এক্স-রে অথবা ইলেকট্রন বীম-এর দৌলতে। পয়েন্ট জিরো জিরো জিরো জিরো ওয়ান মিলিমিটার পর্যন্ত খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তোলে ইলেকট্রন বীম।

প্রশ্ন : তাহলে তো বলতে হয়, নিজের জিনিসকে নিজেই বানাচ্ছে ইলেকট্রন?

মা : ভাবনা তো সেইজন্যেই। কমপিউটার বানাচ্ছে মাইক্রোচিপকে—মাইক্রোচিপ লাগছে কমপিউটারে। ভবিষ্যতের ইলেকট্রনিক্স কি তাহলে মানুষের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের বিবর্তন ঘটিয়ে চলবে?

প্রশ্ন : কল্পবিজ্ঞান ছাড়ো! ইলেকট্রনিক স্মৃতি কি জিনিস বুঝিয়ে দেবে?

মা : ইলেকট্রনিক মেমারির শুরু ভ্যাকুম টিউব ব্যবস্থা থেকে। কিছু মেমারি ভোলাটাইল—চলে যায়; কিছু নন-ভোলাটাইল—থেকে যায়। ক্যালকুলেটরে যোগবিয়োগ করে সুইচ-অফ করে দিলেই তা চলে যায়—আর ফিরে আসে না। একে বলে ভোলাটাইল মেমারি। কিন্তু গান-বাজনা কথাকে ম্যাগনেটিক টেপে ধরে রেখে সুইচ-অফ করলেও তা চলে যায় না—এর নাম নন-ভোলাটাইল মেমারি। কমপিউটারে তা আরও বেশি হারে ঘটে। সিলিকন মাইক্রোচিপের মেমারি ম্যাগনেটিক মেমারির মত মন্থর নয়—অত্যন্ত হাইস্পিডের।

প্রশ্ন : মাইক্রোচিপের মেমারি ক্যাপাসিটি তা হলে কত?

মা : দশ লক্ষ সংকেতের স্মৃতিকোঠা শুধু একটা চিপ। যে চিপ-এর স্মৃতির ক্ষমতা যত বেশি তার দামও তত বেশি। RAM অর্থাৎ Random Access Memory পদ্ধতিতে একটা Concise Oxford Dictionary-র কয়েকটা পাতা মনে রাখতে পারে। অপটিক্যাল ডিস্কের একটা চাকতিতেই থাকবে গোটা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

প্রশ্ন : আমার মেমারি ক্যাপাসিটি কত, মা?

মা : আন্দাজ করা হয়েছে তোর ব্রেন, আমার ব্রেনের স্মৃতির জায়গায় প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে যে তথ্য জমা থাকে, তা দশ হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন Binary digit সংকেতের সমান। অর্থাৎ মানুষের স্মৃতি মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন এই সংকেত রেখে দিতে পারে—যা মিলিয়ন মিলিয়ন হাই-ক্যাপাসিটি RAM স্মৃতিধর পদ্ধতির সমান। তাহলে তো তোর মেমারি খুব খারাপ নয়!

প্রশ্ন : সংকেতটা কি ধরনের, মা?

মা : মর্স কোডের টরে-টক্কার রূপান্তর 0 আর 1; মর্সের টরে-টক্কায় সংকেত যায় সেকেণ্ডে ১৭টা, ইলেকট্রনিক টরে-টক্কার সংকেত যায় সেকেণ্ডে বহু লক্ষ।

প্রশ্ন : মানুষের মেমারি আর ইলেকট্রনিক মেমারির মধ্যে তফাত?

মা : মানুষের ব্রেনের মেমারি কম স্পন্দাঙ্ক-র রেডিও ওয়েভে ছকা। তিন পাউণ্ড ওজনের ব্রেনের প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে রয়েছে প্রায় হাজার কোটি নিউরন কোষ। রেডিও ওয়েভ যাচ্ছে এক কোষ থেকে আর এক কোষে, সংযোগসূত্রের মধ্যে দিয়ে। পক্ষান্তরে, কমপিউটারের মেমারি স্রেফ অন আর অফ পদ্ধতিতে চালু থাকে। এই বইটার কমা সেমিকোলন শুদ্ধ সবকিছু কি দশ বছর পরে মনে রাখতে পারবি? যদি পারিস, তাহলে বলব তোর eidetic memory আছে। কমপিউটার কিন্তু পারে—সব জমিয়ে রাখে। তফাতটা এইখানেই।

প্রশ্ন : যাক! এবার বলো তো মাইক্রোপ্রসেসর কি জিনিস?

মা : কমপিউটারের বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক্স একটা অথবা কয়েকটা অতীব জটিল মাইক্রোচিপে জড়ো করা থাকে। এর নাম মাইক্রোপ্রসেসর বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সংক্ষেপে, CPU; মেমারি চিপদের চেয়ে এরা অনেক জটিল।

প্রশ্ন : VDU মানে কী, মা?

মা : Visual Display Unit—তোর টিভিকে দিয়ে VDU বানিয়ে নিতে পারিস। সব VDU আর Tv-ই তো ক্যাথোড রে টিউব।

প্রশ্ন : মাইক্রোপ্রসেসর লাগে কোথায়?

মা : এয়ারকণ্ডিশনার, স্পিডোমিটার, মেডিক্যাল ডায়াগনোসটিক্স, ফটোগ্রাফিক প্রসেসিং, ট্রাফিক কন্ট্রোল, টিভি প্রোগ্রামার, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো-ওভেন—আরও অনেক জিনিসে।

প্রশ্ন : সিলিকনের দাপট কি চিরকাল এমনি চলবে?

মা : হার মানবে গ্যালিয়াম আরসেনাইড মাইক্রোপ্রসেসর চিপ বা মাইক্রোকমপিউটার এসে গেলেই। মূল ব্যাপার তো ইলেকট্রনের স্পিড—আগেই বলেছি। সিলিকন মাইক্রোচিপে এক মাইক্রোমিটার পেরোতে সময় লাগে ৩০ পাইকোসেকেণ্ড। এক পাইকোসেকেণ্ড মানে, এক সেকেণ্ডকে দশ লক্ষ ভাগ করে, তার প্রতিটিকে আবার দশ লক্ষ ভাগ করলে যা দাঁড়ায়—তাই।' গ্যালিয়াম আরসেনাইড মাইক্রোচিপে ইলেকট্রন দৌড়বে ছ-

গুণ জোরে—মাত্র ৫ পাইকোসেকেণ্ডে পেরিয়ে যাবে এক মাইক্রোমিটার। দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে, শেষকালে ভাবনার স্পিডকেও হার মানতে হবে চিপ স্পিডের কাছে!

প্রশ্ন : ইলেকট্রনিক্স যদি আগামী যুগের সুপারম্যান হয়, তাহলে তার শরীরের বর্ণনাটা কি রকম হবে?

মা : পর-পর বলে যাচ্ছি, শুনে নে; প্রথমটা তোর আর আমার,—দ্বিতীয়টা কমপিউটার আর মাইক্রোপ্রসেসরের:

তথ্য সংগ্রহ :

চোখ, কান, মুখ, নাক, স্পর্শ, কম্পন।

টিভির হাল্কা লেখনী, ম্যাগনেটিক টেপ, কী-বোর্ড ইত্যাদি।

হিসেব :

ব্রেন (নিউরন)

সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট—মাইক্রোচিপ।

নির্দেশ :

ডি. এন. এ. সংকেত, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা

কমপিউটার প্রোগ্রাম (সফটওয়্যার)।

স্বল্পক্ষণ স্টোরেজ :

ব্রেন: নিউরন (অল্পক্ষণের স্মৃতি)

RAM মাইক্রোচিপ ইত্যাদি

দীর্ঘক্ষণ স্টোরেজ :

ব্রেন: নিউরন (দীর্ঘক্ষণের স্মৃতি), বই, ফিল্ম, রেকর্ড, ইত্যাদি

ডিস্ক, ROM মাইক্রোচিপ, ইত্যাদি

যোগাযোগ :

নার্ভাস সিসটেম, দর্শন, স্বর, গন্ধ, ছোঁয়া, দেহ-ভাষা

তার, রেডিও-সংযোগ

তথ্য প্রদান :

হাতের লেখা, ছবি, কথা, হাঁটা

প্রিন্টার, VDU, কৃত্রিম কণ্ঠস্বর, ইত্যাদি

প্রশ্ন : কমপিউটারের কী-বোর্ডে হাতে টাইপ করা কি গেঁইয়া হয়ে যাচ্ছে না?

মা : ঠিক বলেছিস। ভবিষ্যতে শুধু মুখের কথাতেই কমপিউটার কাজ করবে—কী-বোর্ড উঠে যাবে। কেন না, কী-বোর্ড টিপে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাতে সময় লাগে। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত টাইপিস্ট সেকেণ্ডে ন'বারের বেশি চাবি টিপতে পারে না। দুটো চাবি টেপার ফাঁকে একটা মোটামুটি ভাল মাইক্রোকমপিউটর বিশ হাজার নির্দেশ পাঠাতে পারে। এই সময়টা তো নষ্ট হচ্ছে।

প্রশ্ন : ইলেকট্রনিক্স তাহলে বুদ্ধিমান যন্ত্র হতে চলেছে?

মা : UIM অর্থাৎ Ultra Intelligent Machine যখন তৈরি হবে, তখন আজকের সবসেরা কমপিউটার সে তুলনায় হবে নিছক পোকামাকড়। এই স্বপ্ন দেখেছেন বিশেষজ্ঞ-প্রফেসর জ্যাক গুড। সিলিকন আর গ্যালিয়াম আরসেনাইড মাইক্রোচিপের বাজার যাবে। অসাধারণ কম টেম্পারেচারে কাজ করবে UIM—তরল হিলিয়ামে নিমজ্জিত থেকে। শুরু হবে অপটিক্যাল কমপিউটিং-এর যুগ। অত্যন্ত হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও-তরঙ্গই তো আলোক-রশ্মির উপাদান। এক পাইকোসেকেণ্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই রাডার আর স্যাটেলাইটের মধ্যে সংকেত বিনিময় ঘটে যাবে—এখন লাগে ১০০ পাইকোসেকেণ্ড। হলোগ্রাফির বিপ্লব তো এসেই গেছে...

প্রশ্ন : হলোগ্রাফি?

মা : যে কোনো বস্তুর তিন ডাইমেনশনের ফটোগ্রাফিক ছাপ ধরে রাখতে পারে হলোগ্রাম—যা পারে শুধু মানুষের চোখ। যে-বছর ট্রানজিসটরের আবিষ্কার হয়, সেই বছরেই গ্যাবর নামে এক বৈজ্ঞানিক হলোগ্রাম উদ্ভাবন করেন। যে-বছর প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর বাজারে ছাড়া হয়, সেই বছরেই গ্যাবর নোবেল প্রাইজ পান। জাপানীরা এর মধ্যেই হাইস্পিড হলোগ্রাফিক সিসটেম বানিয়ে সমস্ত পেটেন্ট সাহিত্যকে ফাইল করে রেখেছে। এরপর আবিষ্কৃত হবে হয়তো এমন এক সাব-অ্যাটমিক বস্তুকণা যা আলোর চেয়ে জোরে ছোটে—তখনই তৈরি হবে ভবিষ্যতের রোবট—মানুষের প্রভু। তখন তাদের মোটর গাড়ি পেট্রলে চলবে না—চলবে বায়োটেকনলজিতে—অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়াকেও গোলাম বানাবে তারা ইলেকট্রনিক্স দিয়ে। মোটরগাড়ি তখন হবে শখের গাড়ি—এখনকার ঘোড়ার গাড়ি চড়ার মত। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বসে, গ্রহে গ্রহে বসে, কথা বলা হবে মুখোমুখি—সশরীরে নয়—শরীরী কায়া-রা হাজির থাকবে হলোগ্রাফিতে গড়া ত্রি-মাত্রিক ছায়ার মাধ্যমে। সবকিছুর মূলে থাকবে অদৃশ্য ইলেকট্রন!

কমপিউটার

প্রশ্ন : অঙ্ক কষার মেশিন বুঝি সেকালে ছিল না?

মা : ছিল, এখনও আছে। এর নাম অ্যাবাকাস—গণনার ফ্রেম। ৫০০০ বছর আগের আবিষ্কার—মেকানিক্যাল কমপিউটার। আবিষ্কারটা হয়েছিল খুব সম্ভব চীনদেশে। কাঠের ফ্রেমে লাগানো তারের মধ্যে গাঁথা থাকে রঙবেরঙের পুঁতি। এক-একটা পুঁতি এক-একটা এককের প্রতিনিধি—দশ, একশ ইত্যাদি। গণনা করা হয় পুঁতিগুলোকে ওপর নিচে নামিয়ে। দূর প্রাচ্যে আর সোভিয়েত দেশে এখনও আছে অ্যাবাকাস—পকেট ক্যালকুলেটর যত ঝটপট ক্যালকুলেশন করতে পারে, সেই স্পিডে অ্যাবাকাস-এর ওস্তাদ অপারেটরও ক্যালকুলেশন চালিয়ে যেতে পারে। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বছরে বিশ লক্ষ অ্যাবাকাস তৈরি হয়েছে শুধু জাপানে—সে দেশে এর নাম 'সোরোবান্স'। ভাল কথা, কমপিউটিংয়ে সাহায্য করেছেন কিন্তু ফরাসি তাঁতিরাও।

প্রশ্ন : কমপিউটিং-এ তাঁতিদের অবদান! কীভাবে, মা?

মা : এঁরাই তো পাঞ্চকার্ড সিসটেম-এর উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন ১৮০১ সালে। খুবই সূক্ষ্ম কারুকাজের কাপড় বোনবার জন্যে একটা তাঁতকল বানিয়েছিলেন জোসেফ জ্যাকুয়ার্ড নামে এক তাঁতি ভদ্রলোক। খানকয়েক কার্ডের ফাঁসে ফুটো-ফুটো করে প্যাটার্নকে এঁকেছিলেন সঙ্কেতে। ছুঁচ গলে যেতো ফুটোদের মধ্য দিয়ে—তুলে ধরত সেই গর্তের জন্যে রাখা তাঁতের টানা সুতোকে। চার্লস ব্যাবেজ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক পাঞ্চ কার্ডের এই পদ্ধতিকেই কাজে লাগান তাঁর কমপিউটারে ১৮৩৪ সালে। কিন্তু শেষ দেখে যেতে পারেননি।

প্রশ্ন : সে কী! নিজের তৈরি কমপিউটারের শেষ দেখে যেতে পারলেন না?

মা : চার্লস ব্যাবেজ জন্মেছিলেন ১৭৯২-তে—মারা যান ১৮৭১-এ। ছিলেন গণিতবিদ আর বৈজ্ঞানিক। প্রোগ্রামমাফিক চালু থাকে এমনি ডিজিট্যাল কমপিউটারের প্রথম প্ল্যান বানিয়েছিলেন ১৮৩৪ সালে। তারও বিশ বছর আগে তৈরি করেছিলেন অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন—যোগ করার উন্নত যন্ত্র; ওঁর প্ল্যান ছিল পাঞ্চ কার্ড দিয়ে এই মেশিনেই প্রোগ্রাম ঠিক করে দেবেন, 'মেমারি স্টোর' দিয়ে ক্যালকুলেশন করাবেন, উত্তরটাকে ছাপা অবস্থায় বের করে আনবেন—সেকেণ্ডে একটা করে যোগ হবে। সে-সময়ে এইটাই ছিল কিন্তু রিমার্কেবল

স্পিড। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া ১৭,০০০ পাউণ্ড আর নিজের যোগাড় করা ৬০০০ পাউণ্ড কাজে লাগিয়েও কিন্তু ইঞ্জিন আর বানাতে পারেননি—হাজার হাজার পার্টস তৈরির বিদ্যেই জানা ছিল না ভিক্টোরিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের। শেষকালে ১৮৪২ সালে যখন জর্জ এইরি নামে রাজকীয়, জ্যোতির্বিদ জানালেন ব্যারেজের পরিকল্পনা একদম বাজে, পিছিয়ে গেল সরকার। এরপরেও একটানা ত্রিশ বছর খেটে মরেছেন ব্যাবেজ যন্ত্র নিয়ে—বানাতে আর পারেননি—মারা গেলেন ব্যর্থতার কষ্ট নিয়েই।

প্রশ্ন : মনটা খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা মা, কমপিউটার কি দশ আঙুলে গোনে?

মা : মানুষ গোনে দশ আঙুলে—দশমিক পদ্ধতিতে—কারণ আমাদের হাতেই রয়েছে দশটা সংখ্যা। কমপিউটার কিন্তু 'ভাবে' মাত্র দুটো সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে; সার্কিটের কোনও পয়েন্ট দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট হয় বইছে, অথবা বইছে না। এই কারণেই কমপিউটার গোনে 'দুই' পদ্ধতিতে—যার নাম Binary Systems; এ-পদ্ধতি কাজে লাগায় মাত্র 'দুটি' সঙ্কেতকে 1 আর 0—কারেন্ট বইলে 1, না বইলে 0; কোনও একটা সঙ্কেতকে কোনো জায়গা থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে আনলেই তার ভ্যালু ডবল। 1 ডবল হয়ে যাচ্ছে 2/4/8/16//32/64/128—চলছে এইভাবে। জিরোর 'ভ্যালু' কিন্তু সব সময়ে জিরোই থাকছে। Binary System-এ এক থেকে দশ-এর notation অর্থাৎ অঙ্কপাতনহল এই: 1, 10, 11, 100, 101/110/1000/1001/1010; থাক সে কথা, প্রথম ইলেকট্রিক কমপিউটার তৈরির প্রেরণা জুগিয়েছিল কিন্তু ট্রেন ডাকাতরা।

প্রশ্ন : বলো কী! ডাকাতদের প্রেরণা থেকে ইলেকট্রিক কমপিউটার?

মা : প্রায় সেইরকমই। আমেরিকার একটা অঞ্চলকে বলা হয় 'ওয়াইল্ড ওয়েস্ট'। নাম শুনেই আঁচ করছিস কী রকম জায়গা। ১৯ শতকে এখানে ভয়ানক ট্রেন ডাকাতি লেগেই ছিল। ডাকাতদের ফাঁদে ফেলবার প্রেরণা থেকেই এসে গেল প্রথম ইলেকট্রিক কমপিউটার। আইনকে লবডঙ্কা দেখিয়ে প্রায়ই আমেরিকান ট্রেনে যাত্রী সেজে উঠে বসত ডাকাতরা। এদের শনাক্ত করার জন্যে গবেষকরা বললেন, টিকিটের ওপরেই প্রত্যেক যাত্রীর চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো রেকর্ড করা থাকুক। কেনবার সময়েই ফুটো করে দেওয়া হোক টিকিটে। গোঁফ থাকলে একরকম ফুটো, চুলের রঙ লালচে হলে আর একরকম ফুটো—মার্কামারা শরীরের সবকটা বৈশিষ্ট্য শুধু ফুটো দিয়ে গেঁথে দেওয়া হোক টিকিটে। এরপর যদি ডাকাতি হয়ে যায় সেই ট্রেনে, টিকিটের রেকর্ড ঘেঁটে মিলিয়ে নেওয়া হোক সেইসব যাত্রীদের চেহারা যারা ডাকাতির পরেও রয়ে গেছে ট্রেনে। যারা নেই, তারাই তাহলে ডাকাত। আইডিয়াটা সব মহলে খুব একটা পাত্তা না পেলেও হারম্যান হলারিথ নামে একজন আমেরিকান পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ বুঝেছিলেন, এ-পদ্ধতিকে জনগণনার কাজে লাগানো যাবে। ১৮৯০-এর আমেরিকান জনগণনায় উনি বানিয়ে দিলেন ট্যাবুলেটিং মেশিন। জনগণনার তথ্য-টথ্যগুলো পাঞ্চড্ কার্ডের ওপরে ধরে রাখা হত—তারপর 'ফীলার' বুলিয়ে বিশেষ ফুটো থেকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত সৃষ্টি করা হত। আগের জনগণনা শেষ হতে সময় লেগেছিল ১৮ সপ্তাহ। হলারিথের মেশিনে সময় লাগল মাত্র ৬ সপ্তাহ—যদিও দশ মিলিয়ন লোক বেড়ে গেছিল মাঝের দশ বছরে। ১৮৯৬ সালে ট্যাবুলেটিং মেশিন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন হলারিথ। ২৮ বছর পরে এই কোম্পানিই মূল বনেদ হয়ে দাঁড়ালো আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কমপিউটার কোম্পানির—IBM; পুরোনাম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন।

প্রশ্ন : কমপিউটারদের ভাষা নাকি অন্যরকম?

মা : মানুষ যখন নয়, তখন তার ভাষা তো অন্যরকম হবেই—এ ভাষা তো যন্ত্রের ভাষা। BASIC, COBOL—হরেক নামের হরেক ভাষার পাণ্ডিত্য জাহির করলেও সব কমপিউটারই বোঝে কিন্তু দুটো মোদ্দা সঙ্কেত: 1 আর 0; কিন্তু এই Binary System-এর প্রোগ্রাম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সাধারণত কমপিউটারদের মধ্যে থাকে নিজস্ব অনুবাদ প্রোগ্রাম বা কমপাইলার—যার কাজ সাঙ্কেতিক ভাষাকে গ্রহণ করে তাকে binary system-এ রূপান্তর করা। খুব চালু সাঙ্কেতিক ভাষাটার নাম BASIC—বিগিনার্স অল পারপাজ সিমবলিক ইন্‌স্ট্রাকসন কোড। অন্যান্য ভাষাদের মধ্যে আছে: COBOL—কমন বিজনেস ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ—ব্যবসাবাণিজ্য আর মোটামুটি নানা কাজে লাগে: FORTRAN—ফরমুলা ট্রানশ্লেসেন—বৈজ্ঞানিকদের ব্যবহারের জন্যে; ALGOL—অ্যালজেবরিক্যাল ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ—বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার আর গণিতবিদদের জন্যে তৈরি ডিজাইন।

প্রশ্ন : ইলেকট্রনিক প্রিন্টার কত তাড়াতাড়ি ছাপে, মা?

মা : ১৯৮০-এর গোড়ার দিকে সেকেণ্ডে ৪৫০ লাইন প্রিন্ট করতে পারত। অর্থাৎ, এক মিনিটে ২২৫ পৃষ্ঠার বই টাইপ করে ফেলত।

প্রশ্ন : কমপিউটার শিখতে ছোটদের এত ডাকা হচ্ছে কেন?

মা : গোটা পৃথিবী জুড়েই তো ছোটদের রমরমা শুরু হয়ে গেছে কমপিউটার বাজারে। মাত্র সতেরো বছরের বৃটিশ কিশোর ইউজিন ইভান্স ১৯৮৩ সালে বছরে রোজগার করেছে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড—'ইমাজিন' নামে লিভারপুলের একটা কমপিউটার গেম কোম্পানির হেড প্রোগ্রামার হয়ে যাবার পর। তবুও বলব, একটু বেশি বয়সেই কমপিউটার খেলাকে রপ্ত করেছিল ইউজিন। কেন না, দশ বছর বয়সেই ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রোগ্রাম লিখে ফেলছে এরকম ঘটনাও তো ঘটছে আকছার।

প্রশ্ন : কমপিউটার কি জ্যান্ত? তার 'মেমারি' থাকে কী করে?

মা : কমপিউটার মেমারি হল, কে কটা byte ইনফরমেশন নিজের ভাঁড়ারে জমিয়ে রাখতে পারে—সেই ক্ষমতা। প্রত্যেকটা 'বাইট' binary সংখ্যার সমষ্টি—সাধারণত আটটা সংখ্যার সমষ্টি মামুলি কোনও সংখ্যা বা হরফের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়ায় প্রতিটি 'বাইট'। উদাহরণ দিচ্ছি, বিশেষ একটা পদ্ধতিতে 'A' হরফের 'বাইট' হল 01000001 সিরিজ। Binary-র যে দুটি সংখ্যা বিশেষ একটা সার্কিটে কারেন্ট থাকা আর না থাকার অবস্থাকে বোঝায়, অর্থাৎ, 1 আর 0—এ দুটির প্রতিটিকে বলা হয় Bit Binary Digit-এর প্রথম আর শেষের অক্ষর দুটো। আঙুলের নখের সাইজের একটিমাত্র সিলিকন চিপ-এ ৬৪,০০০-এরও বেশি 'বাইট' 'স্টোর' করে রাখা যায়। এই সাইজের মেমারিকে প্রায়ই বলা হয় 64-K মেমারি। K দাঁড়াচ্ছে কিলো-বাইটের প্রতিনিধি হিসেবে। এক কিলো-বাইট ১০২৪ বাইটের সমান—binary নোটেশনে অর্থাৎ অঙ্কপাতনে ১-এর পেছনে ১০-টা জিরো বসালে যা হয়। 64-K মেমারি তাহলে ৬৫,৫৩৬ 'বাইট' ধরে রাখে। কাজের সুবিধের জন্যে অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এক কিলো বাইটকে ১০০০ 'বাইট'-এর সমান ধরা হয়।

প্রশ্ন : কমপিউটারের মেমারির দৌড় কি এই পর্যন্তই?

মা : ৪,৭২০০০ মিলিয়ন 'বাইট' পর্যন্ত রেখে দেওয়ার ভাঁড়ার-ঘর ব্যবস্থাও আছে—যা ৪,৭২,০০০ 'মেগা-বাইট'-এর সমান।

প্রশ্ন : মেগা-বাইট! সোজা বলো, মনে রাখতে পারে কতটা?

মা : তোর মোটা মাথায় ঢোকানোর জন্যে সোজা করেই বলছি। এই পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাদের প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্র যদি ১০০ হরফের মধ্যে লেখা যায়—অথবা, খবরের কাগজের ২৭০ লক্ষ পৃষ্ঠায় যত থাকে—সমস্ত ধরে রাখতে পারে এক মেগা-বাইট।

প্রশ্ন : এতবড় মেমারির সাইজও নিশ্চয় পেল্লায়?

মা : মোটেই না, মামুলি লঙ প্লেয়িং রেকর্ড সাইজের ডিস্কে জমানো জ্ঞানের গুদোম থেকে দরকারি জ্ঞানকে টেনে বের নেয় লেসার রশ্মি—১২,৫০০ মিলিয়ন 'বাইট' পর্যন্ত জমিয়ে রাখা যায় এই ডিস্কে।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, ক্রিমিন্যালরা যুগে যুগে নতুন পথে ক্রাইম করছে। কমপিউটারকে কাজে লাগাচ্ছে না?

মা : কমপিউটার ক্রাইমের মোদ্দা অসুবিধেটা কি জানিস? টাকা চুরি গেছে, এটা বলা সোজা—কিন্তু চুরি করার জন্যে কমপিউটারকে টাইপ করে ইন্সট্রাকশনটা কে দিয়েছে—এইটাই বের করা কঠিন। কাজেই পাঁচটা চুরি হলে একটার রিপোর্ট আসে পুলিশের কাছে। ১৯৮০ পর্যন্ত একটা হিসেবে জানা গেছে তিনশ কোটি ডলার চুরি হয়ে গেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কমপিউটার ক্রিমিনালদের উৎপাতে।

প্রশ্ন : সিলিকন চিপ জিনিসটাকে ফের ঝালিয়ে দেবে?

মা : শুদ্ধ সিলিকন কিন্তু ইনসুলেটর। কিন্তু সামান্য অশুদ্ধ অবস্থায় ক্ষীণ কারেন্টকে যেতে দেয়—তখন তা সেমি-কনডাকটর হয়ে যায় : একেই বলে 'সিলিকন-চিপ'-এর ভিত তৈরি করা। ৯৯·৯৯৯৯৯৯৯ শতাংশ শুদ্ধ সিলিকন দিয়ে চার ইঞ্চি মোটা সিলিণ্ডার বানিয়ে তা থেকে আধ মিলিমিটার পুরু চাকতি কেটে নেওয়া হয়। প্রত্যেকটা চাকতিতে ২৫০টার মত চিপ-এর বস্তু থাকে। ক্ষুদে সার্কিটদের ফটো তুলে ছেপে এবং খুদে বসিয়ে দেওয়া হয় চাকতিতে—তার ওপর ফসফরাস, বোরন, অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দিয়ে ট্রানজিসটর, রেসিসটর, ক্যাপাসিটর আর ডায়োড বানানো হয়: এরাই তো ইলেকট্রনিক সার্কিটের জটাজাল—কারেন্টকে কন্ট্রোল করে, গাইড করে।

প্রশ্ন : তবে কি ইলেকট্রনিক ব্রেনের আর দেরি নেই?

মা : এ-যুগের কমপিউটাররা ইলেকট্রনিক ব্রেন নয় ঠিকই, নিজে থেকে ভাবতে পারে না, সৃষ্টি করবার ক্ষমতাও নেই, তবে হ্যাঁ, সত্যিকারের ইলেকট্রনিক ব্রেনের দিনও এল বলে। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে আমেরিকান গবেষকরা শুরু করেছেন, সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কমপিউটাররা যেন মানবিক আচরণের প্যাটার্নকে নিজেদের মধ্যে জাগাতে পারে। অর্থাৎ, নিজের প্রোগ্রাম নিজেই করে নিতে পারে কমপিউটার—পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ভুলভ্রান্তির মাধ্যমে। ১৯৮০-এর গোড়ার দিকে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডগ লেনাট নামে এক আমেরিকান গবেষক প্রতি রাতে কমপিউটার চালিয়ে রেখে ঘুমোতে চলে যেতেন—দেখতেন নিজে থেকে কি করে কমপিউটার মশায়। তিন বছর বাদে এই কমপিউটারই ক্ষুদে ক্ষুদে ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরির একটা নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছিল। এবং কমপিউটার নিজেই ঠিক করে নিয়েছিল—সে আর মেশিন নয়—মানুষ!

সিলিকন চিপ্স

অণুজীব—অদৃশ্য বন্ধু

প্রশ্ন : পৃথিবীতে যদি একটাও জীবাণু না থাকতো, তাহলে খুব আরামে থাকা যেতো, তাই না, মা?

মা : ঠিক উল্টো হত। আরাম হারাম হয়ে দাঁড়াতো। পৃথিবী হবে তখন দারুণ বিপজ্জনক।

প্রশ্ন : বলো কী! জীবাণুরা তো আমাদের শত্রু?

মা : জীবাণুদের কয়েকটা জাত ছাড়া বাকি সবাই আমাদের বন্ধু।

প্রশ্ন : জীবাণুরা আমাদের বন্ধু?

মা : অদৃশ্য বন্ধু। এই জীবাণুদের জন্যেই পৃথিবী এত সুন্দর—বেঁচে থাকার এত আনন্দ। মস্ত কারিগর তারা। খনি থেকে ধাতু বের করছে, কয়লার খনিতে মিথেন গ্যাস সাবাড় করছে, ভিটামিন B_{12} তৈরি করছে, সমুদ্রে তেল ফেলে দিলে তা সাফ করে দিচ্ছে, প্রাণের গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছে, মেডিক্যাল রিসার্চে নিজেরা যন্ত্র হয়ে গিয়ে কাজ করে দিচ্ছে, সুগন্ধি উৎপাদন করছে, পাউরুটি ফাঁপিয়ে তুলছে, কেমিক্যালদের বানিয়ে নিচ্ছে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করছে, বজ্জাত পোকামাকড়দের বাগে রাখছে, ঈস্টার আয়ারল্যাণ্ডের পেল্লায় পাথরের মূর্তিগুলোর বয়স কত—তাও বলে দিচ্ছে, মাটিতে কীটনাশক ধ্বংস করে ছাড়ছে, মিথেন তৈরি করছে তা থেকে তাপ সৃষ্টির জন্যে, মধ্যিখানে-তুলতুলে চকলেট বানাচ্ছে, শনের আঁশকে নরম করে দিচ্ছে, হৃৎপিণ্ড আর অন্ত্রের কাজকর্ম ঠিকঠাক চলায় সাহায্য করছে, আরও হাজার হাজার কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন : অবিশ্বাস্য! জীবাণুরা কি বৈজ্ঞানিক?

মা : বৈজ্ঞানিকরাই তাদের দ্বারস্থ হচ্ছে। এই দ্যাখ না, নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ঠিক করেছে, বায়োলুমিনেসেন্ট ব্যাকটিরিয়াকে কাজে লাগিয়ে হেরোইন খাইয়েদের হাতেনাতে ধরবে। কী ভাবে?—এই ব্যাকটিরিয়া হেরোইন-এর ছোঁয়া পেলেই নিজেদের শরীর থেকে আলো ছাড়তে থাকবে—পুলিশ ধরবে ক্যাঁক করে। হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সেতালা ব্যাকটিরিয়াকে দিয়ে জমাদারের কাজ করাবেন ঠিক করেছেন। অন্ত্রের বিষাক্ত আবর্জনা সাফ করে দেবে, যাতে তারা রক্তে ঢুকে গিয়ে কিডনি রুগীদের অবস্থা কাহিল করে তুলতে না পারে। আরও শুনবি? কার্ল সাগান বলেছেন, শুক্রগ্রহে অ্যালগি পাঠানো হোক—ফটোসিনথেসিস-

এর কাজ চালিয়ে তারাই তো শুক্রগ্রহের গুচ্ছের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে অক্সিজেন বানিয়ে ছাড়বে—ঠাণ্ডা করে দেবে ভয়ানক গরম শুক্রগ্রহকে, তারপর শুরু হবে তুমুল বৃষ্টি—প্রায় পৃথিবীর মতনই মনোরম হয়ে দাঁড়াবে শুক্রগ্রহ।

প্রশ্ন : অদ্ভুত কথা বলছো, মা! জীবাণুরা ক্রূর, কুটিল, ভয়ঙ্কর নয়?

মা : সবাই নয় রে। আমাদের স্বাস্থ্য, এমনকি আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করছে এই অদৃশ্য বন্ধুদের ওপর। এদের অ-মানবিক দক্ষতাকে যদি কাজে লাগানো যায়—পৃথিবীর বহু সমস্যা মিটে যাবে! জীবাণুদের প্রথম চেনা যায় প্রায় একশ বছর আগে। তাদের শুধু চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়—এত পুঁচকে প্রাণীরা ভাল হতে পারে না কখনোই—এই ঢাক পেটানোর শুরু তখন থেকেই। তারা নাকি রোগ, শোক আর ধ্বংসের বাহক। টিবি, ডিপথেরিয়া, কলেরার জীবাণুদের আলাদা করার পর ভ্যাকসিন আর ওষুধও বেরিয়ে গেল। তারপরেই শুরু হল জীবাণুদের বিরুদ্ধে জেহাদ। মারো, মারো, মেরে শেষ করে দাও সমস্ত জীবাণু! তুই-ও হয়েছিস এই প্রচারের শিকার। মোদ্দা কথাটা ভুলিসনি। জীবাণুরা জৈব ক্রিয়াগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়—রোগকে ইন্ধন জোগায় না।

প্রশ্ন : আমাদের শরীরের জীবাণুগুলো তাহলে অদৃশ্য শত্রু নয়?

মা : সাবান, জল আর হরেকরকম দুর্গন্ধ নিবারক ব্যবহার করার পরেও চামড়ার প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে থুকথুক করে প্রায় এক লাখ জীবাণু। প্রত্যেক মানুষের শরীরের ভেতরে আর বাইরে যত জীবাণু আছে, তাদের মোট সংখ্যা পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তাদের চেয়ে বেশি। এরা সবাই কি মানুষ মারার চেষ্টা করছে? না। বরং মানুষের স্বাস্থ্য আরও ভালো রাখার চেষ্টা করছে। চামড়ার জীবাণুরা ওস্তাদ জমাদার। জীবাণুনাশক দিয়ে কুঁচকি আর বগলের জীবাণুদের যদি রোজ খতম করা হয়, বাইরের জীবাণুরা তাদের জায়গা দখল করে নিয়ে একজিমা, চুলকানি ইত্যাদি অস্বস্তি বানিয়ে ছাড়বে।

প্রশ্ন : জীবাণু তো মাটির মধ্যেও রয়েছে?

মা : এক চামচ মাটির মধ্যে রয়েছে কমসে কম দু'বিলিয়ন জীবাণু। অনেক কাজ এদের। একটা বড় কাজ হল, মরাগাছ আর প্রাণীর টিশু ভেঙেচুরে পুষ্টিকর কেমিক্যালদের মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া। নোংরা পরিষ্কারে পটু জীবাণুরা থুকথুক করছে মাটির তলায় নর্দমা ব্যবস্থায়। টাইফয়েড আর কলেরার জীবাণুদের ধ্বংস করছে এরাই। রোগ আর ছড়াতে দিচ্ছে না। রাস্তার নর্দমার জল, খাবার জল আর কুয়োর জল মিশে গেলেই কিন্তু সেই জল রোগ বাধিয়ে ছাড়ছে। মাটির তলায় নর্দমায় ব্যাকটিরিয়া, ফাংগাস, প্রোটোজোয়া এবং আরও অনেক জীবাণু অবিশ্বাস্যভাবে সাফ করে দিয়ে নদীতে ফেলার উপযোগী করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন : এত নোংরা-বিষকে জীবাণুরা নির্বিষ করছে কীভাবে?

মা : করছে মিলেমিশে—পুরো পদ্ধতিটা আজও পরিষ্কার নয়। তবে, পুরো ব্যাপারটায় কম করে চার ধরনের জমাদারের ভূমিকা খুবই স্পষ্ট। একটা দল তাদের এনজাইম দিয়ে হজম করে ফেলছে সেই সব জিনিস যাদের জলে গোলা যায় না—হজমের পর কিন্তু যা পড়ে থাকছে, তা জলে গুলে যায়। আর একটা দল এই জিনিসগুলোই গাঁজিয়ে অ্যালকোহল আর অ্যাসিড বানিয়ে ছাড়ছে। আর একটা দল এই দুটোকেই গাঁজিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর হাইড্রোজেন তৈরি করছে। শেষ পর্যায়ে, কিছু ব্যাকটিরিয়া এই দুটো গ্যাসকে জুড়ে দিয়ে মিথেন গ্যাস তৈরি করছে। এত কাজ খুব ঝড়ের বেগে না চললেও জানবি, একটা ন্যাতা-কে পাঁচ থেকে

সাত দিনের মধ্যে ভ্যানিশ করে দিতে পারে জীবাণুরা; প্যারাফিন থেকে রবার পর্যন্ত সমস্ত জিনিস—এমনকি ফেনল-এর মত কীটনাশক পর্যন্ত—যা থেকে তৈরি হয় কার্বলিক অ্যাসিড—তাও ভেঙেচুরে যায় এদের পাল্লায় পড়লে।

প্রশ্ন : কিন্তু মিথেন গ্যাসটা তত ক্ষতিকারক?

মা : তাকে কাজে লাগালেই ল্যাটা চুকে যায়। জীবাণুদের হজমশক্তির দৌলতে যে গ্যাস পাওয়া যায়, তার প্রায় ৭৫ শতাংশই শুধু মিথেন। পাইপে করে সেই গ্যাস টেনে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে সেই উত্তাপকে কাজে লাগানো হচ্ছে ব্রিটেন। ১৯৭৪ সালে ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিশন দেখিয়েছে, উপহ্রদে নোংরা জমিয়ে, তাতে অ্যালগি-র চাষ করে, প্রচুর মিথেন পাওয়া যায়। একটা শহরের বিশ লাখ মানুষের ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে একটা ১০০০ মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন চালু রাখা যায়—৮০,০০০ লোককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

প্রশ্ন : নর্দমার ছিবড়েগুলো তো থেকে যাচ্ছে?

মা : তাকে জমির সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়—তার মধ্যে নাইট্রেট, সালফেট আর ফসফেট থাকে—মাটির পুষ্টি তো এরাই।

প্রশ্ন : জলা জায়গায় কাঠ-পাতা পচে গিয়ে কি উপকারটা করছে আমাদের?

মা : আজকের কয়লা পাচ্ছিস সেই পচনের ফলে। তিরিশ কোটি বছর আগে ফার্ন জাতীয় গাছগুলোর জঞ্জাল পচিয়ে 'পীট' বানিয়েছিল জীবাণুরা। মাটির তলায় চাপে থেকে তারাই হয়েছে কয়লা।

প্রশ্ন : তাহলে তো কলকারখানা আর চাষ-আবাদের সমস্ত বিষাক্ত আবর্জনা জীবাণুরাই সাফ করতে পারে?

মা : খুবই বিপজ্জনক প্রস্তাব। সমস্ত বোঝা জীবাণুদের ওপর ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক? আমাদের উচিত শহরের আবর্জনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে লাগানো—জীবাণুরা অবশ্যই সাহায্য করবে। কয়েক কোটি বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে জীবাণুরা পোক্ত হয়েছে পৃথিবীর ফেলে দেওয়া জিনিসগুলোকে পৃথিবীর ভালো কাজে লাগানোর ব্যাপারে। মাত্র কয়েক শ' বছর ধরে মানুষ-কেমিস্টরা এন্তার বিষাক্ত কেমিক্যাল ছড়িয়ে যাচ্ছে পরিবেশে—আপ্রাণ সামাল দিয়ে চলেছে জীবাণুরা। যেমন ধর, তেল বওয়া জাহাজগুলো থেকে ফি বছর কুড়ি বিলিয়ন কেজি তেল সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক সাফ করার সময়ে। সেই বিষ ক্ষতি করছে সমুদ্রের প্রাণী আর গাছের। ১৯৭৪ সালে ইজরায়েলের বৈজ্ঞানিকরা বললেন, তেল-খেকো একরকম ব্যাকটিরিয়া তাঁরা বানিয়েছেন। ট্যাঙ্কের তলানি তারা খেয়ে সাফ করে দেবে, উপরন্তু এমন প্রোটিন বানিয়ে দেবে যা জীবজন্তুর আহার যোগাবে।

প্রশ্ন : একটু আগে বললে, কয়লার খনির মিথেন গ্যাস সাবাড় করছে জীবাণুরা। কীভাবে, মা?

মা : খনি-শ্রমিকদের কাছে ভয়াবহ এই গ্যাসের নাম ফায়ার-ড্যাম্প। আগুনের ছোঁয়ায় ফেটে পড়ে। মস্কোর খনি গবেষকরা মাটি ফুটো করে, তরল পদার্থের মধ্যে এমনসব জীবাণু ঢুকিয়ে দেন যারা মিথেন খেতে ভালবাসে—তার বদলে দেয় জল আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

প্রশ্ন : পেট্রল সৃষ্টি কি জীবাণুদের কীর্তি?

মা : সমুদ্রের তলানিকে লক্ষ কোটি বছর আগে জীবাণুরাই পেট্রলিয়ামে রূপান্তরিত করেছে, এমন একটা বিশ্বাস ক্রমশ দানা বাঁধছে। মজাটা কি জানিস, আজ সেই পেট্রলিয়াম যখনি ফুরিয়ে আসছে, মাটির নিচে

আলট্রা-সেন্সিটিভ ব্যাকটিরিয়া নামিয়ে পেট্রলিয়ামেরই তল্লাসি চলছে—যে পেট্রলিয়ামকে প্রথমে বানিয়েছিল জীবাণুরাই।

প্রশ্ন : বাইরে থেকে পেট্রলিয়াম যদি আর না আসে, তাহলে তো জীবাণুরাই পাল্টা জ্বালানি দিতে পারে?

মা : ইস্ট আর ব্যাকটিরিয়া বানাচ্ছে অ্যালকোহল। সাধারণ ইথাইল অ্যালকোহলের অকটেন নাম্বার হল ৯৯; সমানভাগে অ্যালকোহল আর ৭০-অকটেন পেট্রল মিশোলে অকটেন সংখ্যা উঠে যাবে ৮৮-তে। 'পাওয়ার অ্যালকোহল' নামে এই জ্বালানির ৫০ কোটি কিলো গোটা ইউরোপে চলেছিল তিরিশের দশকে। পেট্রলের চাইতে সস্তা হবে এখানেও। তবে হ্যাঁ, ইঞ্জিন পাল্টে নেওয়া দরকার অ্যালকোহলকে পুরোপুরি জ্বালানোর জন্যে। পরিবেশ দূষণও কমবে। ১৯৭৪ সালে আমেরিকান জার্নাল 'সায়ান্স'-এ পেট্রলে অ্যালকোহল মিশোনোর কথা নতুন করে বলেছিলেন Dr. William Smyers।

প্রশ্ন : ঈস্ট কী জিনিস, মা?

মা : ছত্রাক জাতীয় একরকম জৈব পদার্থ। নানারকম গাছপালা জাতীয় জিনিসকে গাঁজিয়ে দেয়। পাঁউরুটি নরম আর ফাঁপা করবার জন্যে ময়দার সঙ্গে ঈস্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়। ঈস্ট থেকে একরকম এনজাইম বেরোয়—রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় এই এনজাইম।

প্রশ্ন :ঈস্ট কি আরও উপকারে লাগে?

মা : নিশ্চয়। ফেলনা জিনিস থেকে ঈস্ট আর অ্যালগি বানিয়ে নিলে প্রোটিন আর ভিটামিন ঠাসা খাবারের অভাব মিটবে। কাগজের কারখানায় বাজে জিনিস বলে ফেলে দেওয়া হয় 'সালফাইট লিকার'। এর মধ্যে ঈস্টের চাষ হতে পারে। শহরের আবর্জনায় হোক অ্যালগির চাষ। ইথাইল অ্যালকোহল বেশি করে তৈরি করলে লক্ষ কোটি বছরে তৈরি জ্বালানির জন্যে আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে না। রঙ, ল্যাকার, তেল এবং আরও অনেক জিনিসের 'সলভেন্ট' হিসেবে কাজে লাগে ইথাইল অ্যালকোহল। ঈস্ট যখন অ্যালকোহল বানায়, তখন যে কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি হয়ে যায়, তাকে 'ড্রাই আইস' হিসেবেও বেচে দেয় অনেকে। বাড়তি ঈস্ট পশুখাদ্য হিসেবে কাজে লেগে যায়। ফাংগাস অর্থাৎ ছত্রাককে কাজে লাগিয়ে সেলুলোজ থেকে খাবার তৈরির কথাও ভাবা হচ্ছে। ফাংগাস গ্লুকোজকে টেনে বের করবেই সেলুলোজ থেকে। গাছপালা, পুরোনো খবরের কাগজ—সবকিছুই Trichoderma viride ছত্রাকের কাছে মুখরোচক খাদ্য—বিনিময়ে পাওয়া যাবে গ্লুকোজ—অত্যন্ত সস্তায়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে দিল্লি আই-আই-টি'র প্রফেসর টি. কে. ঘোষ অস্ট্রেলিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ফুড সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে বলেছিলেন—খবরের কাগজকে ২৪ ঘন্টায় 'পাতলা মধু' বানিয়ে দিতে পারে ফাংগাসের এনজাইম। ব্রিটেনের কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির গবেষকরা দেখেছেন, কাগজ থেকে প্রোটিনও বানানো যায়। দু-শ গ্রাম মাংসে যতটা প্রোটিন থাকে, তিনশ গ্রাম কাগজ থেকে তা পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন : কাগজ থেকে মধু, কাগজ থেকে প্রোটিন? ঈস্টের এত বাহাদুরি সেকালের লোক জানত না?

মা : দশ হাজার বছর আগে মেসসালিথিক যুগ থেকেই মানুষ জেনেছিল ঈস্টের কিছু কিছু বাহাদুরি—পাওয়া গেছে তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ। মদ তৈরি হয়েছে তখনও। প্রস্তর যুগেও পাঁউরুটি ফাঁপানো হয়েছে ঈস্ট দিয়ে। মাইক্রোব চিরকালই আমাদের বন্ধু।

প্রশ্ন : মাইক্রোব! মানুষ তাদের গিলছে?

মা : গিলছে এবং গতর ঠিক রাখছে। দই ভালবাসিস—সেটা তো মাইক্রোবদের জন্যেই তৈরি হচ্ছে দুধ থেকে। ছানা, চীজ, আচার, ভিনিগার—সবকিছুরই বিশেষ স্বাদ আর সুগন্ধ—সবই মাইক্রোবদের ম্যাজিক কারখানার দৌলতে।

প্রশ্ন : অদৃশ্য বন্ধুদের ম্যাজিক কারখানা আরও আছে নাকি?

মা : এখনও পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তার জোরেই বলা উচিত, দণ্ডবৎ অদৃশ্য বন্ধু! ১৯২০-তে পেনিসিলিন তৈরি হয়েছিল যৎসামান্য; কিন্তু মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে তার গুণ জানবার পর থেকেই মাইক্রোবদের সাহায্য নিয়ে তাদের উৎপাদন বাড়ানো হল হাজার হাজার গুণ। ঠিক এইভাবে যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে ১৯৪৪ সালে জামাইকায় খোলা হয়েছিল খাবার ঈস্ট-এর কারখানা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে মাইক্রোবদের খাটিয়ে গ্লিসারিন তৈরির কাহিনী কে না জানে।

প্রশ্ন : খনি থেকে ধাতু বের করে কী করে, মা?

মা : শুধু পেট্রল নয়, বেশ কয়েকটা দারুণ দরকারি খনিজ তেমন আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে মাথায় হাত দিয়েছেন খনি ইঞ্জিনিয়াররা। বিশেষ করে তামা আর ইউরেনিয়াম। দুনিয়া জুড়ে তখন থেকেই ভাবনা শুরু হয়েছে, ব্যাকটিরিয়াদের লেলিয়ে দিয়ে নাগালের বাইরে থাকা ধাতু মিশোনো খনিজ পদার্থ আর খনি থেকে খনিজ তোলার পর ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে খনিজ উদ্ধার করা হোক। ব্যাকটিরিয়া-বাহিনীর কাজ একটু শ্লথ বটে, কিন্তু বেজায় সস্তা। বিদ্যুতের বা মূলধনের দরকার হয় না। গন্ধক পাচ্ছি মূলত ব্যাকটিরিয়াদের কেরামতিতেই। আগ্নেয়গিরির প্রতাপে কিছু গন্ধক স্তূপ তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যে সব গন্ধকের স্তূপ তৈরি হয়েছে সেখানে কেরামতি এই ব্যাকটিরিয়াদের, যেমন টেক্সাস-এর গন্ধক। পৃথিবীর গন্ধক-চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ যুগিয়ে যায় একাই। জায়গাটা এককালে মেক্সিকো উপসাগরের অংশ ছিল। ব্যাকটিরিয়া এখানকার ক্যালসিয়াম সালফেটকে গন্ধকে রূপান্তরিত করে। একইভাবে লিবিয়া-র বহু লেক থেকে গন্ধক উৎপাদন সম্ভব। মাইক্রোবদের খাটিয়ে গন্ধক তৈরির সম্ভাবনা সোৎসাহে ভাবা হচ্ছে এই কারণেই। আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ায় মাইক্রোব লেলিয়ে কপার আর নিকেল উদ্ধার করা হচ্ছে বহু খনিতে। পাওয়া যাচ্ছে ইউরেনিয়াম। আমেরিকায় ম্যাঙ্গানিজ আর রাশিয়ায় সোনা পাইয়ে দিচ্ছে মাইক্রোবরা।

প্রশ্ন : তা সত্ত্বেও জীবাণুদের ধরে ধরে মেরে ফেললে অনেক জীবাণু তো লোপ পাবে?

মা : গুটি বসন্তর জীবাণু তো লোপ পেতেই বসেছে। এই মুহূর্তে প্রায় বিশ হাজার জাতের গাছ লুপ্ত হওয়ার পথে। বিরল গাছ আর প্রাণীদের সংরক্ষণের চেষ্টা যেমন চলছে, ঠিক তেমনি ভাবে বিরল জীবাণুদের টিকিয়ে রাখা উচিত নয় কি? স্মলপক্স ভাইরাস এককালে যেমন রোগ বানিয়েছে, তেমনি রোগ ঠেকাতে সাহায্যও তত করেছে। ভাইরাস অতিশয় ক্ষুদে প্রাণী, অবিশ্বাস্য জটিল তার প্রাণময় দেহ—যাকে কক্ষনো গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যাবে না। এই কারণেই স্মলপক্স ভাইরাসকেও জিইয়ে রাখা দরকার। মাইক্রোব প্রতিভা কখন কীভাবে মানুষের সমস্যার সমাধান ঘটাবে—মানুষ তা নিজেই জানে না।

প্রশ্ন : মাইক্রোব প্রতিভা?

মা : লিচেন অর্থাৎ শ্যাওলা দিয়ে বাতাসদূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কি চলছে না? গাছের গুঁড়ি, দেওয়াল আর কবরখানার বেশ কয়েকটা লিচেন প্রজাতি বাতাসের ভারি ধাতুর ক্ষেত্রে বিলক্ষণ সেন্সিটিভ। Physcia caesia আর Xanthoria parietina নামে দুটো লিচেন টিকতে পারে না বাতাসের সালফার ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব দশ

লক্ষ ভাগে ০·০৫ ভাগ বেড়ে গেলেই। এদের ম্যাপ বানিয়ে নিয়ে বাতাসে দূষণের অঞ্চল বের করা গেছে গোটা বৃটেনে। টেকনিকটা খুব সস্তা আর সোজা। বৃটেনের ওপেন ইউনিভার্সিটির আর স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই কাজটা করে দিয়েছে। গাছপালা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে লিচেনরাও লুপ্ত হতে চলেছে। The Vanishing Lichen গ্রন্থে ডক্টর ডেভিড রিচার্ডসন তাই বলেছেন: লিচেনদের বাঁচাও—মানুষেরই স্বার্থে। শান্তশিষ্ট ডেলা ডেলা এই মাইক্রোবরা খাদ্য হয়েও বাঁচিয়ে রেখেছে ইউরেশিয়ান হরিণ, নর্থ আমেরিকার caribou হরিণদের। উই, পোকা, শামুক—এরাও লিচেন খেয়ে বেঁচে থাকে। পাখি তাদের বাসা বানায়। নিউগিনির গুবরে পোকার কায়দায় বহু প্রাণী লিচেনের ছদ্মবেশে নিজেদের লুকিয়ে রাখে শত্রু চোখের আড়ালে। উত্তর গোলার্ধের বহু মানুষ লিচেন রেঁধে খায়—এস্কিমোরা ক্যারিবো-র পেট কেটে অর্ধেক হজম লিচেন খেতে বড় ভালবাসে। জাপানে Umbilicaria esculenta লিচেন সব্জিবাজারে বিক্রি হয়। গত যুদ্ধে রাশিয়া লিচেনের কারখানা খুলেছিল চিনি তৈরির জন্যে। জোলাপ, কাশির ওষুধ, আরও অনেক টোটকা তৈরি হয়ে চলেছে এই লিচেন থেকে। লিচেন থেকে তৈরি অ্যান্টিবায়োটিক, Usnic acid, বিশেষ কয়েকটি চর্মরোগের মোক্ষম দাওয়াই। গাছের ছত্রাক রোগেও রুখে দাঁড়ায় এই লিচেন। সুগন্ধি কারখানার কাঁচা মাল তো এই লিচেন। অনেক রঙ তৈরি হচ্ছে লিচেন থেকে। লিটমাস লিচেনেরই উপহার—অ্যাসিডকে করে লাল, অ্যালকালি-কে নীল—তৈরি হয় Rocella লিচেন থেকে। মমির গায়ে এককালে লিচেন রগড়ে দেওয়া হত। আর এখনকার 'লিচেন-লজি' দিয়ে কোন পাথরের কত বয়স, তাও নির্ধারণ করা হচ্ছে; লিচেন কলোনী মাপলেই তা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই টেকনিকেই জানা গেছে, ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের পাথরের মূর্তিগুলো তৈরি হয়েছিল ৪৩০ বছর আগে। এত উপকারী প্রাণীদের লোপ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই ব্রিটেন লিচেন সোসাইটি ১৯৬৮ সালে রুখে দাঁড়িয়েছিল কলকারখানার বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন : লিচেনের মত পরমবন্ধু নয় যারা, তাদের গণহত্যায় আপত্তি থাকবে কেন?

মা : বাঘসিংহ কি আমাদের পরমবন্ধু? তাদের গণহত্যায় কেন আপত্তি? এই প্রথম গোটা বিশ্ব এককাট্টা হয়ে একটা প্রাণীকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে চলেছে—আগেই বলেছি তার নাম—স্মলপক্স ভাইরাস। মারাত্মক ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার বংশ ধ্বংস করতে যাঁরা চান, তাঁরাই কিন্তু জীবাণুবাহী ইঁদুর, পাখি বা মাছির বংশ ধ্বংস করার প্রস্তাব উঠলেই গুম মেরে যাবেন। তিমি বৃহৎ প্রাণী বলেই তাদের লুপ্ত হওয়ার কথা উঠলেই আঁতকে উঠতে হবে, জীবাণুদের জন্যে সেই দরদ থাকবে না কেন? ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তাদের সৌন্দর্য প্রজাপতি বা কোয়ালা ভালুকের চেয়ে কম নয়। অদৃশ্য বলেই কি তারা উপেক্ষার বস্তু? গবেষণায় সব প্রাণীকেই দরকার হয়, বেশি দরকার হয় মাইক্রোবদের। বায়োলজির দুনিয়া কাঁপানো বহু আবিষ্কার ঘটেছে ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাসদের দৌলতেই—রোগকারক জীবাণুও আছে তাদের মধ্যে। এদের একজনও লুপ্ত হয়ে গেলে প্রাণের প্রকৃতি আর উৎস নিয়ে গবেষণায় বাগড়া পড়বে। বায়োলজির আরাধনায় অনিষ্ট ঘটবে। প্রজাপতি আর হাতির জন্যে প্রাণ কাঁদে, মাইক্রোবদের জন্যে কেন নয়? স্মলপক্স ভাইরাস খতম হয়ে গেলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত নাও হতে পারে—অন্য বহু রোগকারক জীবাণু চিরবিদায় নিলে তা হতে পারে। সবচেয়ে বড় যুক্তিটা এই: একদিন এই স্মলপক্স ভাইরাসকেই প্রয়োজন হতে পারে বাস্তব প্রয়োজনে—রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে। এই ভাইরাসের অবিশ্বাস্য ক্ষুদে গঠন প্রণালী, বিশেষ করে DNA, ল্যাবোরেটরিতে

কোনোদিনই নতুন করে গড়া যাবে না। লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের ফল এই ভাইরাস একবার মুছে গেলে বৈজ্ঞানিকদের ক্ষতি হবে নাকি?

প্রশ্ন : ডি-এন-এ'র কথা তুললে কেন? ভাইরাসের ডি-এন-এ কি কাজে আসবে?

মা : স্মলপক্স ভাইরাসের মত রোগকারক মাইক্রোবও দরকার হতে পারে যে উঠতি বিজ্ঞানে, তার নাম 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'। প্রকৃতিতে জিন-কম্বিনেশন যেভাবে সম্ভব হয়, এই বিজ্ঞানের টেকনিক তা করতে পারে জিন-দের কাছে এনে জোড়া লাগিয়ে। পশু আর মাইক্রোব কোষের রকমারি ডি-এন-এ জুড়ে দিয়ে প্রাণের প্রবাহকে নানা দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়—ওষুধ, চাষ-আবাদ, জীবাণু শিল্পে যার প্রয়োজন হবেই। দুজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আইডিয়াকে পাবলিসিটি দেন। ডক্টর রজার্স তাই নিয়ে পরে কাজ করেছিলেন। কিন্তু ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা মাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে প্রথম দেখালেন, প্রাকৃতিক কোষে সমস্ত জিন যেভাবে থাকে, ল্যাবোরেটরিতে তা জাল করা যায়। নির্বিষ ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকে জেনেটিক প্যাসেঞ্জার হয়ে গিয়ে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়া পাল্টে দিতে পারে, এটা জানবার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, তাহলে শরীরের বিশেষ এনজাইম বা হরমোনের ঘাটতি থাকলে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে তার পূরণ সম্ভব হবে না কেন? ইন্টারফেরনের মত ভাইরাস-সংক্রমণ প্রতিরোধী পদার্থকেও তৈরি করা যাবে না কেন গবেষণাগারের আধারে মাইক্রোজীবদের সাহায্য নিয়ে? সায়েন্স-ফিকশন মনে হতে পারে, কিন্তু নাইট্রোজেন পাকড়ানোর ব্যাকটিরিয়ার জিন আলাদা করে নিয়ে গাছের ডি-এন-এ'র মধ্যে বসিয়ে দিলে যে নতুন কোষ তৈরি হবে, তা একাধারে গাছের ফটোসিন্থেসিস আর পশুর পুষ্টিকর পদার্থ তৈরির ক্ষমতা রাখবে একই কোষের মধ্যে। জিন-দের এইভাবে জোড়াতালা লাগাতে গিয়ে মহাবিপদও ঘটতে পারে—বৈজ্ঞানিকরা তাই হুঁশিয়ার। কিন্তু কোষ-কমপিউটারদের মত নতুন জীবদের বানিয়ে নিয়ে সমুদ্রে, মরুভূমিতে ছেড়ে দেওয়া যাবে—আজকের মাইক্রোবদের জেনেটিক রিজার্ভ তাই খুব দরকারি। ডি-এন-এ হেলিক্স-এর মধ্যে অবিশ্বাস্য তথ্য সংকেত আকারে রয়েছে—ঠিক যেন কমপিউটারের প্রোগ্রামিং। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তাই ভাবছে নতুন প্রাণ সৃষ্টির কথা।

প্রশ্ন : মাইক্রোব, মানে, এই অণু-জীবরা কত ছোট হয়, মা?

মা : ভাইরাসরা সবচেয়ে ছোট, অ্যালগি আর ফাংগাসরা সবচেয়ে বড়—সাইজরেঞ্জের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে ব্যাকটিরিয়ারা। তবুও বেজায় ছোট নয়। এক কিউবিক ইঞ্চির একটা বাক্সে মাঝামাঝি সাইজ ভ্যারাইটির একটা ব্যাকটিরিয়ার ৯,০০০,০০০,০০০,০০০ গুলোকে ঢুকিয়ে রাখা যায়। এদের মাপতে হয় মাইক্রোমিটার দিয়ে—যা এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। সব চাইতে ছোট আকারের ব্যাস প্রায় দু-মাইক্রোমিটার —তাকে বলা হয় 'কোক্কাই'। বড়-আকারের 'ব্যাসিলাই' লম্বায় দশ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ধরনের মাইক্রো-প্লাজমার ব্যাস মাত্র ০·১৩৫ মাইক্রোমিটার। ভাইরাস আরও ছোট। তাদের মাপার জন্যে দরকার নতুন স্কেল; সেটা এক মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। স্মলপক্স ভাইরাসের ব্যাস অবশ্য ০·২৫ মাইক্রোমিটার।

প্রশ্ন : এত ছোট বলেই অণু-জীবরা নীচুস্তরের প্রাণী, তাই না, মা?

মা : মোটেই না। এরা আদিম তো নয়ই, বরং অত্যাধুনিক। নীচুস্তরের নয়—রীতিমত নিপুণ কর্মী। সাইজ ছোট বলেই তো এদের তাচ্ছিল্য করা হয়। এই পৃথিবীর সবচেয়ে সফল প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট যুদ্ধে

নামলে জিতবে অণু-জীবরা। মানুষের অনেক আগে তারা এই পৃথিবীতে ঘর-সংসার করে এসেছে—নানা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থেকেছে—মানুষ যা পারছে না। ওই টুকু শরীরে মাত্র একটা কোষের মধ্যে প্রাণ ধারণের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম প্যাক করে রেখেছে—যে সবের জন্যে মানুষের দরকার হয় অনেক টিশু আর দেহযন্ত্র।

প্রশ্ন : ছোট্ট হলেই বুঝি দক্ষতা বাড়ে?

মা : একটা জিনিসের ভল্যুম যত তাড়াতাড়ি বাড়ে, তার সারফেস এরিয়া ততটা বাড়ে না। উল্টোভাবে বললে, একটা জিনিস যত ছোট হবে, ভল্যুমের অনুপাতে তার সারফেস এরিয়া অনেক বেশি থাকবে। মানুষের বেলায়, সারফেস এরিয়া-র সঙ্গে ভল্যুমের অনুপাতের হার হয় যদি কুড়ি, বিশেষ একটা ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে তা হবে নব্বই লক্ষ! সে খাবার খাচ্ছে আর ছিবড়ে করে বের করে দিচ্ছে শরীরের আবরণের মধ্যে দিয়ে—ছোট হওয়ার সুবিধে তো এইখানেই। বড় কোষের চেয়ে ছোট কোষে রাসায়নিক কাজকর্ম চলে বেশি দ্রুত। প্রচণ্ড এই ক্ষমতার জন্যেই সিনথেটিক কেমিস্ট হিসেবে ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট আর অন্যান্য মাইক্রোবদের এত কদর—জঞ্জাল সাফ করতেও তাদের জুড়ি নেই।

প্রশ্ন : অণু-জীবরা এত তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে যায় কীভাবে?

মা : ভল্যুম ঠিক রাখার তাগিদে। ভল্যুম বাড়লেই সারফেস এরিয়া কমছে, খাবার নেওয়া আর জঞ্জাল ফেলে দেওয়ার বিনিময় স্পিড কমছে; তখন ব্যাকটিরিয়াররা বড় কোষটাকে ভেঙে নিয়ে দুটো ছোট কোষ বানিয়ে নেয়। ঈস্টরা কুঁড়ি বানিয়ে ছোট সাইজের হয়ে যায়। ই কোলাই ব্যাকটিরিয়ার পুরো নাম Escherichia coli, মানুষের অস্ত্রে রয়েছে বহাল তবিয়তে—মিনিটে প্রায় কুড়িবার কোষ ভেঙে নতুন কোষ বানাতে পারে। এক চামচ মাংসে ই কোলাই-এর একটা কোষ রেখে দিলে তিন ঘন্টায় তা হাজার গুণ বেড়ে যাবে। এরকমভাবে বংশবৃদ্ধি আর কোনো জীবের পক্ষে কি সম্ভব?

প্রশ্ন : অণু-জীবদের গড়ন কী রকম?

মা : কোষ-ঘেরা দেওয়ালটা এদের শরীরের সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস। ভীষণ শক্ত দেওয়াল; গায়ে অজস্র ফুটো—যাতে কোষের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে পারে রকমারি উপাদান। কিন্তু এই আসা-যাওয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কোষের মিহি ঝিল্লী। দেওয়াল আগলে রেখে দেয় এই পাতলা পর্দাকে। আর, এই দেওয়াল ভাঙতে গিয়েই গবেষকদের হিমসিম খেতে হয় গবেষণাগারে। কোষের মধ্যে রয়েছে প্রোটোপ্লাজম—রাসায়নিক কর্মকাণ্ডর ফুটন্ত মসলার কড়াই বলা চলে তাকে। বংশগতির উপাদানকে ঘিরে থেকে সেখানকার সঙ্কেতগুলোর তর্জমা করে নতুন কোষ গড়ছে, পুরোনো কোষকে চাঙা রাখছে। ই কোলাই ব্যাকটিরিয়ার জেনেটিক উপাদান ডি-এন-এ অর্থাৎ ডি অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড-এর বংশগতি নির্দেশকে অনুবাদ করে দিচ্ছে আর-এন-এ অর্থাৎ রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড—কোষের এত নির্দেশ আর কাজকর্ম চলছে অজস্র এনজাইম আর প্রোটিনের মধ্যস্থতায়। মানুষ, কপি, চিতা আর অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও চলছে DNA-RNA-এনজাইম-প্রোটিনের একই বিস্ময়কর ক্রিয়া। বটানিস্টরা Eugleoid প্রাণীদের বলেন অ্যালগি, প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলেন জন্তু—কেন না তাদের মুখ, উদর, চোখের মত প্রত্যঙ্গ আছে।

প্রশ্ন : ব্যাকটিরিয়া চলাফেরা করে কিভাবে?

মা : অদ্ভুতভাবে। সবচেয়ে বেশি স্পিড, তোর বা আমার হিসেবে, ঘণ্টায় ০·০০০১ মাইল। জলের মত থকথকে বস্তুর মধ্যে পুঁচকে ব্যাকটিরিয়ার এই স্পিড অবাক করার মত ঘটনা। গুড় ভর্তি সমুদ্রে নৌকা চালানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। নৌকা তখন চলবে না। ব্যাকটিরিয়া কিন্তু চলে। কারও থাকে flagela, কারও থাকে মিথ্যে-পা বা pseudopodia।

প্রশ্ন : ব্যাকটিরিয়া অনাহারে মরে না?

মা : বড় সুবিধাবাদী এরা। খাবার পেলে বোমার মত ফেটে পড়ে বংশবৃদ্ধি করে চলে—না পেলে গুটির মধ্যে ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকে—বাইরের হাজার বৈরী পরিবেশেও তার কিস্‌সু হয় না। সতেরো শতকের জীবন্ত ব্যাকটিরিয়া গুটিও তো পাওয়া গেছে মাটির নমুনায়।

প্রশ্ন : ভাইরাসের গড়ন কী রকম?

মা : ডি-এন-এ ঠাসা—তার চেয়ে একটু বেশি; কয়েক ক্ষেত্রে আর-এন-এ'ও থাকে। এক জীবন্ত কোষ থেকে আর এক জীবন্ত কোষে চালান হয়ে যায় এই ভাইরাস—জীবন্ত কোষগুলো হতে পারে মানুষের, পশুর, গাছের বা ব্যাকটিরিয়ার। অন্যকে ধরেই এদের টিকে থাকা। নিজেদের জোরে বাঁচতে পারে না—তাই এদের কেমিক্যালের মত কৃস্টাল বানিয়ে বোতলে পুরে তাকে তুলে রাখা যায়। কিন্তু জ্যান্ত কোষের সংস্পর্শে এলেই অ্যাটাক করে তক্ষুনি। কোষ ধ্বংস হয়, রোগসৃষ্টি হয়, আবার এই ভাইরাসই বংশগতির ধারা বয়ে নিয়ে যায় কোষের মধ্যে, যে পরিবর্তনটা ঘটায়—তা ক্ষতির বদলে উপকারই করে। ব্যাকটিরিয়া-ভাইরাসকে দেয় colicin নামে হানাদার-প্রোটিন রুখে দেওয়ার ক্ষমতা। টিউলিপ ফুলের অত রঙের বাহার তো ভাইরাস সংক্রমণের জন্যেই হয়।

প্রশ্ন : অণু-জীবদের সহ্যশক্তি কতটা, মা?

মা : ধারণায় আনা শক্ত। ছোট্ট বলে আর তাদের তাচ্ছিল্য করা যায় না। আমাদের স্বাভাবিক বডি টেম্পারেচার প্রায় ৩৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড; ৩২-এর নিচে নামলে অথবা ৪১-এর ওপরে উঠলে তক্ষুনি ডাক্তার ডাকতে হয়। ব্যাকটিরিয়ারা এ-ব্যাপারে টেক্কা মারে আমাদের। নিউজিল্যাণ্ড আর আইসল্যাণ্ডের ফুটন্ত প্রস্রবণে তাদের পাওয়া গেছে। মেরু অঞ্চলের আবর্জনায় মাইনাস ১২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেও তারা হেসে খেলে রয়েছে। হয়তো একই ধরনের অণু-জীব দু-জায়গাতে নেই—কিন্তু তাপমাত্রার মস্ত ফারাকের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি মানুষ বা অন্য জন্তুর তুলনায় অনেক বেশি। অ্যালগি দল বেঁধে বেড়ে ওঠে বরফ-প্রান্তরে অথবা হিমবাহতে—আলাদা কোষগুলোকে দেখা না গেলেও তারা কাতারে কাতারে আছে বলেই বরফ কখনো লাল, কখনো সবুজ হয়ে থাকে। দক্ষিণ মেরুতে ভাসমান বরফের তলায় অ্যালগি সংসার করে—বরফ ভেদ করে আসা অত কম আলো পেয়েও আর অত মারাত্মক ঠাণ্ডাতেও তারা মহাখুশি। আবার দ্যাখ, ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের উষ্ণ প্রস্রবণে পরমানন্দে থাকে তাপপ্রিয় অ্যালগি আর ব্যাকটিরিয়া। অক্সিজেন না থাকলে মানুষ অক্কা পায়। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেনের মধ্যে বরং পটল তোলে—অক্সিজেন না থাকলে তোফা বেঁচে থাকে। গ্রেট সল্ট লেক আর ডেড সী-র মারাত্মকভাবে লোনা জল কিছু ব্যাকটিরিয়ার কাছে স্বর্গ বললেই চলে; আবার কড়া অ্যাসিড যে-সব জলা, প্রস্রবণে আর লেকে রয়েছে—সেখানেও তারা বড় সুখে আছে। ১৯৬৮ সালে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে, আগের এক অভিযাত্রীর কুঁড়েতে ঢুকে, ১৯১৩ সালে ফেলে যাওয়া বরফ-জমা মল পাওয়া গেছিল। দেখা গেছিল, ই-কোলাই কোষ তার মধ্যে তখনো টিকে আছে। ১১০ ভোল্ট কারেন্টের শক দিয়েও

দেখা গেছে, অণুজীবরা তা গায়ে মাখে না। ডীপ-ফ্রীজের মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ব্যাকটিরিয়া আর অন্যান্য অণু-জীবদের রেখে দেওয়া হয় গবেষণার জন্যে। চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ নকল করে তার মধ্যে অণু-জীবদের রেখে দেখা গেছে—তাও তাদের গা-সওয়া।

প্রশ্ন : এত সহ্যশক্তি বলেই কি ওরা পেট্রল বানাতে পেরেছে?

মা : বহু বৈজ্ঞানিক ঠিক তাই মনে করেন। অন্তত নিশ্চয় একটা মস্ত ভূমিকা নিয়েছে অণু-জীবরা। পেট্রল সংশ্লেষণ প্রথম ঘটেছিল সমুদ্রের তলায় নিশ্চয় প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড চাপে—প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। দুঁদে অণু-জীবদের সহন-ক্ষমতা এর চাইতে অনেক বেশি। বেশি নুন, ৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা আর অক্সিজেন না থাকা—এ সবই তো অণু-জীবদের কাছে স্বর্গীয় পরিবেশ। ভয়ঙ্কর এই প্রতিকূল অবস্থায় অন্য কোনো প্রাণ টিকতে পারে?

প্রশ্ন : অণুজীবরা খাবার হজম করে শক্তি অর্জন করে নিশ্চয় অনেক ট্রিক্‌স্‌ খাটিয়ে?

মা : যা বলেছিস। ব্যাকটিরিয়ারা বিখ্যাত তাদের metabolic tricks আর অনেকরকম বৈশিষ্ট্যের জন্যে। এই জন্যেই তো 'প্রাণের রহস্য' উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ওদের বায়োকেমিস্ট্রির শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। মানুষ আর বহু স্তন্যপায়ী জীব বিবিধ জৈব বস্তুকে ভেঙে নিয়ে এনার্জি বানায়। কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লুকোজ তৈরি করতে গিয়ে ধাপে ধাপে কয়েকটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ফ্যাট থেকেও আর এক পথে এনার্জি টেনে বের করতে হয়। কিন্তু সেলুলোজকে ভেঙে গ্লুকোজ বের করতে পারি না বিশেষ এনজাইমের অভাবে। এই সব ব্যাপারে ব্যাকটিরিয়াদের ট্যালেন্ট মানুষের চেয়ে বেশি। তারা সরাসরি অজৈব জিনিস থেকে এনার্জি বানিয়ে নেয়; যেমন, অ্যামোনিয়া, গন্ধক, লোহা আর নাইট্রাইট্‌স্‌ থেকে। জৈব খাদ্য থেকে আমরা আমাদের টিশু বানাই, এনার্জিও জুটিয়ে নিই—কিছু ব্যাকটিরিয়া তাদের কোষের চাহিদা বানিয়ে নেয় অ্যামোমিয়া, কার্বন ডায় অক্সাইড আর জল থেকে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, নিউক্লিক অ্যাসিড—সবই সংশ্লেষণ করে নেয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রাণের এনার্জির মূল উৎস সূর্য। কিছু অণু-জীব সূর্য কিরণকে সরাসরি কাজে লাগায়। এদের বলে autotrophs। রোদ্দুরের এনার্জি দিয়ে কার্বন-ডায়-অক্সাইড গ্যাস থেকে নিজেদের জৈব টিশু বানিয়ে নেয়। Beggiatoa ব্যাকটিরিয়া পচা ডিমের হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে সালফার তৈরি করে। Nitrosomonas ব্যাকটিরিয়া নাইট্রেট-কে নাইট্রেট বানিয়ে বহাল তবিয়তে টিকে থাকে। এদের এই এনজাইম ক্ষমতাকেই কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিতে খাটানো হচ্ছে। 'নাক' যাদের নেই, দুর্গন্ধে যারা নাক সিঁটকোয় না—সেই সব 'নীচু' জাতের অণু-জীবরা সঠিক এনজাইম সাপ্লাই করে দুনিয়ার দুর্গন্ধ আর বিষাক্ত বস্তুকে স্রেফ হজম করে ফেলছে। মানুষ কি পারে এই কেরদানি দেখাতে?

প্রশ্ন : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নাকি অণু-জীবরা?

মা : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা অনেক টেম্পারেচার, অনেক প্রেসার, অনেক হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে যা করছে, অণু-জীবরা নিঃশব্দে ঢাক না পিটিয়ে তার চাইতেও অনেক বেশি কাজ করে চলেছে। গাছ আর প্রাণীদের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার এবং আরও অনেক অজৈব বস্তুকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে লাগিয়ে। ওরাই ছেয়ে রেখেছে পৃথিবীকে। সমস্ত অণু-জীবদের কোষগুলোকে একসঙ্গে ওজন করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ওজনের চেয়ে পঁচিশগুণ বেশি। ওদের বেশির ভাগই গড়ছে, আমাদের সাহায্য

করছে, স্বাস্থ্য বজায় রাখছে—সামান্য কিছু বদমাস দল বেঁধে রোগ ছড়াচ্ছে। ওরকম সমাজশত্রু কি আমাদের মধ্যেও নেই?

প্রশ্ন : অণু-জীবরা স্ট্রাইক করলে মানুষ বিপদে পড়বে, এই তো?

মা : পৃথিবী থেকে মানুষ জাতটা মুছে যাবে যদি সমুদ্রের অণুজীবরা অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ডাঙায় গাছ দিচ্ছে বেশির ভাগ অক্সিজেন। কিন্তু পৃথিবীর অক্সিজেনের চাহিদার বেশির ভাগটা দিচ্ছে তো সমুদ্রের অণু-জীবরা। ওরা ধর্মঘট করলে বিশ বছরেই বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতিপূরণ আর ঘটবে না। তখন অনেক অণু-জীব তোফা থাকবে—মানুষ আর থাকবে না।

প্রশ্ন : গাছপালাদেরও কি বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে অণু-জীবরা?

মা : নিশ্চয়। এ ওকে সাহায্য করছে—পরস্পরকে টিকিয়ে রাখছে। গাছ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করছে কিছু ফাংগাস, আবার সেই ফাংগাসই ফসফরাসের মত অনেক পুষ্টির জোগান দিয়ে চলেছে গাছকে।

প্রশ্ন : অণু-জীবরা পশুপাখিদেরও কি সাহায্য করে?

মা : নিশ্চয় করে। গরুবাছুর, ছাগল-ভেড়া, উট-জিরাফ এবং আরও অনেক নিরামিষাশী জন্তু ঘাসপাতা খেয়ে বিলকুল হজম করে। ঘাসপাতায় থাকে প্রচুর সেলুলোজ—যার মধ্যে থাকে কার্বোহাইড্রেট। আগেই বলেছি, সেলুলোজ হজম করার বিশেষ এনজাইম মানুষের নেই—কিছু মাইক্রোবের আছে। তারা দল বেঁধে থাকে কিছু পশুর পেটের মধ্যে—বিনা অক্সিজেনে। এরাই হজম করে। নেপোয় মারে দই, মানে, লাভটা নেয় মাইক্রোবদের গৃহস্বামীরা। তারপর, ধর, মোম হজম করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। যে-পাখিরা মোম খেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে, তাদের মোম হজম করায় পেটের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা একটা ঈস্ট, আর একটা ব্যাকটিরিয়া।

প্রশ্ন : মানুষকেও তাহলে অণু-জীবদের ওপর নির্ভর করতে হয়?

মা : অবশ্যই করতে হয়। নীচু জাতের এই অণু-জীবরাই আমাদের পেটের মধ্যে থেকে ভিটামিন K, ভিটামিন B_{12} ভিটামিন B গ্রুপের অন্য ভিটামিন তৈরি করছে। খেয়ে পরে নিজেরা বেঁচে আছে, আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখছে। জীবাণু-হীন প্রাণীর শরীরে ই-কোলাই ঢুকিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেছে, ভিটামিন K-র চাহিদা কমে গেছে, রক্ত ফের জমাট বাঁধছে—না থাকলে রক্তপাত বন্ধ হতেই চায় না। B_{12} না থাকলে অ্যানিমিয়া হবে মানুষের—গাছপালা মানুষ কেউই এই ভিটামিন বানাতে পারে না। দুধের ল্যাকটোজ যারা সইতে পারে না, তাদের বন্ধু যে অস্ত্র-জীবাণু, সে ল্যাকটোজ এনজাইম দিয়ে ল্যাকটোজ হজম করিয়ে দিচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরেই এই অদৃশ্য বন্ধুদের পাইকারি হারে নিপাত করার ফলটা হাড়ে হাড়ে টের পাই আমরা।

প্রশ্ন : সমুদ্রের প্রাণীদের উপকার করে অণু-জীবরা?

মা : অনেকরকম ভাবে করে—নিজেরাও উপকৃত হয়। একেই বলে মিলেমিশে থাকা। স্কুইড আর কিছু মাছের গা থেকে আলো ঠিকরে বেরোয় আলো-ব্যাকটিরিয়াদের জন্যে—জোনাকির মত এরা আলো ছড়ানোর কেমিক্যাল নিজেরা বানাতে পারে না।

প্রশ্ন : অণু-জীবরা কি পোকামাকড়দেরও বন্ধু?

মা : যে পোকা-মাকড় শস্যের ক্ষেত তছনছ করছে, কেমিক্যাল কীটনাশক দিয়ে যাদের মারতে গিয়ে মানুষ নিজের বিপদ ডেকে আনছে—তাদের ধ্বংস করার জন্যে মৃত্যুদূত হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ বিশেষ

মাইক্রোবকে। ঝড়েবংশে সবাইকে নিধন করাটা বোকামি। অণু-জীবদের সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। এমনকি রক্তবীজের মত বেড়ে ওঠা খরগোশদের সংখ্যাও কমিয়ে আনা হয় মাইক্রোব লেলিয়ে দিয়ে—ফলে বেঁচে যায় রক্ত জল করে তৈরি করা শস্য।

প্রশ্ন : অণু-জীবরা তাহলে ত্রাতা মধুসূদন?

মা : ফচকেমি বন্ধ হয়ে যাবে এদের সব কীর্তি শুনলে। জার্মানিতে যুদ্ধের সময়ে বিস্ফোরণের নাইট্রোগ্লিসারিন বানাতে গিয়ে গ্লিসারিনে ঘাটতি পড়েছিল। সাবান তৈরির পর অল্পসল্প গ্লিসারিন পাওয়া যায়—তাতে কি হবে? শুধু তো বিস্ফোরক নয়—সেলোফেন, টেক্সটাইল, পেন্টস, এবং আরও অসংখ্য জিনিসে দরকার হয় গ্লিসারিনের। অণু-জীবদের কৃপায় জার্মানি তখন মাসে দশ লক্ষ কিলো গ্লিসারিন বানিয়ে ইজ্জত বাঁচিয়েছিল।

প্রশ্ন : আর কি বানাতে পারে অণু-জীবরা?

মা : অ্যাসিটোন আর বুটানল—খুবই দরকার হয় প্লাস্টিক আর অন্যান্য কারখানায়। বেশ কয়েকটা মাইক্রোব চোস্ত-কেমিস্ট এই সংশ্লেষণের ফিল্ডে—সবচেয়ে ওস্তাদ Clostridium নামে একটা ব্যাকটিরিয়া—অক্সিজেন যাদের কাছে বিষ। শর্করাকে ভেঙে বুটানল আর অ্যাসিটোন ছাড়াও বানিয়ে দেয় নানারকম অ্যাসিড আর অ্যালকোহল। মাইক্রোব মস্ত ইতিহাস রচনা করে দিয়েছে একটা নতুন রাষ্ট্র বানিয়ে দিয়ে।

প্রশ্ন : বলো কী! মাইক্রোব বানিয়েছে নতুন রাষ্ট্র?

মা : ব্যাপারটা সেইরকমই তো দাঁড়াচ্ছে। Chaim Weizmann ছিলেন কেমিস্ট, হলেন ইজরায়েলের প্রথম প্রেসিডেন্ট। কেন? না, তিনি মাইক্রোব দিয়ে সেই প্রথম বেশি করে অ্যাসিটোন তৈরি করেছিলেন বৃটেনের বারুদ-মন্ত্রী ডেভিড জর্জের ইচ্ছায়—১৯১৫ সালে। বিনিময়ে সম্মান চাননি Weizmann—নিজে ছিলেন ইহুদী—তাই চেয়েছিলেন ইহুদীদের জন্যে তোক একটা আলাদা রাষ্ট্র। ১৯৪৯ সালে সৃষ্টি হল ইজরায়েল। মাইক্রোব-মহিমা বুঝতে তোর অনেক সময় লাগবে—এদেরই দৌলতে পরে তৈরি হয়েছে বুটানিডিয়ল—শস্য থেকে—সিনথেটিক রাবার তৈরির জন্যে—তৈরির কৃতিত্ব পেয়েছে ব্যাকটিরিয়া Bacillus polymyxa।

প্রশ্ন : ব্যাকটিরিয়া আরাধনায় আর কি-কি বর পাওয়া যায়, মা?

মা : সাইট্রিক অ্যাসিড—বানাচ্ছে Aspergillus নামে অণু-জীব। এরাই বানাচ্ছে Itaconic acid—প্লাস্টিক আর পেন্টস্ কারখানায় বড় দরকার। গ্লুকোনিক অ্যাসিড—দরকার ওষুধের কারখানায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড—তার দরকারের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। খাবারে মেশানোর জন্যে ভিটামিন আর অ্যামিনো অ্যাসিড-ও বানিয়ে দিচ্ছে মাইক্রোবরা। অ্যান্টিবায়োটিকস্ তো বানাচ্ছেই। আরও বানাচ্ছে alignate—চটচটে বস্তু—আইসক্রিম, সুপ, আরও অনেক আহার্যকে ঘন করে তোলার জন্যে। Ustilago zeae নামে একটা ছত্রাক বানাচ্ছে Ustilagic acid—পারফিউম তৈরির musk বানাতে খুবই দরকার—খুব সস্তায়—কেমিক্যালি তৈরি করতে গেলে পড়তায় পোষায় না।

প্রশ্ন : পারফিউমের চাইতে অনেক দরকারি তো ওষুধ। বানাতে পারে অণু-জীবেরা?

মা : পলিকিউলের স্ট্রাকচার পাল্টে দিতে পারে। ১৯৩৭ সালে প্রথম দেখা গিয়েছিল, স্টেরয়েড-এর স্ট্রাকচার পাল্টে দিতে পারে ঈস্ট—গেঁটেবাতের মোক্ষম ওষুধ তৈরি করতে দরকার পশুর অ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যান্ড। ছ' হাজার পশু বধ করলে পাওয়া যেত একশ মিলিগ্রাম হরমোন। এখন কয়েকটা গাছের স্টেরয়েড-কে ভেঙেচুরে কর্টিসোন বানিয়ে দিচ্ছে ঈস্ট। ফলে, হু-হু করে দাম পড়ছে কর্টিসোনের। এরপরেও অণু-জীবরা বানিয়ে দিয়েছে

প্রেডনিসোন আর বিটামিথাজোন। প্রেডনিসোন-কে বানিয়েছে ডিপথেরিয়া জীবাণুর এক জ্ঞাতিভাই—কর্টিসোনের চাইতে পাঁচগুণ বেশি শক্তিশালী হয়েও প্রেডনিসোন কর্টিসোনের মত অপকার করে না। অণু-জীবদের রাসায়নিক নৈপুণ্যর সব শুনতে গেলে নাওয়া খাওয়া ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন : কিসের জোরে কেমিস্টগিরি করছে অণু-জীবরা?

মা : এনজাইমের জোরে।

প্রশ্ন : ভাঙচুর করে নতুন জিনিস গড়ছে এনজাইম? ইঞ্জিনিয়ার নাকি?

মা : এনজাইম ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলছে—চালাকি খাটিয়ে অণু-জীবদের দিয়ে কখনো বেশি, কখনো সীমিত এনজাইম তৈরির চেষ্টা করছেন অনেকে। ওষুধপত্রে অণু-জীব এনজাইমের কীর্তিকলাপ এখন কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছে। হজম করানোর জন্যে, জমাট রক্তের দানাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে, এনজাইম ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে। মাইক্রো-ক্যাপসুলে ভরে এনজাইম ঢুকিয়েও দেওয়া হয়েছে শরীরে ভাইটাল এনজাইমের ঘাটতি আছে বলে। Asparaginase নামে একটা ব্যাকটিরিয়া-এনজাইমকে লাগানো হয়েছে বিশেষ কয়েক ধরনের রক্তের ক্যানসার চিকিৎসায়। আগে একবার বলেছি, আবার বলছি, কিডনির দোষে রক্তের ময়লা সাফ করার জন্যে ক্যাপসুল ভর্তি এনজাইম ঢোকানো হয়েছে শরীরে। এই যে লিনেনের জামাটা পরেছিস, অণু-জীবরা খেল্ না দেখালে পরতে পারতিস?

প্রশ্ন : লিনেনের জামা করে দিয়েছে অণু-জীবরা?

মা : হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাইক্রোব দিয়ে লিনেন বানানোর শিল্প। ইংরেজিতে একে বলে retting—Linum জাতীয় Flax গাছের অদরকারি অংশ পচিয়ে দিয়ে দরকারি অংশটুকু বের করে নেওয়া। শনের সেলুলোজ ধ্বংস করে দিয়ে আঁশগুলোর বন্ধনমুক্তি ঘটায় অণু-জীবরা। তৈরি হয় লিনেন।

প্রশ্ন : এতই যদি ক্ষমতা অণু-জীবদের, বিদ্যুৎ-ঘাটতি মেটাতে পারে না?

মা : ভবিষ্যতে তাও হয়তো হবে। ১৯১১ সালে M C Potter নামে এক ভদ্রলোক জানালেন, ব্যাকটিরিয়াদের ব্যাবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। ব্যাকটিরিয়া আর ঈস্ট-কে জৈব পদার্থের মধ্যে রাখলে মৃদু ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট তৈরি হয়। অণু-জীব ব্যাটারি দিয়ে পটার সাহেব ০·৩৬৫ ভোল্টের বিদ্যুৎ তৈরি করেছিলেন। বিশ বছর পরে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক বানিয়েছিলেন 35 ভোল্ট। লেগে থাকলে মাইক্রোব পাওয়ার হাউস-ই বা হবে না কেন?

প্রশ্ন : নিউটন, ডারউইন, আইনস্টাইনকেও ম্লান করে দেবে নাকি অণু-জীবরা?

মা : নিউটনের মেক্যানিক্স, ডারউইনের ইভলিউশন, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি-র সমকক্ষ হয়ে যেতে পারে অণু-জীবদের কীর্তি—সেদিন তারা প্রাণের রহস্য উদঘাটন করে ছাড়বে, বিশ্বরহস্য সহজসরল করে দেবে।

প্রশ্ন : প্রাণের রহস্য?

মা : লাইফের ফিজিক্যাল বেসিস কী? প্রাণের কেমিস্ট্রি কী? বিখ্যাত জার্মান বায়োকেমিস্ট Otto Meyerhof দেখিয়েছেন, ঈস্ট গাঁজানোর কিছু এনজাইম রিঅ্যাকশন প্রাণীর পেশিতেও ঘটে চলেছে। সব প্রাণীর গড়ন আর আচরণের গোড়ায় যে একটা মিল আছে, অনেক পণ্ডিত আজকের ইকলজিস্টদের আগেই বলেছিলেন। বায়োকেমিক্যাল Universality শুধু ডারউইনকেই থমকে দিচ্ছে না, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের মূল যে একটাই—তাও বলছে জোরের সঙ্গে। আমরা সবাই এক—এই ঐক্যবোধের নবচেতনা গ্রহের অন্য সব বাসিন্দাদের প্রতি

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে দিচ্ছে। এমনকি অ্যালগি গাছপালার ফটোসিনথেসিস পদ্ধতির চাবিকাঠির সন্ধান জুগিয়ে দিয়েছে—এই পদ্ধতি দিয়েই তো সবুজ গাছ সূর্যের এনার্জিকে ব্যবহার করে কার্বন ডায়-অক্সাইড থেকে সুগার, স্টার্চ আর অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট বানিয়ে নেয়।

প্রশ্ন : মাগো, মলিকিউলের স্ট্রাকচার যারা পাল্টাতে পারে, তারা তো মানব-দানবও বানাতে পারে?

মা : পারে বইকি। ১৯২৮ সালে লাজুক বায়োকেমিস্ট ফ্রেড গ্রিফিথ প্রথম দেখিয়ে দিলেন একটা মাইক্রোব কোষের বিশেষ একটা কেমিক্যাল আর একটা মাইক্রোবের স্বভাবচরিত্র এক্কেবারে স্থায়ীভাবে বদলে দিতে পারে। এই কেমিক্যালেরই পরে নাম দাঁড়িয়েছিল DNA। গবেষণা চলেছে E. Coli ব্যাকটিরিয়া নিয়ে। নিরীহ ব্যাকটিরিয়া খুনে ব্যাকটিরিয়া হয়ে যেতে পারে। পরে দেখা গেল ভাইরাসেরও আছে এই ক্ষমতা। DNA ঠিক যেন তথ্যবোঝাই একটা কমপিউটার। এই DNA-র একটু ক্ষতি হলেই সংকেত যাবে পাল্টে—একটা কোষ আর একটা কোষের মত হবে না—মানব তখন দানব হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : ভয়ানক কাণ্ড! ডি-এন-এ'কে আগলে রাখার মত অণু-জীব নেই?

মা : তাও আছে। অনেক রকম রেডিয়েশন সহ্য করে আছি কি করে আমরা? Micrococcus radiodurans ব্যাকটিরিয়ার জন্যে। বিকিরণের মারাত্মক ডোজ সইতে ওস্তাদ। মানুষের কোষেও এরা কাজ করছে—একটু কম তেজে যদিও। ডি-এন-এ রেডিয়েশন সইতে পারে না। যদি ড্যামেজড্ হয় রেডিয়েশন বা ক্ষতিকর কেমিক্যালের জন্যে—তাহলেই শুরু হয়ে যায় চার পর্যায়ের মেরামতি তৎপরতা। প্রথমেই কোষ দেখে নেয় ক্ষতিটা হয়েছে নিজের DNA-র ঠিক কোনখানে। তারপরেই দুটো এনজাইম এগিয়ে এসে কেটে বাদ দিয়ে দেয় জঘন্য জায়গাটা। অ্যাকসিডেন্টের পর ছুরি চালানো ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই। কাটা জায়গার ফাঁক ভরাট করতে এগিয়ে আসে আর একটা এনজাইম—নিখোঁজ অংশটার হুবহু কপি বানিয়ে দেয়। সবশেষে এগিয়ে আসে চার নম্বর এনজাইম—কপি করা অংশটাকে ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে বেমালুম জুড়ে দেয়। ডি-এন-এ হয়ে যায় অবিকল আগের মত। অটুট থাকে বংশগতি। বিশেষ এই ব্যাকটিরিয়ার DNA মিস্ত্রীগিরির কায়দাটা এখনও জানা যায়নি। এরকম অণুজীব আরও আছে—তবে এত তুখোড় নয়।

প্রশ্ন : তাহলে কি বলছো অদৃশ্য বন্ধুরা নিরন্তর লড়াই চালিয়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণধারাকে অব্যাহত রেখেছে?

মা : এতক্ষণে বুঝলি!

ব্যাকটিরিয়া

প্রশ্ন : পৃথিবীতে কত ব্যাকটিরিয়া আছে, মা?

মা : ১-এর ডানদিকে ২৭টা শূন্য বসালে যত হয়, প্রায় ততগুলো। বিপুল এই ব্যাকটিরিয়া বাহিনীর একটা নগণ্য সংখ্যা কিন্তু রোগ ঘটায় মানুষের শরীরে।

প্রশ্ন : এত ব্যাকটিরিয়া তাহলে আছে কোথায়?

মা : পৃথিবীর সব জায়গায়। বাগানের এক মুঠো মাটিতেই আছে একশ কোটি। মহাসমুদ্রের মেঝে থেকে নমুনা তুলে দেখা গেছে, সেখানেও রয়েছে এক মুঠোয় একশ কোটি। কুমেরু জায়গাটা মানুষের বন্ধু নয় কোনওকালেই—কিন্তু সেখানেও থিকথিক করছে ব্যাকটিরিয়া। এরা রয়েছে মাটিতে, শুষ্ক উপত্যকার পাথরের খাঁজে, এমনকি বিশাল হিমবাহর তলদেশ পর্যন্ত।

প্রশ্ন : বেঁচে থাকে কী করে?

মা : ওদের এই আশ্চর্য ক্ষমতাটাই তো মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের। পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে যে-সব ধর্ম থাকা দরকার—ব্যাকটিরিয়া সে-সবের ধার ধারে না। অথচ দাপিয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য অবস্থায়। অপার্থিব এই ক্ষমতা দেখে হতভম্ব হয়েছেন বৈজ্ঞানিকরা। প্রচণ্ড ডোজের এক্স-রে, আলট্রাভায়োলেট রে আর ভয়ানক ঠাণ্ডা এদের কিস্‌সু করতে পারে না। এরা অক্সিজেনের মধ্যে যেমন টিকে থাকে, বিনা অক্সিজেনেও তেমনি বহাল তবিয়তে থাকে। এরা হাইড্রোজেন আর কার্বন ডায় অক্সাইড দিয়ে মিথেন আর জল বানায়, সালফেটকে ভেঙে বানায় সালফার। ফ্রি হাইড্রোজেন-ভক্ত ব্যাকটিরিয়ার জন্ম বা ক্রমবিকাশ নিশ্চয় এই পৃথিবীতে হয়নি। তাই সন্দেহ, এরা সমানে আসছে পৃথিবীর বাইরে থেকে।

প্রশ্ন : নতুন ব্যাকটিরিয়া বানাতে পারেন বৈজ্ঞানিকরা?

মা : কিন্তু মানুষের হাতে গড়া নতুন এই ব্যাকটিরিয়ারা তেমন কাজের হয় না—যেমনটা হয় গ্যালাক্সির ল্যাবোরেটরিতে গড়ে উঠলে। যেমন টেকসই, তেমনি নিজ ধর্মে স্থির। ধর্ম হারায় না কোনওক্রমেই—যা ছিল তাই থাকবে, মরেও যাবে, ভেঙেও যেতে আপত্তি নেই, নয়তো দেদার বংশ বাড়িয়ে চলবে—কিন্তু নিজেই নিজেকে একটু একটু করে, অনেক সময় নিয়ে কিছুতেই পাল্টে নেবে না।

প্রশ্ন : এ তো বড় অদ্ভুত শক্তি, মা?

মা : হ্যাঁ, বড় বিচিত্র শক্তি। এ-শক্তি নিশ্চয় পৃথিবীতে পায়নি। পেয়েছে পৃথিবীর বাইরে—বহু গ্যালাক্সির মধ্যে—ক্রমবিবর্তন যেখানে রহস্যময়।

প্রশ্ন : এমন বলছ, যেন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর ধর্মে ধর্মান্তরিত নয় ব্যাকটিরিয়ারা?

মা : ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে রয়েছে গোটা গ্যালাক্সি জুড়ে থাকার গুণপনা—যা শুধু পৃথিবীতে অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার চাইতে অনেক...অনেক ব্যাপক। সারা গ্যালাক্সি জুড়ে যারা টিকে থাকতে পারে, তারা শুধু পৃথিবীর মত ছোট্ট জায়গার জন্যে সৃষ্টি হতে যাবে কেন?

প্রশ্ন : তাহলে তারা অন্য গ্রহেও থাকছে না কেন? গ্যালাক্সি থেকেই যদি এরা আসে তো অন্যান্য গ্রহে যাচ্ছে না কেন?

মা : সে সন্দেহও দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের মনে। শুক্রগ্রহের ওপর দিকের মেঘের রামধনু দেখে মনে হয়েছে, সেখানে গোলাকার বস্তুকণা আছে—ব্যাকটিরিয়া সাইজের মত ছোট্ট। শুক্রগ্রহ থেকে যে ফিকে হলুদ রঙ ঠিকরে বেরোয়, সেটা হয় সালফার ব্যাকটিরিয়ার জন্যে—ওদেরও রঙ হলুদ। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙের মূলেও আছে ব্যাকটিরিয়াদের কারসাজি—এখন হয়ত সেই ব্যাকটিরিয়ারা ঘুমিয়ে আছে মঙ্গলের ধুলোয়—পৃথিবীর এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে তাদের জাগানো যাবে না—দরকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুন-এর আবহমণ্ডলে মিথেন আছে—নিশ্চয় মিথেন তৈরির ব্যাকটিরিয়াও আছে।

প্রশ্ন : এত ব্যাকটিরিয়া কি ফ্লাইং সসারে চেপে যাচ্ছে গ্রহগুলোয়?

মা : ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে না! পৃথিবীতে পড়ছে বছরে দশ হাজার টন; বৃহস্পতিতে তার একশ গুণ। এ ছাড়াও ধূমকেতুরা ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে মাঝেমাঝে—ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে ব্যাকটিরিয়ার ঝাঁক।

প্রশ্ন : ব্যাকটিরিয়া ছাড়াও তো মিথেন তৈরি হতে পারে?

মা : ফ্রি হাইড্রোজেন আর কার্বনডায় অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইড একটা পাত্রে অনন্তকাল রেখে দিলেও তা থেকে মিথেন তৈরি হবে না। দরকার ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের। এই ধরনের ঘটকালিতে জুড়ি নেই ব্যাকটিরিয়ার।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, আজকের মতো এত রোগ কি আগেও ছিল?

মা : পথিবীর বাইরে থেকে এলেও ব্যাকটিরিয়াদের জুতসই রিজার্ভারে থাকতে হয়েছে। সেই রিজার্ভার কমজোরি হলে ব্যাকটিরিয়াদেরও স্বল্পায়ু হতে হয়েছে—টেকসই বলে টিকে গেছে ব্যাকটিরিয়ারা। বৈজ্ঞানিকরা তর্ক জুড়েছেন এই প্রসঙ্গে। আজকের মানুষ যে-সব ছোঁয়াচে রোগের ব্যাকটিরিয়া-প্রকোপে ভুগছে, দশহাজার বছর আগে পৃথিবীতে তাদের উপযুক্ত রিজার্ভার ছিল না। ভাইরাসের উপমা দিলে বুঝবি। ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস পাখির শরীরের রিজার্ভারে অনেক দিন টিকে থাকে—মানুষের শরীরের রিজার্ভারে কয়েক হপ্তার বেশি থাকতে পারে না। এ-যুগের ওষুধের উন্নতি হওয়ার আগে, বহু বছর বা বহু শতাব্দী ধরে মানুষের শরীর ছিল স্মলপক্স ভাইরাসের নিরাপদ আধার।

প্রশ্ন : তাহলে বলছো, আন্তঃনক্ষত্র ধুলোর উপাদানগুলোয় ব্যাকটিরিয়া আছে?

মা : তারার আলো ঠেকিয়ে রেখেছে এই ধুলো। আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই প্রায় বিশ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে। তার প্রত্যেকটা থেকে যদি দশটা পৃথিবীর ওজনের সমান ব্যাকটিরিয়া বেরোয়, তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে

সূর্যের ওজনের ষাট লক্ষ গুণ। এই গ্যালাক্সির সমস্ত আন্তঃনক্ষত্র ধুলোর সমান। এর মধ্যে কত ব্যাকটিরিয়া আছে, তা ভাবতে গেলেও তো মাথা ঘুরে যায়।

প্রশ্ন : ধুলোর মধ্যে যে ব্যাকটিরিয়া আছে, সে সন্দেহ আসছে কি করে?

মা : উদ্ভিদ আর বেশির ভাগ জন্তুর কোষের দেওয়ালের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটার নাম সেলুলোজ। ব্যাকটিরিয়ার কোষের দেওয়ালে থাকে সেলুলোজের বদলে গ্লাইকন। গ্লাইকনের তাপ ঠিকরে দেওয়ার আর শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ঠিক সেলুলোজের মতই। আন্তঃনক্ষত্র দানা-র মধ্যেও অদ্ভুত এই ধর্ম বা প্রপার্টি দেখা গেছে। ব্যাপারটা ভাবলেও কি গা শিরশির করে না?

প্রশ্ন : এই দানা-ই যে ব্যাকটিরিয়া, তার প্রমাণ?

মা : আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কসমিক মাপকাঠিতে খবর রাখেন, কোথায় কি উপাদান কতখানি আছে—নক্ষত্রে, আন্তঃনক্ষত্র গ্যাস বা ধুলোয়। আন্তঃনক্ষত্র বস্তু কতখানি, তাও আজকের যুগে অজানা নয়। হিসেব করে নেওয়া যায় কার্বন, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরি দানা কতটা আছে। এই তিনটে মৌলিক উপাদান যখন মিলেমিশে ব্যাকটিরিয়া বানায়, তখন যত দানা তৈরি হয়, তাতে তারার আলো যতখানি আটকাতে পারে—এখন তারার আলো বাধা পাচ্ছে ততখানি।

প্রশ্ন : মহাশূন্যে ব্যাকটিরিয়ার আর প্রমাণ নেই, মা?

মা : আন্তঃনক্ষত্র ধুলোর দানাগুলো রড-এর মত হয়—যেমন হয় ব্যাকটিরিয়াদের। আরও আছে, লাল আর নীল আলোকে দানাগুলো আটকে দিলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, দানাগুলো যদি মূলত ব্যাকটিরিয়া হয়—তাহলে ঠিক তাই ঘটতে পারে।

প্রশ্ন : মহাশূন্যের ধকলে বহাল তবিয়তেও থাকতে পারে ব্যাকটিরিয়া?

মা : নানারকম বিকিরণের ফলে বেচারারা ভেঙে যায়। টিকে থাকার জন্যে দেওয়াল-বিহীন আকৃতি গড়ে নেয়—যাকে বলা হয় মাইকোপ্লাজমা কোষ। এদের সাইজ সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার দশভাগের একভাগ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হয়। তখন এদের গা থেকে যে আলো যেভাবে ঠিকরে যাওয়া উচিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেবে তা মিলে গেছে। পৃথিবীর পাতালে পার্থিব জীবাবশেষ থেকে কয়লা আর গ্রাফাইট তৈরি হয় অনেক বছর ধরে—এও প্রায় সেইরকম।

প্রশ্ন : মহাশূন্যে ব্যাকটিরিয়া আছে, এটা কি তাহলে প্রমাণিত সত্য?

মা : এখনও অনুমিতি। তবে একটা ঘটনা থেকেই জন্ম এই অনুমিতির। গোটা গ্যালাক্সি জুড়ে আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য রয়েছে আন্তঃনক্ষত্র দানাগুলোর ঠিকরে দেওয়া আর শুষে নেওয়ার ক্ষমতায়। বিস্ময়কর এই সাদৃশ্য সম্প্রতি দেখা গেছে ম্যাগেলানিক ক্লাউড-এ—যা রয়েছে আমাদের এই গ্যালাক্সির বাইরে। বস্তুকণাগুলো সজীব নয়—এই ধারণা নিয়ে আশ্চর্য এই সাদৃশ্যের কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না—বরং বলা যায়, দানাগুলোর সাইজ, রাসায়নিক সংগঠন বিস্ময়করভাবে দিকে দিকে একইরকম। স্যার ফ্রেড হয়েল বলেছেন, এর চেয়ে বড় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আর হতেই পারে না।

প্রশ্ন : মহাশূন্যের ব্যাকটিরিয়া তাহলে কি শূন্য থেকে এল?

মা : বিপুল এনার্জি, যেমন ইলেকট্রিক বা আলট্রাভায়োলেট রশ্মি যদি কয়েকটা সাদাসিধে কেমিক্যালের সংমিশ্রণে ঠুসে দেওয়া যায়, অণুগুলো ভেঙে গিয়ে পরমাণু তৈরি হবে। তখন যদি প্রচুর হাইড্রোজেন, কার্বন,

নাইট্রোজেন, আর অক্সিজেন থাকে এই মিক্সচারে, ভেঙে যাওয়া পরমাণুগুলোর কিছু নতুন করে জুড়ে গিয়ে জৈব অণু বানিয়ে নেবে। যতই জটিল হবে এরা, ততই সংখ্যায় কমবে। সেলুলোজ, ক্লোরোফিল বা লম্বা চেন-এর প্রোটিনের ধারেকাছেও কিছু তৈরি হবে না—সামান্য অ্যামিনো অ্যাসিড আর সরল সুগার পাওয়া যেতে পারে। মৌলিক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে শেষের এই দুটিকে আলাদা করে নিয়ে যদি হাইগ্রেড এনার্জির খপ্পর থেকে বাঁচানো যায়—তাহলে সাদাসিধে জৈববস্তু তৈরি করা যেতে পারে—যা বানিয়ে দেবে জৈব সুরুয়া—'অরগ্যানিক সুপ'।

উড়ন চাকি

প্রশ্ন : 'উড়ন চাকি' সত্যিই কি আছে, মা?

মা : উড়ন চাকি বা ফ্লাইং সসার দেখেছে লক্ষ লক্ষ লোক—কিন্তু জিনিসটা যে আসলে কি, তা জানা যায়নি। অনেকে যা দেখেছে, তা গুছিয়ে লিখে জানিয়েছে। নানা মুনির নানা মত শোনা যাচ্ছে। উল্কা, গ্রহ, নক্ষত্র, বেলুন, জলার গ্যাস, আবহাওয়ার ছটফটানি—সবই নাকি হতে পারে। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাগুলোকে কিন্তু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না—আজও সেগুলো হেঁয়ালিই হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন : শুধু দেখেছে? ছবি-টবি তোলেনি?

মা : আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলেও বুজরুক নন, এমন বহুলোক সাদাকালো এমন কি রঙিন ফটো তুলেছেন, মুভি ক্যামেরায় ছবিও উঠেছে, জমি আর এরোপ্লেনের রাডারেও উড়ন চাকি অথবা উড়ুক্কু চুরুটের নিশানাও পাওয়া গেছে। ফ্লাইং সসারকে সামনে থেকে দেখলে চাকির মত মনে হয়, পাশ থেকে দেখায় ঠিক পেটমোটা চুরুটের মত। শূন্যে এই অদ্ভুত আকাশযানকে এক জায়গায় ভাসতে দেখা গেছে, কখনো সোজা নেমে এসেছে, আবার সোজা উঠে গেছে, আচমকা এমন স্পিড বাড়িয়েছে যা মডার্ন এরোপ্লেন পারে না।

প্রশ্ন : কারও ক্ষতি করেছে?

মা : যদ্দুর জানি, এখনও করেনি। তবে হ্যাঁ, সজ্জনদের সুনামের হানি ঘটিয়েছে—উড়ন চাকি দেখেছেন বলে ফেলায় এঁদেরকে হাসি-টিটকিরি হজম করতে হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম-টিয়মগুলোকে ভেঙে দিয়েছে উড়ন চাকি, ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব ধারণার ইতি ঘটিয়েছে। এগুলোকে ক্ষতি বলা যায় বইকি।

প্রশ্ন : ফ্লাইং সসার কি আগেও দেখা গেছিল?

মা : মডার্ন মানুষ ধরায় আসার অনেক আগেই আকাশের অদ্ভুত জিনিস মানুষকে হতচকিত করেছিল। চিন দেশের হুনান্ অঞ্চলের একটা দ্বীপের গ্র্যানাইট পাথরে খোদাই করা আছে চোঙার মত আকাশযানের ছবি। আজ থেকে প্রায় ৪৭,০০০ বছর আগে যখন নিয়ানডারথাল মানব ছিল পৃথিবীতে, তখনও কি আকাশের আগন্তুকরা টহল দিয়েছে পৃথিবীর ওপরে?

প্রশ্ন : লেখা-টেখা কিছু পাওয়া যায়নি?

মা : ৩,৪০০ বছর আগেকার একটা মিশরীয় প্যাপিরাস পাতায় লেখা আছে, অসংখ্য গোলমত জিনিস আকাশে দেখেছিলেন ফারাও থুটমোস তৃতীয় নিজে, তাঁর সৈন্যসামন্ত আর চাকরবাকর।

প্রশ্ন : এমন বই-এ লেখা নেই, যা হাতের কাছে আছে?

মা : বাইবেল খুলে দেখে নে। যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করার ৫৯২ বছর আগে ধর্মগুরু ইজকিয়েল দিব্যদর্শনে দেখেছিলেন চাকাওয়ালা অদ্ভুত গাড়ি নেমে এসেছে আকাশ থেকে। ঝোড়ো বাতাস ঠেলে মেঘের মধ্যে থেকে আগুন বমি করতে করতে নেমে এসেছিল বিচিত্র সেই 'মেশিন'। ভেতর থেকে নেমেছিল মানুষের মত চারটে জীব—প্রত্যেকের চারটে মুণ্ডু, চারটে ডানা, গা ব্রোঞ্জের মত চকচকে। বিদ্যুৎগতিতে এরা ঠিকরে যাচ্ছিল সামনের দিকে।...কারা এরা? স্পেস হেলমেট পরা মহাকাশচারী কি? নাকি ভিনগ্রহের রোবট?...সবুজ আলো বেরোচ্ছিল আকাশ-গাড়ির সারি সারি চোখ থেকে; পোর্ট হোল নয়তো? ইজকিয়েলকে এই গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে যেন 'ভূমিকম্প-নিনাদ' শোনা গেছিল। ...মানুষকে ভিন্‌গ্রহীরা ধরে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে—এ রকম ঘটনা ইদানীং তো প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এও কি তাই? রোমান লেখক জলিয়াম অবসিকোয়েন্স লিখে গেছেন এমনি অনেক সৃষ্টিছাড়া উড়ন্ত চাকার কাহিনী।

প্রশ্ন : যিশুর জন্মের পরেও এসেছিল আকাশগাড়ি?

মা : যিশুর জন্মের ৩৯৩ বছর পরে জ্বলন্ত গোলককে নক্ষত্রবেগে আকাশে ছুটোছুটো করতে দেখা গেছে। ১৪৯৩ সালে লেখা একটা বই যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের ভার্দুন মিউজিয়ামে। জ্বলন্ত ছুটন্ত গোলকের কথা তাতে আছে—ডুবুডুবু সূর্যের দিকে অগ্নিময় বস্তুটা ধেয়ে গেছিল নীল আকাশের তলায় সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে।

প্রশ্ন : 'ফ্লাইং সসার' নামটা প্রথম কার মাথায় এল, জানো মা?

মা : এ-নাম আমেরিকার লোকে আবিষ্কার করার সাতশ বছর আগে এই নামের মতই একটা নাম ব্যবহার করেছিল জাপানীরা ১১৮০ সালের ২৭ অক্টোবর—একটা 'উড়ন্ত মাটির জালা' দেখে। ১২৩৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে একজন সেনাপতি আকাশ বিস্ময় স্বচক্ষে দেখে বৈজ্ঞানিক তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন। সৈন্যসামন্তরা এসে বললে—কিস্‌সু না জেনারেল—বাতাসের জন্যে তারা দুলছে। ...তারপরেও কিন্তু ফ্লাইং সসার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছে জাপানীদের। ১৩৬১ সালে বিশ ফুট ব্যাসের একটা ড্রামের মত জিনিস সমুদ্র ঠেলে উঠে এসেছিল পশ্চিম জাপানে।

প্রশ্ন : তখন বুঝি ফ্লাইং সসাররা ইউরোপে টহল দেয়নি?

মা : দিয়েছিল বইকি। ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত বেশ কিছু ঘটনা তোর এই প্রশ্নের জবাবে বলছি। ১৩ শতাব্দীতে ফ্লাইং সসার দেখা গেছে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে। ইংলণ্ডের মিঃ ক্রাকার দিনের আলোয় 'ফ্লাইং সসার' দেখেছিলেন ১৭৩৩ সালের ৮ ডিসেম্বর। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিজের চোখে অতি অদ্ভুত একটা গগন প্রহেলিকা দেখেছিলেন ১৭৪২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সুইজারল্যাণ্ডের এক শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মঁসিয়ে রোস্টন টেলিস্কোপে ফ্লাইং সসার দেখে ক্যামেরায় তার ছবি নিয়ে প্যারিসের রয়াল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুব সম্ভব ফ্লাইং সসারের ছবি তোলা হল সেই প্রথম—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে ছবি এখন নেই।

প্রশ্ন : তাহলে বলতেই হয় সব গুলগাপ্পা?

মা : কথার কি ছিরি! উনিশ শতাব্দী থেকে ফ্লাইং সসারের খবর-টবরগুলো নিয়ে ওদেশের বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা আর অসংখ্য বই তাহলে এত মাতামাতি করছে কেন? স্রেফ গালগল্পই যদি হয় তো এর পেছনে এত সময় আর পয়সা খরচা করছে কেন? কত আর বলব! ১৮০০ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে ফ্লাইং সসার নিয়ে রীতিমত হইচই চলেছে বিলেত আমেরিকায়। ১৮৭৪ সালের ৬ জুলাই মেক্সিকোর আকাশে ৪২৫ ফুট লম্বা একটা বিরাট ট্রামপেট দেখা গেছিল বেশ কয়েক মিনিট ধরে। ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ স্টীমারের নাবিকরা দেখেছিল একটা বিশাল আলোকময় ঘুরন্ত চাকা—জাহাজের চাইতেও বড়—ভাসছিল জলের ওপরে শূন্যে। ১৮৮৩ সালের ১২ অগাস্ট মেক্সিকোর মানমন্দির থেকে সূর্যের বুকের ওপর দিয়ে প্রথম দিন ২৮৩টা, দ্বিতীয় দিন ১১৬টা অদ্ভুত আকৃতিকে ভেসে যেতে দেখেছিলেন ডিরেক্টর মশায় নিজে। ফটোও তুলেছিলেন। অবিশ্বাসীরা বলেছিল—ধুস্! পোকা, পাখি অথবা ধুলো দেখেছেন। ডিরেক্টর কিন্তু দিব্যি গেলে বলেছিলেন—মোটেই না। ওরা পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিল—চাঁদ ছিল আরও দূরে।

প্রশ্ন : খবরের কাগজে কি বেরিয়েছিল?

মা : ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ফ্লাইং সসার দেখা দিতে শুরু করে ১৮০০ শতকে, তখন সানফ্রান্সিসকো নিউজপেপারে ১৮৯৬ সালের ২২ নভেম্বর ছবি দিয়ে ছাপা হয়েছিল যে-খবর—সে-রকম গুরুত্ব এ-দেশের কোন কাগজ বোধহয় ভাবতেও পারে না। ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৭-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার প্রায় সব কাগজেই ধুন্ধুমার কাণ্ড জুড়েছিল ফ্লাইং সসার নিয়ে। ওরা বলত Unidentified Flying Object, সংক্ষেপে— UFO—অজানা উড়ুক্কু বস্তু। ১৮৯৭-এর ২ এপ্রিল 'শিকাগো রেকর্ড পত্রিকায় খবর বেরোলো, ক্যানসাস সিটির দশ হাজার মানুষ একটা বিশাল কালো আকাশ জাহাজকে দেখেছে শহরের মাথায়। উল্কাগতিতে ধেয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে এক নাগাড়ে মিনিট দশেক ভেসে থেকেছে আগন্তুক উড়ন্ত বিস্ময় আর সবুজ-নীল-সাদা আলোর ঝলক ছেড়ে গেছে। জিনিসটা দেখতে ২৫-৩০ ফুট লম্বা একটা রেড ইণ্ডিয়ান ক্যানো নৌকার মত—এমন কথাও শোনা গেছে। ল্যাজ, ডানা আর প্রপেলারের হরেক বর্ণনা শোনা গেলেও জিনিসটা যে চুরুটের মত—এটা কিন্তু বলেছে সবাই। রোনাল্ড স্টোরি-র লেখা UFO এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে দেখে নিস ৮-এর পৃষ্ঠায়।

প্রশ্ন : উফো নিয়ে বিশ্বকোষ? সবই তো চোখের ধাঁধা, মা!

মা : অবিশ্বাস দিয়ে যাচাই করে নেওয়া ভাল। তোর মত অবিশ্বাসী তখনও ছিল। ১৯০৯ সালে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটানা দেড়মাস নিউজিল্যাণ্ডের নর্থ আয়র্ল্যাণ্ড আর সাউথ আয়র্ল্যাণ্ডের মাথায় উড়ন্ত প্রহেলিকাদের দেখেছে কয়েক-শ মানুষ দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে। চুরুট চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল তারা। বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উড়োজাহাজ নিয়ে গবেষণা চলছিল। ফ্রান্সে বেলুন নিয়ে টেস্ট করা হচ্ছিল—জার্মানীতে জেপেলিন তখনও প্রাথমিক অবস্থায়। অতদূর থেকে বেলুন বা জেপেলিন নিউজিল্যাণ্ডে আসবে কি করে?

প্রশ্ন : নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত এসেই বুঝি উফো-দের দম ফুরিয়ে গেছিল?

মা : ফচকেমি হচ্ছে! দেবিকারানীর স্বামী নিকোলাস রোয়েরিখের নাম নিশ্চয় শুনেছিস। শিল্পী এবং অভিযাত্রী। রাশিয়ান। মাথায় বিশাল টাক, গালে লম্বা দাড়ি। ওঁর লেখা 'আলতাই-হিমালয়: এ ট্র্যাভেল ডাইরী' বইটার ৩৬১ পৃষ্ঠায় দেখবি উনি লিখেছেন—'৫ অগাস্ট, ১৯২৬। উত্তর চীন। অস্বাভাবিক বিশাল কালো ঈগল

পাখিটার অনেক ওপরে রোদ্দুরে চকচকে একটা বিরাট ডিমের মত জিনিস দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল ঘন নীল আকাশের বুকে। দূরবীন এঁটে স্পষ্ট দেখেছি তার ডিমের মত চেহারা!'

প্রশ্ন : রকেট-ভূত নয় তো ফ্লাইং সসারগুলো?

মা : ভাল বলেছিস। রকেট-ভূত নামই দেওয়া হয়েছিল এদের ইউরোপে ১৯৪৬ সালে। ২৬ ফেব্রুয়ারি হেলসিঙ্কি রেডিওর ঘোষণা শুনে চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল শ্রোতাদের। সগর্জনে আগুনের গোলা ছুটছে, দাঁড়াচ্ছে, মোড় নিচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অনেকরকম বর্ণনাও শোনা গেল: ফুটবলের মত, সাবানের ফেনার বুদবুদের মত, চুরুটের মত, ইত্যাদি। জুলাই মাসে এরা সুইডেনে হানা দিতেই খবরের কাগজগুলো বলে উঠল—এসে গেছে রকেট-ভূত! আরও দক্ষিণে সরতে সরতে ভূতগুলো তাঞ্জিয়ার, ইটালি, গ্রীসের মাথা টপকে সেপ্টেম্বরে দেখা দিল ইণ্ডিয়ায়। সুইডেন সরকার রেগেমেগে বললে, এ নিশ্চয় সোভিয়েতের নষ্টামি। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রিকা জানাল, রকেট-ভূতরা আবার হানা দিচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার আকাশে। আজও এই রহস্যের কিনারা হয়নি।

প্রশ্ন : দেশের সরকারগুলো তখন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল?

মা : ১৯৪৭-এর ২৪ জুন আমেরিকার কেনেথ আর্নল্ড এরোপ্লেন থেকে নটা চকচকে উড়ন চাকি দেখে সেই প্রথম 'ফ্লাইং সসার' বলে তাদের নামকরণ করেন। আমেরিকান বিমান বাহিনীর টনক নড়ে তারপর। তদন্ত করার জন্যে গঠিত হল প্রজেক্ট সাইন, প্রজেক্ট গ্রাজ আর প্রজেক্ট ব্লু বুক। ১৮ বছরের প্রচেষ্টায় ১২,৬০০ কেস নথিভুক্ত করে দেখা গেল ৭০১টা ঘটনার কারণ সত্যিই 'অজ্ঞাত'।

প্রশ্ন : ব্যস? আর তদন্ত হল না?

মা : হয়েছে। ১৯৬৬-তে আমেরিকান এয়ারফোর্স ডক্টর কনডনের অধীনে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিককে দিয়ে তদন্ত করিয়েছিল। কনডন শেষে বললেন, মোট ২১ বছর ধরে UFO পর্যবেক্ষণ করেও বিজ্ঞান কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারল না। তারপরেও প্রাইভেট তদন্তকারীরা অনেক সমিতি গঠন করেছেন। ৭০,০০০ ঘটনার কমপিউটার লিস্ট বানিয়েছেন। এক পঞ্চমাংশ কেস এখনও অব্যাখ্যাত। এ যুগের সবচেয়ে বড় প্রহেলিকার মীমাংসা আর কিছুতেই হচ্ছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ফ্লাইং সসার দেখেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন—এরা আছে! অনেক তদন্ত হয়েছে। সে কাহিনী আর একদিন বলব।

আকাশের আশ্চর্য আলো

প্রশ্ন : মহাবিশ্ব থেকে এখনও কি পৃথিবীতে ভিনগ্রহীরা আসছে, মা?

মা : ভিনগ্রহী? ইংরাজিতে যাকে বলে Alien? গবেষণা চলছে পৃথিবী জুড়ে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এই বিষয় নিয়ে। একদল বৈজ্ঞানিক কিন্তু উড়ন চাকির কল্পগল্পকে একদম পাত্তা দেননি। বলেছেন, পৃথিবীর আলো-কেই UFO মনে হয়।

প্রশ্ন : পৃথিবীর আলো-ই UFO? কী রকম আলো?

মা : যে-সব আলো থেকে বেরোয় না কোনো আওয়াজ। আকাশের আশ্চর্য আলো। নিঃশব্দে আর ভীষণ স্পিডে এই আলোরা আকাশপথে ছুটে যায় বলেই মাটির মানুষরা ধরে নিয়েছিল অন্য গ্রহের আকাশযান তারা, অর্থাৎ উড়ন চাকি বা UFO বছরের পর বছর দেখা দিয়ে আসছে বিশেষ বিশেষ এলাকায়। আশ্চর্য আলোর দিকে যাঁরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন, এঁদের মধ্যে ছিলেন আর্লিং স্ট্র্যাণ্ড নামে এক ভদ্রলোক। ইনি একদিন আলোর দিকে ছুঁড়ে দিলেন লেসার রশ্মি। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ বেগে ফ্ল্যাশ দেখা দিয়েছিল উড়ন চাকিতে। অদ্ভুত আলো যেন লেসার রশ্মির মার খেয়েই উত্তেজিত হয়েছে। স্ট্র্যাণ্ড লেসার বন্ধ করে দিয়েছিলেন মিনিট কয়েক পরেই; সঙ্গে সঙ্গে আগের ছন্দে ফিরে এসেছিল উড়ুক্কু রহস্যের আলোর চমক।

প্রশ্ন : আর্লিং স্ট্র্যাণ্ড লেসার রশ্মি নিয়ে আশ্চর্য আলোর সঙ্গে লড়তে গেলেন কেন, মা?

মা : উনি যে প্রোজেক্ট হেসডালেন-এর লিডার। এটা একটা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। সেন্ট্রাল নরওয়েতে হেসডালেন নামে একটা পাণ্ডববর্জিত উপত্যকা আছে। ১৯৮১ সাল থেকে সেখানকার আকাশে নিয়মিতভাবে দেখা দিয়ে চলেছে আলোর ছটা। প্রোজেক্ট হেসডালেন-এর উদ্দেশ্য আকাশ-রহস্যের ভেদ করা।

প্রশ্ন : হেসডালেন উপত্যকার আকাশে আলোর দল কি ছুটোছুটি করে উড়ন চাকিদের মত?

মা : হ্যাঁরে। নানা রঙের গোলকের আকার নিয়ে তারা হঠাৎ হাজির হয়ে যায় আকাশে—কোত্থেকে আসছে তা জানা যায় না। আচমকা আবির্ভূত হয়েই নিঃশব্দে টহল দিতে থাকে উপত্যকার মাথায়। কখনও-সখনও টহল মারবার আগে শূন্যপথে ঠায় ঝুলে থাকে আর দুলে দুলে ওঠে। তারপর আকাশ বেড়ানো শেষ হলেই আচমকা অদৃশ্য হয়ে যায় ঠিক যে ভাবে এসেছিল—সেইভাবে। এদের আবির্ভাব আর প্রস্থান দুটোই রীতিমত

রহস্যজনক। এরকম প্রহেলিকাপুঞ্জ একটা-দুটো নয়—শয়ে শয়ে দেখা দিয়ে চলেছে হেসডালেন উপত্যকার আকাশে।

প্রশ্ন : খুবই রহস্যজনক আলো তো! বৈজ্ঞানিকরা কী ভাবছেন?

মা : তাঁদের বিশ্বাস, এ আলো নিছক দৃষ্টিবিভ্রম নয়—উড়ন চাকি অর্থাৎ UFO-রাই ঘন ঘন টহল দিচ্ছে উপত্যকার আকাশে। এদের খুঁটিয়ে দেখবার জন্য উত্তরের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেও সেখানে নিয়ে গেছেন গাইগার কাউন্টার, সাইসমোগ্রাফ ইনফ্রারেড ভিউয়ার, লেসার থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। মডার্ন UFO রহস্যভেদীরা মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই ১৯০ বার দেখেছেন টহলদার আকাশ-আলো—একশটারও বেশি ফটো তুলেছেন সেই সব আলোর। তাতেই তাঁদের বিশ্বাস হয়েছে স্রেফ আলো এরা নয়, রীতিমত উড়ন চাকি।

প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিকরা যখন উড়ুক্কু আলোকে উড়ন চাকি বলছেন, তাহলে নিশ্চয় তার কারণ আছে?

মা : হেসডালেন আলোকের ধরন-ধারণ আচার-ব্যবহার দেখে মনে হয় না উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট বা নক্ষত্রদের আলো—মাটির ওপরকার গাড়ি থেকে অথবা দূরের খামারবাড়ি থেকে বিচ্ছুরিত আলোও নয়। কয়েকটা ক্ষেত্রে আলোদের শুধু চোখে দেখার পর রাডার দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তারা চোখের ভুল নয়। এ আলো যারা সৃষ্টি করছে, অবশ্যই তারা উড়ে যাচ্ছে আকাশে—সরকারি মহল তাদের কোনও খবর রাখে না—তাদের শনাক্ত করতেও পারছে না। সুতরাং তারা অবশ্যই এ যুগের বৃহত্তম বিস্ময় —UFO!

প্রশ্ন : স্ট্যাণ্ড সাহেব লেসার রশ্মি মেরে তাদের ভড়কে দিয়ে অঘটন ঘটাননি তো?

মা : নাটকীয় সংঘাত ঘটিয়েছেন ন'বার—সাড়া পেয়েছেন আটবার। ফলে উত্তপ্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক। তাঁরা এখন ভাবছেন, লেসারের মার খেয়ে সাড়া দেয় যখন, তখন কি ইনটেলিজেন্ট বলা যায় আশ্চর্য আলোদের? নাকি, কোনও ধীশক্তি, ভিনগ্রহী বা অন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে এদের? প্রাকৃতিক কারণে আলোরা নেচে নেচে যাচ্ছে না তো? এখনো তাদের জুৎসই ব্যাখ্যা মেলেনি বলেই এত রহস্যজনক মনে হচ্ছে?

প্রশ্ন : ইনটেলিজেন্ট আলো? বৈজ্ঞানিকদের কলা দেখাতে পারছে না?

মা : তাও ঘটেছে বইকি। প্রোজেক্ট হেলেন-এর মূল সদস্য—লীফ হাভিক পাঁচবার লক্ষ্য করেছেন, আকাশের আলোরা যেন তাঁদের নজরে রেখেছে। যেই তাদের উপস্থিতি রেকর্ড করতে গেছেন, অমনি ফুস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এসেছে—আশ্চর্য আলোদের বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা আছে।

প্রশ্ন : একটু আগে বললে কেন পৃথিবীর আলোও UFO হতে পারে?

মা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের হাজার হাজার ফ্লাইং সসারদের রিপোর্ট ঘাঁটাঘাটি করতে গিয়ে ব্রিটিশ গবেষক পল ডেভারক্স একটা নিশ্চিত ছক দেখতে পেয়েছিলেন তাদের আবির্ভাব আর তিরোধানের মধ্যে। UFO-দের বেশির ভাগই দেখা যায় সেই সব যেখানে ভূত্বকের দোষ রয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায়—নানা রকম পাথুরে স্তরের মধ্যেকার ফাটাফুটো—ফলে মাটি কেঁপে ওঠে থর থর করে আর পাল্টে যায় পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ডেভারক্স লক্ষ্য করলেন, বৃটেনে ঠিক এই সব জায়গাতেই রয়েছে সুপ্রাচীন মাটির তৈরি কারুকাজ আর পাথরের স্মৃতিসৌধ।

প্রশ্ন : ব্রিটেনের স্টোনহেঞ্জ নাকি এলিয়েনরা বানিয়েছে?

মা : ডোভারক্স নিজেও জানতেন এরকম বিশ্বাস অনেকের মাথাতেই শেকড় গেড়ে বসে আছে। পাথরের মনুমেন্ট বা স্মৃতিসৌধগুলো পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা নামে পৃথিবীবাসীদের চক্ষু চড়কগাছ করে ছাড়ছে।

প্রশ্ন : ডেভারক্সের নিজের বিশ্বাস কী, মা?

মা : ওঁর ব্যাখ্যা একেবারে দলছাড়া। মনুমেন্টগুলো তৈরি হয়েছিল কেন, এ-সম্বন্ধেও হাজির করেছেন খানকয়েক নতুন থিওরি। ১৯৭৫ সালে UFO পর্যবেক্ষণ শেষ করার সময়েও উনি কিন্তু মনের মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। ভূত্বকের দোষ যেখানে, উড়ন চাকিদেরও আবির্ভাব ঘটছে সেখানে—মাথার চুল খাড়া করে দেওয়ার মত এই যোগাযোগটা আবিষ্কার করার পরেও উনি ছিলেন রহস্যের আঁধারে। তখনও বিশ্বাস ছিল, সুপ্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলোর পেছনে নিশ্চয় হাত আছে অপার্থিব শক্তিদের; অপার্থিব এই অর্থে যে তারা এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে—মহাবিশ্বের অজানা অঞ্চল থেকে। ইতিমধ্যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরাও আলাদা ভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন—প্রতিটি গবেষণার বিষয়ই আলাদা—একটার সঙ্গে আর একটার মনে হয় কোনও সম্পর্ক নেই। ভূকম্পন আর বৈদ্যুতিক শক্তিরা হাতে হাত মিলিয়ে যে উড়ন চাকি ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে—এই ব্যাখ্যাটা হাজির করলেন দুজন মনোবিজ্ঞানী—মাইকেল পার্সিঞ্জার আর গিসলেনলাফ্রেনিয়ার। দুজনেই কানাডার লরেন্সিয়ান ইউনিভার্সিটিতি ছিলেন। ভূত্বক আর ভূমিকম্প সম্পর্কিত বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর ব্রায়ান ব্রাডি—ইনি ছিলেন ডেনভারে মার্কিন ব্যুরো অফ মাইনস-এ। পাথরের ভেঙে যাওয়া আর ফুটিফাটা হয়ে যাওয়া নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রাডি দেখলেন, পাথর যখন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়, তখন আলোর সুতীব্র বিকিরণ ঘটে। ল্যাবোরেটরির মধ্যে এই আলো ছুঁচের ডগার মত ছোট্ট হতে পারে, দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে—কিন্তু ল্যাবোরেটরির বাইরে প্রকৃতির জগতে যখন পাথরে ফ্র্যাকচার ঘটে চলেছে, তখন এই সুতীব্র আলোর বিকিরণকেই বস্তুর মতন মনে হবে—মনে হবে আলোকময় একটা জিনিস কল্পনাতীত বেগে ছিটকে যাচ্ছে। এই ভাবেই ফাটল বরাবর আলোর বিকিরণ সৃষ্টি করে চলেছে পৃথিবী। পার্সিঞ্জার আর লাফ্রেনিয়ার এরপর ব্রাডির সঙ্গে দেখা করলেন। উড়ন চাকির ক্ষুদে সংস্করণ যে তৈরি করতে পেরেছেন—এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ আর রইল না তিন বিজ্ঞান সাধকের মনের মধ্যে। এইসব তথ্যগুলোই জোড়াতালি দিয়ে ডেভারক্স সিদ্ধান্তে এলেন: উড়ন চাকিদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাহলে এটাই—মূলে রয়েছে পৃথিবী!

প্রশ্ন : পৃথিবীই সৃষ্টি করছে অপার্থিব উড়ন চাকি আর আকাশ আলো?

মা : বৈজ্ঞানিক তদন্ত তো তাই বলছে। ডেভারক্স আরও বলেছেন, উড়ন চাকিরা যেখানে ঝাঁকি দর্শন দিয়ে যায়, সেখানেই হামেশাই দেখা যায় জমিতে পোড়া দাগ পড়েছে, গুন গুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মোটর গাড়ির বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিগড়েছে। এ সব হেঁয়ালির জবাব তো একটাই: মূলে রয়েছে UFO-র ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ধর্ম।

প্রশ্ন : বেশ, বেশ, ভূতাত্ত্বিক দোষের ফলে জন্মাচ্ছে 'পার্থিব আলো'। সুপ্রাচীন স্মৃতিসৌধদের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক?

মা : জবাবটা ডেভারক্স দিয়েছেন এইভাবে: নব প্রস্তর যুগের মানুষরা পার্থিব আলো দেখেছিল। ধরে নিয়েছিল সবই দেবতাদের লীলা। তাই যেখানে যেখানে আলো দেখা দিয়েছে সবচেয়ে বেশি, দেবালয় গড়েছে সেইসব

জায়গায়। আলোগুলোর নানান চেহারা দেখেও প্রত্যক্ষদর্শীদের মনেপ্রাণে বিশ্বাস হয়ে গেছে—জ্যোতির্ময় দেবতা দর্শনই করেছে অনেক পুণ্য ছিল বলে!

প্রশ্ন : আলোর চেহারাগুলোকে কি পাল্টে নিজেদের মনের মত করে নিতে পারত সেকালের পুরুতঠাকুরেরা?

মা : ডেভারক্সের বিশ্বাসও তাই। প্রাগৈতিহাসিক পুরোহিতরা বোধহয় সেই কায়দা রপ্ত করেছিল—পৃথিবীর আলোর চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে গড়ে নিত পুতুল দেবতাদের প্রতিমূর্তি। কীভাবে যে তা করত, তা ডেভারক্সের কল্পনার বাইরে। ডেভারক্সের অদ্ভুত এই ধারণা যদি সত্যিই হয়, তাহলে সেকালের ইউরোপে দেবতাদের টহল দেওয়া আর মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করার একটা বৈজ্ঞানিক মানে খুঁজে পাওয়া যায়। উড়ন চাকিরাও যে পৃথিবীর বাইরে থেকে আসেনি—তাদের সৃষ্টি পৃথিবীরই আলো থেকে—বিচিত্র স্মৃতিসৌধগুলো যে মানুষেরই হাতে তৈরি—দেবলোকের ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে নয়—সে রহস্যও পরিষ্কার হয়ে যায়। দেবতা, UFO আর সুপ্রাচীন স্মৃতিসৌধদের মধ্যে যাঁরা সম্পর্ক খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ডেভারক্সের থিওরিগুলো তাঁদের মাথার পোকা নড়িয়ে ছেড়েছে এই কারণেই।

ধস

প্রশ্ন : ওমা, পাতাল রেল খোঁড়াখুঁড়ি করে ফেলে রাখার জন্যে নাকি ধস নামতে পারে?

মা : ইঞ্জিনিয়াররা ঠিকই বলেছেন। একটা ঘটনা বলছি। ১৯৬৫ সালে কেনটাকির লেক্সিংটনে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। ভিতের জায়গায় সিমেন্ট ঢেলে দিচ্ছে একটা লরি। আচমকা শোনা গেল একটা চাপা গুড় গুড় শব্দ। লরির তলার মাটি যেন মুখ হাঁ করে গিলে ফেলল গোটা লরিটাকে। দেখা গেল, ১২ ফুট গভীর গর্তের তলায় উল্টে পড়েছে লরি।

প্রশ্ন : আচমকা মুখ হাঁ করল কেন মাটি?

মা : লেক্সিংটন চুনা পাথরের জমিতে রয়েছে প্রচুর গুহা। একটি মাত্র ছোট্ট গুহার ছাদ ধসে পড়ায় তলিয়ে গেছে গোটা লরিটা। সবাই ধরে নিয়েছে পায়ের তলায় মাটি কখনও পল্কা হতে পারে না। আচমকা যখন ধসে যায়, পিলে চমকে ওঠে তখনি। বিশ্বাসই হতে চায় না।

প্রশ্ন : কত রকম ভাবে মাটি ধসে পড়ে?

মা : অনেক রকম ভাবে। আচমকা একটু জায়গা বসে যেতে পারে—বাড়ির একদিকের ভিত ভুস্ করে মাটিতে ঢুকে যেতে পারে—অথবা একটু-একটু করে একটা আস্ত শহর মাটিতে ঢুকে যেতে পারে। যেমন ঘটছে ভেনিস শহরের ক্ষেত্রে। কখনও মাটি বসে যায় স্রেফ প্রাকৃতিক কারণে, কখনো মানুষের কারসাজির ফলে।

প্রশ্ন : মানুষের কারসাজি?

মা :পুরোনো খনিগুলো ধসে যায় তো মানুষের কেরামতির জন্যেই। প্রকৃতি মাটিকে শক্ত করেই গড়েছেন—কিন্তু বেশির ভাগ ধস নামে মানুষ তাকে ফোঁপরা করে দিয়েছে বলে।

প্রশ্ন : সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা তাহলে করছেন কী?

মা : সমস্যার ধরনটা তাঁরা আঁচ করতে পারলে সুরাহা নিশ্চয় করে দেবেন। ছোটখাট জায়গায় মাটি বসে গেলে তার একটা বিহিত করা যায়। কিন্তু মূল সমস্যাটা তো কখন কোথায় মাটি বসে যেতে পারে—সেটাই

আগেভাগে জানা। পাতাল যদি ফোঁপরা থাকে—যেমন চুনাপাথরের গুহা—পাতাল পর্যন্ত ফুটো না করলে তাদের অস্তিত্ব ধরা যায় না। তত্ত্বগতভাবে মাটি বসে যাচ্ছে, এ কথা যদিও বা বলা যায়—বাস্তবিক ক্ষেত্রে এরকম ভবিষ্যৎবাণী করা মুশকিল। মাটি বসছে জানবার পরেও, তা রোধ করতে যাওয়াও ভয়ানক খরচের ব্যাপার। যেমন ভেনিস শহর। তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে—কিন্তু তা রোধ করতে যাওয়ার খরচটা এতই বেশি যে শুনলে বিশ্বাস হবে না।

প্রশ্ন : পাতাল কেন ফোঁপরা হয়ে যায়, মা?

মা : প্রাকৃতিক পরিবেশেই চুনাপাথর, জিপসাম আর পাথুরে লবণ জলে গুলে যায়। সবচেয়ে কম জলে গোলে চুনাপাথর। জিপসাম আর পাথুরে লবণের সঙ্গে চুনাপাথরের আরও একটা পার্থক্য আছে। সাধারণত চুনাপাথর বেশ শক্ত পাথর; পাতালে এই পাথর জলে গুলে যে গুহার সৃষ্টি হয়—তাদের ছাদও মোটামুটি বেশ মজবুত। মাটি বসে যাওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে চুনাপাথুরে অঞ্চলেই—গুহাদের জন্যে। ঠিক উল্টো হল পাথুরে লবণ। অনেক নরম পাথর। জলে বেশি করে গুলে যায়। তাই মাটি বসে যায়। তবে গুহর সৃষ্টি প্রায় হয় না বললেই চলে। জিপসাম জিনিসটা রয়েছে চুনাপাথর আর লবণের মাঝামাঝি জায়গায়। কখনো মাটি বসিয়ে দিচ্ছে, কখনো ঠেলে তুলছে।

প্রশ্ন : জিপসাম মাটি ঠেলে তুলছে? পাতালের দানব নাকি?

মা : জিপসাম হল গিয়ে ন্যাচারাল হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সালফেট। অর্থাৎ, যে-ক্যালসিয়াম সালফেটের মধ্যে প্রকৃতি নিজেই জলের অণু রেখে দিয়েছেন। ক্যালসিয়াম সালফেট জিনিসটাই ভীষণভাবে জলে গুলে যায়। অথচ পৃথিবীর নানান জায়গায় পুরু পাথুরে স্তরের অংশ হিসেবে থাকে এই ক্যালসিয়াম সালফেট। বেশির ভাগই জিপসাম অবস্থায়—কখনও-কখনও ক্যালসিয়াম সালফেট অবস্থায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং এ-ছাড়াও আরও অনেক দেশের মাটির তলায় রয়েছে দুটো বস্তুই। এদেরই সলিউশন মাটি বসিয়ে দিচ্ছে এই সব দেশে। বাড়তি সমস্যাটা এই : জলহীন ক্যালসিয়াম সালফেট পাতালে জলের সংস্পর্শে এসে জিপসাম বনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়তনে বেজায় বেড়ে যাচ্ছে—অথাৎ ফুলে ফেঁপে উঠছে। ফলে, ঠেলে উঠছে জমি। ভুতুড়ে বিস্ফোরণের কারণ তো এরাই।

প্রশ্ন : ভুতুড়ে বিস্ফোরণ?

মা : অ্যানহাইড্রাইট ফুলে ফেঁপে ওঠার ফলে জমি প্রচণ্ডভাবে ওপর দিকে ছিটকে যেত বলে উত্তর-পশ্চিম টেক্সাসে বহু বছর ধরে শোনা গেছে পিলে চমকানো বিস্ফোরণের আওয়াজ। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, নোভিকা শহরের কাছে পাতালের জমি আচমকা বেড়ে যাওয়ায় কয়েকশ ফুট জায়গায় জমি খাড়াইভারে উঠে গিয়েছিল ১৮ ফুট ওপরে—মাটি আর পাথর ব্যাঙের ছাতার মত এত জোরে তেড়ে গেছিল আকাশপানে যে আধমাইল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক কুপোকাৎ হয়েছিল ছিটকে আসা পাথরের চোট খেয়ে। তবে হ্যাঁ, জিপসামের ওপরকার জমির নড়াচড়ার ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনাটা ঘটে জমি বসে যাওয়ায়—জলে গোলা জিপসাম সরে যাওয়ার ফলে। যেমন ঘটেছে নিউ মেক্সিকোর রোজওয়েল বটমলেস লেকে—খাড়াইভাবে জমির পাতালপ্রবেশ ঘটেছে বারবার—সবচেয়ে বড় গহ্বরটা ১২০ ফুট গভীর—৩০০ ফুট ব্যাস। আস্ত শহর পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড হয়েছে জিপসামের জন্যে।

প্রশ্ন : শহর লণ্ডভণ্ড হয়েছে জিপসামের জন্যে?

মা : জার্মানির সেই শহরের মাটি বসে যাওয়ায় বহু বাড়ি দুমড়ে মুচড়ে হেলে পড়েছিল। জিপসামের জন্যে সবচেয়ে বড় যে শহরটা টলমল করে চলেছে—নাম তার প্যারিস। শহরতলির জমি যখন তখন তলিয়ে যাচ্ছে —ইঞ্জিনিয়াররা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এর চাইতে বড় শহরেও এই দুর্বিপাক ঘটছে হয়তো আজও— জানা নেই আমার।

প্রশ্ন : তুমি যে বলেছিলে, নুনের জন্যেও মাটি বসে যায়?

মা : সবচেয়ে বেশি মাটি বসার দুর্ঘটনা ঘটে পাথুরে লবণ জলে গুলে গিয়ে পাতাল ফোঁপরা করে দিলে। ক্যানাডার উইণ্ডসরে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আচমকা দুখানা বাড়ি সোজা ঢুকে গিয়েছিল ২৭ ফুট গভীর গর্তের মধ্যে; পাশের জমি থেকে নুনজল টেনে নেওয়ার ফলে। ১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বরের রাত্রে উত্তর ভারতের রাঞ্জ গ্রামের লোকজন আতঁকে উঠেছিল কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজে—সেই সঙ্গে ভয়াবহভাবে কাঁপছিল বাড়িঘরদোর। বাইরে ছিটকে গিয়ে সবাই দেখেছিল, ৫০ ফুট উঁচু একটা বাঁশঝাড় হঠাৎ যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তারপর দেখা গেল, বাঁশঝাড় তলিয়ে গেছে ৬০ ফুট ব্যাসের একটা গর্তে—ধরণী আচমকা দ্বিধা হয়েছে সেখানে। কিন্তু কেন? রাঞ্জ গ্রাম তো রয়েছে আগ্নেয় লাভার ওপর, তাহলে? এই লাস্তরের তলায় ছিল নুনের স্তর। অনেকদিন ধরে তা জলে গুলে গিয়ে পাতালকে ফোঁপরা করে দিয়েছিল—ওপরের ভারি পাথর ধসে পড়েছে তার মধ্যে। গিলে নিয়েছে বাঁশঝাড়কে। বৈজ্ঞানিক কারণটা জানা না থাকলে নিশ্চয় মনে হবে, অবশ্যই বাঁশঝাড়ের ভূতের কাণ্ড!

প্রশ্ন : বাঁশ-ভূত নয় মা, এ যে নুন-ভূত! শহর গিলতে পারে?

মা : কোঁত করে গিলে নিয়েছিল ক্যানাডার রোজ টাউনকে। ১২ মাইল জায়গা জুড়ে মাটি বসে গিয়েছিল ৩০০ ফুট গভীরে। কেন জানিস? ৪০০ থেকে ৭০০ ফুট পুরু নুনের স্তর ছিল ৫০০০ ফুট গভীরে। ক্যানাডার ক্রেটার লেক তৈরি হয়েছে তো এইভাবেই। রেল স্টেশন পর্যন্ত গিলে নিয়েছে তোর নুন-ভূত!

প্রশ্ন : রেল স্টেশন গিলেছে?

মা : ক্যানসাসের Rosel রেল স্টেশন রাতারাতি তলিয়ে গেছিল মাটি বসে যাওয়ায়—সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরাট হয়ে যায় ৭০ ফুট গভীর গর্ত। স্টেশনের টিকি পর্যন্ত আর দেখা যায়নি। এরকম ঘটনা অনেক আছে। এগুলো ঘটছে প্রাকৃতিক কারণে—কিন্তু মানুষের কারসাজিতে নুনের স্তর সরে গিয়ে মাটি ধসিয়ে দিচ্ছে নানা জায়গায়। পাম্পে করে নুন জল টেনে বের করা হয় নুনের খনি থেকে। সবচেয়ে বিখ্যাত নুন-ভূতের মাটি ধসানো ঘটেছে ইংল্যাণ্ডের Cheshire প্রান্তরে। অত্যন্ত একঘেয়ে ভাবে চ্যাটালো এই তেপান্তরের মাঠের পুব আর পশ্চিমে রয়েছে পাহাড়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এখানকার মাটি বসে গেছে পাতাল নুন গলে সরে যাওয়ায়—তাই দেখা যায় ৩০ ফুট গভীর গহ্বরের পর গহ্বর। কয়লা খুঁজতে গিয়ে নুনের খনির সন্ধান পাওয়া যায় এখানে ১৬৭০ সালে। নুন তোলা শুরু হয় ১৬৮২ থেকে। তারপরেই ফটাফট করে বসে যেতে থাকে মাটি—জল এসে ভরাট করে দিত গোটা খনি। ১৯২৮ সালে নরউইচের একটা চালু খনি পরিত্যক্ত হয় এই কারণে। নরউইচের ডানকার্ক শহরতলীতে বাড়ি হেলে পড়েছে রাস্তার ওপর দু ফুট পর্যন্ত, কোনও বাড়ি পাশের বাড়ির ওপর হেলে গিয়ে তাকেও হেলিয়ে দিচ্ছে; লম্বায় আর চওড়ায় হাজার ফুট অঞ্চল বসে গেছে ৪০/৫০ ফুট গভীরে; প্রায় ৪০০ বাড়ির বারোটা বেজেছে আচমকা ধরণী দ্বিধা হওয়ায়—প্রতি বছর বেড়েই চলেছে মাটি ধসার জায়গা। সবচেয়ে দর্শনীয় মাটি বসে যাওয়া ঘটেছে ডানকার্কে।

প্রশ্ন : দর্শনীয়?

মা : ১৮৮০ সালের ৬ ডিসেম্বর ভোর ৬টায় লোকের ঘুম ছুটে যায় ভয়ানক গুড় গুড় গুম গুম আওয়াজে—সেই সঙ্গে আধমাইল জুড়ে মাটি হেলে দুলে উঠতে থাকে আওয়াজের তালে তালে। মাটি চৌচির হয়ে যেতেই হুস হুস করে বেরিয়ে আসতে থাকে বাতাস আর গ্যাস। একটা জায়গায় তেড়ে উঠে আসে কাদার গরম ফোয়ারা—১২ ফুট হাইটে। পাতালে পুরোনো খনির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেওয়াল ধসে পড়ায় জল তেড়েমেড়ে ঢুকছিল বলেই এত বাতাস সশব্দে বেরিয়ে আসছিল ফুটোফাটা দিয়ে। এ জল আসছিল Wincham নদী থেকে—পুরো নদীটাই ঢুকে যাচ্ছিল পাতালে। নদীর জলও শেষে ঢুকে পড়ল পাতালে—সেইসঙ্গে আস্ত একটা হ্রদের জল। ঘূর্ণিপাক দেখা দিল বিশাল গহ্বরে—ঘুরতে ঘুরতে মাঝের জল নেমে গেল ১২ ফুট নিচে।

প্রশ্ন : চুনাপাথর আর নুন ছাড়াও নিশ্চয় অন্য কারণ আছে মাটি বসে যাওয়ার পেছনে?

মা : আছে বইকি। জমির নিচে যে তলানি জমেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, তা যখন ওপরের মাটির চাপে চেপেচুপে আয়তনে কমে যায়, জলকে চেপে বের করে দেয়—তখন ওপরকার মাটি বসে যায়। ভূতাত্ত্বিকরা এই ব্যাপারকে বলেন compaction। চূড়ান্ত নজির হল, গাছপালার পাতাল-তলানি, যাকে বলে peat—লক্ষ লক্ষ বছরের চাপে এই peat হয়ে যাচ্ছে কয়লা। আসল ভলুমের টেন পার্সেন্ট কমে গেলেই কয়লা হচ্ছে। যেটুকু কমছে—সেটুকুই জল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ঘটছে। ইংল্যাণ্ডের Fenland অঞ্চলে কমপ্যাকশনের ফলে peat গুটিয়ে যাওয়ায় জমি নেমে গেছিল ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি নিচে, অথাৎ এক শতাব্দীতে শতকরা ৫৬। এখনও compaction চলছে সেখানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ফ্লোরিডা এভারগ্লেড অঞ্চলে peat গুটিয়ে যাওয়ায় জমি বসছে প্রতি বারো বছরে এক ফুট। ক্যালিফোর্নিয়ার sacrameno delta-তে peat আয়তনে কমছে বলে সেখানকার জমি সমুদ্র-পৃষ্ঠের নিচে নেমে গেছে—নদীতে বান এলেই পুরো তল্লাট ডুবে যায়।

প্রশ্ন : কাদাও তো চাপের ফলে জল বের করে দিয়ে ছোট্ট হয়ে যায়। তখন?

মা : তখনো compaction হয়—মাটি বসে যায়। হল্যাণ্ডে সাগরপাড়ের যে জমিকে বাড়িঘরদোরের জন্যে গোছানো শুরু করেছিলেন ওলন্দাজ ইঞ্জিনিয়াররা, তাঁরা দেখেছেন ২৫/৩০ পার্সেন্ট কাদার কমপ্যাকশন ঘটছে। কাদার কমপ্যাকশনে peat compactionএর মত রাসায়নিক রদবদল ঘটে না বলে তার ভবিষ্যৎবাণীও করা যায় ১৪ আর ১৫ শতকে ব্রিস্টলের টেম্পল চার্চ তৈরির আগেই দুর্বিপাকটা টের পাওয়া গেছিল। অ্যাভন নদীর ভিজে পলিমাটির ওপর নির্মিত হওয়ার ফলে টাওয়ার এখন চারফুট হেলে পড়েছে—হেলে পড়েও খাড়া রয়েছে। নটিংহ্যামে ট্রেন্ট নদীর পলিমাটির ওপর তৈরি কলকারখানাও কিছু তলিয়েছে, কিছু হেলেছে—এমনটা যে ঘটবে, আগেই তা বলা হয়েছিল।

প্রশ্ন : ব-দ্বীপ তাহলে বিপজ্জনক?

মা : ব-দ্বীপগুলোর মাটি বসে যাওয়ার পেছনে শুধু compaction নয়—অন্য কারণও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপে প্রতি শতাব্দীতে গড়ে ০.২৯ ফুট মাটি বসে যাচ্ছে compaction-এর জন্যে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, তলানির চাপে ভূস্তরের নিজেরই বসে যাওয়া—প্রতি শতাব্দীতে তা বসছে ০·০৭ ফুট হিসেবে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠে যাচ্ছে প্রতি শতাব্দীতে ০·৩২ ফুট হিসেবে—এটা অবশ্য ঘটছে পৃথিবীর সব সমুদ্রেই। সব মিলিয়ে কি ঘটছে? ১৯৩৮ সালে ব-দ্বীপের Balize শহর

চলে গেল চার ফুট জলের তলায়—তার ৩০ বছর আগেই অবশ্য শহর ছেড়ে চলে গেছিল লোকজন মহামারী শুরু হওয়ায়।

প্রশ্ন : Compaction-এর মূলে তাহলে রয়েছে চাপের চোটে জল বেরিয়ে যাওয়া? জল ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়?

মা : কিছু পাতালতলানিতে জল দিলে ফলটা হবে একই—জমি বসে যাবে। পৃথিবীর নানান জায়গায় বাতাসে উড়ে এসে একরকম খুব মিহি মাটি জমা হয়—একে বলে Loess; প্রথম দফায় তা জলে ভিজলেই তার মধ্যে hydrocompaction শুরু হয়ে যায়; তার মানে, কণাগুলো নড়েচড়ে বসে ভালোভাবে গুটিয়ে-সুটিয়ে যাওয়ার জন্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ভ্যালীতে এর ফলে মাটি বসে গেছিল ১৫ ফুট—বাড়ি, রাস্তা, পাইপ লাইন, কুয়ো, খাল—জখম হয়েছিল সবই।

প্রশ্ন : কিছু বাড়ির আধখানা বসে যায়, আধখানা খাড়া থাকে কেন?

মা : ভাল প্রশ্ন। নটিংহ্যামে এক সারি বাড়ির শেষ বাড়ির দেওয়াল বসে যাচ্ছে দেখে বাড়ি খালি করে দেওয়া হয়। গোয়েন্দাগিরির ফলে একটা ম্যাপ পাওয়া গেল এবং জানা গেল, পুরো প্লটটার তলায় পাথর খুঁড়ে বের করা হয়েছিল এক সময়ে। তার খানিকটা ভরাট করে দেওয়া হয়। নতুন বাড়ি তৈরির সময়ে আগের খবর নেওয়া হয়নি। শেষ বাড়ির শেষ দেওয়াল জঞ্জালের ওপর থাকায় তার compaction হয়েছে—বসে গেছে বাড়ির আধখানা। পাথরের ভিতে থাকায় অন্য বাড়ি আস্ত থেকেছে। কমপ্যাকশন সব জায়গায় সমানভাবে হলে এরকমটা ঘটত না।

প্রশ্ন : পিসা-র Leaning Tower কেন হেলে পড়েছে, মা?

মা : পিসা খুব প্রাচীন শহর। গড়ে উঠেছিল চ্যাটালো জায়গায়—প্রায় সমুদ্র পৃষ্ঠের লেভেলে। পাশেই Apennines পাহাড়ের রেঞ্জ। পুরো সমতলটার তলানি মাটি বেজায় নরম—বড় বাড়ি তৈরির উপযুক্ত মোটেই নয়। লিনিং টাওয়ারটা আসলে একটা গিজার লাগানো ঘন্টাঘর। ১১ শতকে তৈরি হয় এই গির্জে। তৈরির পর থেকেই বসে যেতে থাকে; কিন্তু খুব একটা ক্ষতি হয়নি; চওড়ার অনুপাতে হাইট বেশি না হওয়ায় খুব হেলে পড়েনি। একশ বছর পরে ঘন্টাঘর তৈরি আরম্ভ হয় খুবই দুর্বল জমির ওপর—ভিতটাও মোটই মজবুত করা হয়নি। কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। বছর কয়েক পরে তিনটে তলা তৈরি হওয়ার পরেই টাওয়ার এমনই হেলে পড়ে যে আর্কিটেক্ট কাজ ছেড়ে দিয়ে চম্পট দেয় পিসা থেকে। আর ওজন না পড়ায় টাওয়ার আর হেলেনি। ১২৭৫ সালে এলেন আর একজন বিল্ডার। তিনি দেখলেন, টাওয়ার যখন আর হেলছে না, তখন যেদিকে হেলেছে, সেইদিকে বাড়তি গাঁথনির সাপোর্ট দিয়ে আরও উঁচু করা যাক টাওয়ারকে। কিন্তু আবার হেলতে থাকে টাওয়ার। বিদায় নিলেন এই আর্কিটেক্ট—এলেন তৃতীয় স্থপতি। তিনিও একদিকের গাঁথনি মজবুত করে টাওয়ার নির্মাণ করলেন ১৩৫০ সালে। তখন থেকেই বিরামবিহীনভাবে টাওয়ার হেলেই চলেছে —এখন তা ১৭ ফুটেরও বেশি হেলে রয়েছে।

প্রশ্ন : ঠিক যেন জ্যান্ত টাওয়ার, তাই না, মা?

মা : তোর মুণ্ড। হেলে পড়ার মূল কারণটার টেকনিক্যাল নাম—differential settlement। এক একদিকে এক-এক হারে মাটি বসছে—টাওয়ার বেচারি ভুগছে টানাপোড়েনে। মোট মাটি বসেছে প্রায় ৬ ফুট—সামনের দরজার সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছোতে হলে ওপরে না উঠে নিচে নেমে যেতে হবে। ৬ ফুট হল গড় হিসেব। দক্ষিণ

দিকে বসেছে ৯ ফুট, উত্তর দিকে ৩ ফুট। টাওয়ারের ঠিক তলায় রয়েছে Pliocene যুগের তলানি আর কাদার স্তর—যা কিনা আংশিকভাবে আগ্নেয়গিরির পেট থেকে বেরিয়েছিল। এই স্তরটা প্রায় ১৫ ফুট পুরু, টানলে বাড়ে, চাপ দিলে খুবই কমে যায়। টাওয়ারের ভিতটা আংটির মত—ব্যাস ৬০ ফুট—মাটির মধ্যে গাঁথনি গেছে মাত্র কয়েক ফুট। টাওয়ারের হাইট ১৮০ ফুট—অথাৎ 'চওড়ায় যা, তার তিনগুণ। এরকম ইমারত তলতলে কাদামাটির ওপর তৈরি হলে তো হেলবেই। তলায় বালির বিছানা না থাকলে পিসার টাওয়ার কবে পড়ে যেত!

প্রশ্ন : বালির বিছানায় পিসার টাওয়ার?

মা : কাদামাটির স্তরের ঠিক নিচেই রয়েছে ১৫ থেকে ৩০ ফুট পুরু বালির বিছানা। বালি বড় টেটিয়া। চেপেচুপে ছোট করা যায় না। কাদামাটির মত অত নড়তে চড়তেও চায় না। বালির ওপর প্রাসাদ হয় না ঠিকই—কিন্তু এই বালির দৌলতেই টাওয়ারের মাটিতে বসে যাওয়া অনেকটা কম হচ্ছে—হেলছেও কম।

প্রশ্ন : সাতশ বছরেও পড়ে গেল না কি শুধু বালির বিছানার জন্যে?

মা : বালি আর ভিতের মাঝের কাদামাটি অনেক মজবুত হয়ে গেছে Compaction-এর ফলে জল বেরিয়ে যাওয়ায়—তাই ৭০০ বছরেও আছড়ে পড়েনি। ১৫ থেকে ৩০ ফুট পুরু বালির বিছানার মধ্যেও পাতলা কাদামাটির স্তর আছে; এই স্তর দক্ষিণ দিকে বেশি পুরু; কমপ্যাকশন সেইদিকেই বেশি হয়েছে টাওয়ার হেলেছে সেই কারণেই। আরও আছে। বালির নিচে রয়েছে আরও পলকা কাদামাটি ১৩০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত—এই গভীরতা থেকেই বালির বিছানা ফের শুরু হয়েছে। ওপরের তিনটে স্তরের ক্রমাগত নড়াচড়ার ফলেই টাওয়ার হেলেই চলেছে। আবার বলছি, এই তিনটে স্তর, হল, ওপরকার কাদামাটি, মাঝের বালি, তলার কাদামাটি।

প্রশ্ন : পৃথিবীবিখ্যাত লিনিং টাওয়ারের মরণদশা কি আসন্ন?

মা : ১৩০ ফুট গভীরতায় যে বালির বিছানা রয়েছে, পাতাল-গাঁথনি সেই পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে লিনিং টাওয়ারকে ঠিক এই অবস্থায় রেখে দিতে পারে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক। লিকুইড সিমেন্টের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল পাতাল তলানিতে—কিস্‌সু ফয়দা হয়নি, তাই দরকার এখন পাতাল-গাঁথনির। কিন্তু এইরকম হেলেপড়া একটা টাওয়ারের তলায় গাঁথনি গেঁথে যাওয়াটা বড় ঝুঁকির ব্যাপার। যদি হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায়? অনেকবছর ধরেই অনেক প্ল্যান তৈরি হয়েছে—তৈরি হয়ে চলেছে এখনও। কপাল ভাল থাকলে প্ল্যানমাফিক কাজ চালালে সুফল দেখা দেবে। কিন্তু ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে থাকলে আর বড় জোর একশ বছর—লিনিং টাওয়ার মাটিতে শুয়ে পড়বেই। এই বিপর্যয় রোধ করতে পারে শুধু সাহসী মানুষ।

পাতালের জল

প্রশ্ন : পাতালের জল টেনে তুললে ওপরের মাটি পাতালে চলে যেতে পারে?

মা : সুন্দর বলেছিস। ঠিক এইরকম বিপর্যয়ই ঘটেছে আর ঘটে চলেছে দেশে দেশে মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় সানজোয়াকুইন উপত্যকায় বৃষ্টি কম পড়ে। অথচ চাষআবাদ চোখে পড়ার মত। চাষের জল টেনে তোলা হয় উপত্যকার তলায় প্রায় ২০০০ ফুট পুরু বালি আর কাদার বিছানা থেকে। ফলে, ২৮ ফুট পর্যন্ত মাটি বসে গেছে কয়েক বর্গমাইল এলাকায়। পাতাল-জল লুঠ করার ফলেই এই কাণ্ড ঘটছে দেখে পাহাড় থেকে জল এনে পাতালে ঢুকিয়ে দিয়ে পাতাল-দেবতার রোষ কিছুটা বন্ধ করা গেছে; অথাৎ মাটি এখন ধাঁধাঁ করে বসে যাচ্ছে না। টোকিও শহরতলীতে কিন্তু পাঁচিল গেঁথে সমুদ্রের জল ঢোকা বন্ধ করে দিয়ে রুখে দেওয়া হয়েছে মাটি বসে যাওয়া।

প্রশ্ন : পাঁচিল তুলে সমুদ্র আটকানো! কি বলছ মা?

মা : টোকিও শহরটা একসময়ে বছরে আধফুট হিসেবে পাতাল প্রবেশ করেছে। অনেক পেল্লায় বাড়ির ভিত পাতাল-পাথরে রাখা হয়েছিল বলেই বালিমাটির ওপর ভিত গাঁথা পাশের বাড়িঘরদোর পাতাল-প্রবেশ করায় পেল্লায় বাড়িগুলোকে মনে হয়েছে যেন মাটি ছেড়ে আকাশে ঠেলে উঠছে। ১৯৬১ সালে শহরতলীর ১৫ বর্গমাইল এলাকা সমুদ্র-পৃষ্ঠের নিচে নেমে গেছিল—বিরাট উঁচু টানা লম্বা সমুদ্র-প্রাচীর গেঁথে সমুদ্রের জল আটকানো হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে সাংহাই শহরেও।

প্রশ্ন : সাংহাই-এরও পাতাল-প্রবেশ?

মা : বিশেষ করে যে-সব শহর সমুদ্র-পৃষ্ঠের খুব কাছে থাকে, তাদের মাটি ফটাফট বসে গেলে অবস্থা সঙীন হয়ে দাঁড়ায়। হাজার ফুট পুরু পাতাল-তলানি থেকে এন্তার জল টেনে তোলা হয়েছিল চিনের সাংহাই শহরে। ১৯২১ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে বন্দর অঞ্চলে মাটি বসে গেল আট ফুট—সমুদ্রের জল যখন-তখন তাথৈ তাথৈ নাচ জুড়ে গেল গোটা বন্দরে—তখন টনক নড়ল তাদের। মাটির তলায় জল ঢুকিয়ে জলের মাথা সমান রাখতে হয়েছে। লণ্ডন শহরের তলায় আছে খড়িমাটির বিছানা। এই বিছানা থেকেও জল টেনে নেওয়ায়

কমপ্যাকশন ঘটেছে—তবে লণ্ডনের কপাল ভালো—এক ফুটের বেশি বসেনি। এই ভাবেই তলিয়ে যাচ্ছে জর্জিয়ার সাভান্না অঞ্চল। টেক্সাসের গ্যালভেসটন অঞ্চলে ৫ ফুটেরও বেশি মাটি বসেছিল ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে। এখনও বসছে বছরে ৩ ইঞ্চি হারে। এখানে শুধু জল নয়—পাতাল থেকে তেল টেনেও বের করা হয়েছিল। জাপানের নীগাতা শহরের পাতাল থেকে মিথেন-ঠাসা লবণ-জল টেনে তোলায় মাটি দেবে গেছিল ভয়ানকভাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠেরও নিচে। জলের পরেই তেল টেনে তোলা কিন্তু মাটি বসে যাওয়ার একটা বড় কারণ—লস এঞ্জেলস-এর দৃষ্টান্ত ভোলবার নয়।

প্রশ্ন : লস এঞ্জেলস কি এখন জলের তলায়?

মা : লাফিয়ে উঠলি যে! লস এঞ্জেলস-এর দক্ষিণ প্রান্ত রয়েছে লঙ বীচ-এর বন্দর এলাকা। তার ঠিক নিচেই রয়েছে উইলমিঙটন তেলের খনি। ৬০০০ ফুট পাতাল-তলানি থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি তেল আর জল তোলা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। ফলে ৬ মাইল জায়গার জমি বসে গেছে। ডিম্বাকৃতি এই অঞ্চলটার ঠিক মাঝখানে জমি বসেছে ২৯ ফুট, ১৯২৮ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে। ডিম্বাকৃতি খোঁদলের পাশাপাশি জায়গা বসেছে ৯ ফুট। শহরের ক্ষতি অবর্ণনীয়—সবচেয়ে মার খেয়েছে নৌ-বন্দর—যার বেশির ভাগই এখন সমুদ্র-পৃষ্ঠের নিচে—ঘিরে রাখা উঁচু কংক্রিট পাঁচিল দিয়েও কাজ হচ্ছে না—সেই পাঁচিল ক্রমাগত উঁচু করে যেতে হচ্ছে সমুদ্রের জল ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। ১৯৫৭ সালে মার্কিন দপ্তর তেল ভোলা বন্ধ করে দিয়ে দু-শ কুয়োর মধ্যে দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে, লঙ বীচ-এর সমস্যা কিছুটা মিটেছে। কিন্তু ওয়াটার ইঞ্জেকশন দিয়ে ভেনিস আর মেক্সিকো শহরকে বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : ভেনিস আর মেক্সিকো শহরে ওয়াটার ইঞ্জেকশন?

মা : পৃথিবীবিখ্যাত ভেনিস শহর তিল তিল করে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে চলে যাচ্ছে অনেক বছর ধরে। এ শহর গড়ে উঠেছিল ১৩০০ বছরেরও আগে ৩৫ মাইল লম্বা আর ৬ মাইল চওড়া একটা বিশাল লেগুন-এর প্রায় মাঝখানে। লেগুন মানে উপহ্রদ। আংটির মত প্রবাল দ্বীপ দিয়ে ঘেরা হ্রদ—যার মধ্যে সমুদ্রের জল বয়ে যায়। ভেনিসের লেগুনেও জল আসে অ্যাডিয়াট্রিক সাগর থেকে তিনটে খালের মধ্যে দিয়ে—শহর আর সাগরের মাঝের সারি সারি বালির চড়াগুলোকে সমুদ্র-প্রাচীর গেঁথে মজবুত করা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ভেনিস তলিয়ে যাচ্ছে অনেকদিন ধরেই। ১৯০২ সালে সেন্ট মার্কস গির্জের ঘন্টাঘর আচমকা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল।

প্রশ্ন : কলকাতায় যেভাবে বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ছে?

মা : বাগড়া দিসনি। ভেনিসের বাড়িগুলোর ভিত মজবুত না থাকায় পুরো অঞ্চল শুওরের গোঁ নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। শহরের প্রায় ৭০ শতাংশ সমুদ্র-পৃষ্ঠের চার ফুটের ওপরে নেই। বন্যার জল নিয়ম করে টপকে যাচ্ছে এই উচ্চতা—ঢুকছে শহরে। ওই অঞ্চলে এই ধরনের বানের জলকে বলা হয় acqua alta; গত শতাব্দীর শেষে দেখা দিত পাঁচ বছরে একবার, ১৯৩০ সালে বছরে একবার, ১৯৬০ সালে বছরে তিনবার, ১৯৬৬ সালে ঘটিয়ে দিল রীতিমত প্রলয়। সেন্ট মার্কস স্কোয়ারের জলে ডুবে থাকা এখন তো দৈনিক কাগজের মুখরোচক খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য এই শহর যে পাতালে চলে যাচ্ছে তিল তিল করে —ঘন ঘন বন্যার প্রবেশই তার মোক্ষম প্রমাণ।

প্রশ্ন : ভেনিসের বাড়িগুলোর ভিত মজবুত নয় বললে কেন, মা?

মা : কাঠ দিয়ে তৈরি বলে। উপহ্রদের জল যেখানে খুব গভীর নয়, সেই-সেই জায়গায় কাঠের গাদা মাটিতে ঢুকিয়ে তার ওপর তৈরি হয়েছে বাড়ি। উপহ্দের তলায় রয়েছে কিন্তু চতুর্থ ভূতাত্ত্বিক যুগের ২৬৫০ ফুট পুরু না-জমাট বস্তু, তারও তলায় রয়েছে প্লায়োসিন যুগের, অথাৎ মধ্যাধুনিক যুগের ঠিক পরের তৃতীয় যুগের, আরও না-জমাট বস্তু। প্রথম স্তরে রয়েছে ৫০ শতাংশ বালি, ৩৫ শতাংশ পাঁক, ১৫ শতাংশ কাদামাটি। সমুদ্রের পাশে ব-দ্বীপ জাতীয় অঞ্চলে এ-ভাবে বাড়ি গড়লে তা তলাবেই। ভেনিসও তলাচ্ছে। এ ছাড়াও আছে আর একটা কারণ।

প্রশ্ন : নিশ্চয় জল টেনে বের করা হচ্ছে ভেনিসের তলা থেকে?

মা : ঠিক ধরেছিস। একে তো প্রাকৃতিক কারণে মাটি বসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্যার জল নেচে নেচে যাচ্ছে, গোদের ওপর বিষফোড়ার মত জল তোলা হয়েই চলেছে পাতাল থেকে।

প্রশ্ন : প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভেনিসের মাটি বুঝি ডুবতো না?

মা : তখনও ডুবেছে প্রায় বিশ ফুটের মত। রোমানদের সময়ে ডুবেছে আরও ৬ থেকে ১০ ফুটের মত। কিন্তু আধুনিককালে প্রায় ৭০০০ ফুট কুয়ো থেকে জল তোলার ফলে উপহ্রদের শহর বসে যাচ্ছে হু-হু করে। এর সঙ্গে মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছে সমুদ্রের নিজেরই মাথা উচু করা। এ দুর্বিপাক ঘটছে গোটা পৃথিবী জুড়ে—টেম্পারেচার বাড়ছে, মেরু-বরফ গলছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে—বছরে ০·০৬ ইঞ্চি হারে বেড়েই চলেছে।

প্রশ্ন : ভেনিসকে বাঁচানোর জন্যে ওয়াটার-ইঞ্জেকশন করেও লাভ হয়নি বলছো?

মা : পাতাল-প্রবেশ একটু কমেছে—বন্ধ হয়নি। দুটো কাজ করলে ভেনিসকে বাঁচানো যায়। এক, সাগর আর ভেনিসের মাঝে খালগুলোয় পর-পর বাঁধ তৈরি। এতে অবশ্য শহরের জঞ্জাল ফেলবার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দুই, গোটা শহরটাকে হ্যাঁচকা মেরে একটু ওপরে তুলে দেওয়া। চারশ ফুট গভীর আর আট মাইল লম্বা পাঁচিল দিয়ে গোটা ভেনিসকে ঘিরে ধরে ওয়াটার ইঞ্জেকশন করলেই নিচের বন্দী জলের ঠেলায় শহর চড়-চড় করে উঠে আসবে। এতেও যদি কাজ না হয়, বিখ্যাত লেগুন একসময়ে গিলে নেবেই বিখ্যাত ভেনিসকে।

প্রশ্ন : মেক্সিকোর কপাল পুড়ছে কিভাবে মা?

মা : মেক্সিকো শহরটা গড়ে উঠেছে নজর কাড়ার মত জায়গায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৪০০ ফুট ওপরে থেকেও পুরো তল্লাটটা থালার মত চ্যাটালো—থালার কিনারা থেকে মেঘলোকের দিকে ধেয়ে গেছে সারি সারি পাহাড়। চ্যাটালো জায়গাটা গোল নয়—লম্বাটে; লম্বায় প্রায় ৫০ মাইল, চওড়ায় ১৫ মাইল। বহু ক্ষুদে নদী ঝিরঝিরিয়ে বয়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে। চ্যাটালো প্রান্তরের তলায় রয়েছে পুরু পাতাল-তলানি—কিনারা ঘিরে পাহাড় বরাবর রয়েছে আগ্নেয়পাথর আর সেকেলে চুনাপাথরের তলানি। চ্যাটালো অঞ্চলের পাতাল-তলানির নরম কাদামাটির মধ্যে আছে montmorillonite নামে একটা কাদা-খনিজ, যাকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে হাজার হাজার গুণ ম্যাগনিফাই করে দেখা গেছে ভেতরে রয়েছে বিস্তর ফাঁপা নল; জল ধরে রাখার পক্ষে যাদের তুলনা নেই।

প্রশ্ন : মেক্সিকোর নিচে ফাঁপা নল বোঝাই মাটি? তাহলে সেখানে শহর তৈরি হল কেন মা?

মা : যখন তৈরি হয়েছিল, তখন মাটি নিয়ে এত গবেষণা কেউ করত না। মেক্সিকোর ঠিক নিচের পাতাল-তলানির শতকরা ৮৮ ভাগ জল ধরে রেখেছে ফাঁপা নলের মধ্যে—শতকরা ১২ রয়েছে নিরেট বস্তু। এরকম

জায়গায় কোনো বড় শহর গড়ে উঠলে ধরণী তাকে কোলে টেনে নেবেই। মেক্সিকোর কপালে ঘটেছে একই দুর্দশা।

প্রশ্ন : কবে থেকে মা ধরণী কোলে টানছেন মেক্সিকোকে?

মা : প্রথম তা নজরে পড়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে। ১৭০ ফুট নিচের বালির স্তর থেকে পাম্পে করে তখন দেদার জল তোলা হচ্ছিল। ১৯৫৯ সাল নাগাদ শহরের বেশির ভাগই চলে গেল ১০ ফুটেরও বেশি নিচে। সবচেয়ে বেশি দাবানি ২৫ ফুট পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় আড়াইতলা বাড়ির ছাদ মাটির লেভেলে এসে ঠেকল পুরো বাড়ির পাতাল-প্রবেশ ঘটায়। শহর তখন ছড়িয়ে পড়েছে, পাতাল থেকেও জল পাম্প করে তোলা হচ্ছে। ১৮৯৮ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে মাটি বসেছে বছরে ১·৬ ইঞ্চি হারে, ১৯৪৮-৫২'তে বছরে এক ফুট হারে। ১৯৪৮য়েই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ওয়াটার ইঞ্জেকশন না দিলে মেক্সিকোর পাতাল-প্রবেশ রোগ সারানো যাবে না—তা সত্ত্বেও বহু বছর ধরে ৩০০০-এরও বেশি কুয়ো এন্তার জল সাপ্লাই করেছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া শহরকে আর ক্ষইয়ে দিয়েছে শহরের মূল ভিতকে। মাটি যে বসছে নলকূপ থেকে জল তোলার ফলে, তা তো চোখের সামনেই দেখা গেছে। নলকূপের ইস্পাতের নল মাটি থেকে উঠে রয়েছে ১৮ ফুট ওপরে—সেখানকার মাটি বসেছে ২০ ফুট নিচে। কমপ্যাকশন যে চলছে পাতাল-তলানির মধ্যে—এর চেয়ে লক্ষণীয় প্রমাণ আর হয় না।

প্রশ্ন : নলকূপ না হয় মাথা খাড়া করে রইল, ভারি বাড়িগুলোর কি হল মা?

মা : মেক্সিকোর ঠিক মাঝখানে আছে অপূর্ব সুন্দর প্যালেস অফ ফাইন আর্টস। প্রাসাদ তৈরি শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে—১৯৩৪-এর আগে শেষ হয়নি। প্রাসাদের ভিত রাখা হয়েছিল মাত্র দশ ফুট পুরু কংক্রিটের বিছানায়। এই দশ ফুটের মাথা ছিল জমি বরাবর—একই লেভেলে। প্রাসাদ তৈরি শুরু হওয়ার আগেই দেবে গেছিল কংক্রিট শয্যার মাঝের দিকটা। বাড়ি তৈরি শুরু হতেই দেবে গেল আরও খানিকটা। মানে, ঢুকে গেল মাটির মধ্যে। ১৯০৮ সালে কিছুটা তৈরি প্রাসাদ মাটিতে ঢুকে গেল পাঁচ ফুট পর্যন্ত, দু'বছর পরে চিড় খেল কংক্রিটের দশ ফুট পুরু শয্যা। ১৯১০ সালে সত্তর হাজার থলি ভর্তি সিমেন্ট ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল কংক্রিটের নিচের তলানিতে।

প্রশ্ন : সিমেন্টের ইঞ্জেকশন?

মা : সিমেন্টের মশলাও বলতে পারিস। কিন্তু মিহি কাদামাটি নিজের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেয়নি এই মশলাকে—জায়গায় জায়গায় চাপ চাপ ডেলা ডেলা হয়ে আরও ওজন চাপিয়েছে নরম কাদামাটির ওপর—ফলে মাটি আরও বসেছে। পাঁচ বছর পরে ইস্পাতের চাদরের পাঁচিল মাটিতে ঢুকিয়ে ঘিরে দেওয়া হল প্রাসাদকে—যাতে প্রাসাদের চাপে তলাকার মাটি বাস্তুহারা হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে।

প্রশ্ন : ইস্পাতের সঙ্গে কাদামাটির লড়াই?

মা : সে লড়াইতে আবার জিতে গেল কাদামাটিই। কেন না, চাপের চোটে কমপ্যাকশন ঘটিয়ে মাটি তখন আয়তনে গুটিয়ে যাচ্ছে। কি আর করা যায়। মেহনত যখন জলেই গেল, প্রাসাদ তৈরিতেও ক্ষ্যামা দেওয়া হল না। তৈরি হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, প্রাসাদ আরও ঢুকে গেছে মাটির মধ্যে। এখন তা রয়েছে পাশের রাস্তার দশ ফুট নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে ঢুকতে হয় প্রাসাদের নিচের তলায়—দোতলায় যাওয়া বরং অনেক

সহজ। প্রাসাদ-তোরণ মূল বাড়ি থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, চারপাশের রাস্তাও ফেটেফুটে হেলে পড়েছে পেল্লায় প্রাসাদের দিকে।

প্রশ্ন : তাহলে কি মেক্সিকোয় কলকাতার মত বহুতল বাড়ি নেই?

মা : কেন থাকবে না? প্যালেস অফ ফাইন আর্টস-এর একটা বাড়ি পরেই ১৯৫১ সালে গড়ে উঠেছে ৪৩ তলা টাওয়ার ল্যাটিনো আমেরিকানা'। এ-বাড়ির সদর দরজা রয়েছে রাস্তার ওপরেই—মাটিতে ঢুকে যায়নি।

প্রশ্ন : নিশ্চয় নলকূপ থেকে আর জল তোলা হয় না মেক্সিকোয়?

মা : ১৯৫২ সাল থেকে বাইরে থেকে জল আমদানি শুরু হয় মেক্সিকোয়—পাতাল জল পাম্প করে তোলা বন্ধ হয়—তার পরের বছর পাম্প করে পাতালে জল ঢোকানো শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে দেখা গেল, বছরে এক ইঞ্চির বেশি মেক্সিকো আর তলাচ্ছে না।

প্রশ্ন : কিন্তু 'টাওয়ার অফ ল্যাটিন আমেরিকানা' তো তৈরি হয়েছিল তারও আগে। পাতাল-প্রবেশ করল না কেন?

মা : কারণ ৪৩ তলা উঁচু ভারি বাড়ির ভিত গাঁথা হয়েছিল ১১০ ফুট নিচে বালি পাথরের শক্ত জায়গায়। তাকে ঘিরে আছে যে মাটি, তা থেকে জল তোলা হয় না পাম্পে করে—সে মাটিতে কমপ্যাকশনও ঘটেনি। বড় শহরের বড় বাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে এই কায়দাতেই—এক কথায় যাকে বলা হয় 'আণ্ডারপাইনিং'।

প্রশ্ন : কলকাতায়?

মা : যতদূর জানি, কলকাতার প্রথম বহুতল বাড়ি তৈরি হয়েছিল গঙ্গার পাড়ে। ঠিক যেন একটা পাহাড়। সেই পাহাড় তো আজও হেলে পড়েনি গঙ্গার দিকে। কলকাতা তো একটা গামলা বললেই চলে। এখনকার বহুতল বাড়িদের ভেঙে পড়ার কারণটা ভালো ইঞ্জিনিয়াররা ভালোভাবেই জানেন।

দেহ

প্রশ্ন : বলতে পারো, বড় হলে আমি কত লম্বা হব?

মা : দ্বিতীয় জন্মদিনে যতটা লম্বা ছিলি, প্রায় তার ডবল। ছেলেরা বড় অবস্থায় যতটা লম্বা হয়—দ্বিতীয় জন্মদিনে থাকে তার ৪৯·৫ শতাংশ। মেয়েরা বড় হলে যতটা ঢ্যাঙা হবে—দ্বিতীয় জন্মদিনে থাকে তার ৫২·৮ শতাংশ। অর্থাৎ, মেয়েরা একটু বেশি বেড়ে থাকে দ্বিতীয় জন্মদিনে ছেলেদের চেয়ে!

প্রশ্ন : নখ কত তাড়াতাড়ি বাড়ে, মা?

মা : প্রায় ছ-মাস লাগে গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত বাড়তে—হাত আর পায়ের নখ।

প্রশ্ন : ব্রেনের ওজন কত?

মা : শরীরের ওজনের প্রায় তিন শতাংশ। কিন্তু যত অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিই, তার বিশ শতাংশ একাই ব্যবহার করে এই ব্রেন। খাবারের সঙ্গে যত ক্যালরি শরীরে যায়, তার বিশ শতাংশ কাজে লাগায় ব্রেন একাই। শরীরে যত রক্তের জোগান, তার প্রায় ১৫ শতাংশ চলে যায় ব্রেনের চাহিদা মেটাতে।

প্রশ্ন : কত হাড়, কত পেশি আছে এই শরীরে?

মা : প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে থাকে মোটামটি ৬৫০টা পেশি, ১০০টা সন্ধি, এক লক্ষ কিলোমিটার রক্তবাহ আর ১৩০০ কোটি স্নায়ুকোষ। বড়দের শরীরে থাকে ২০৬টা হাড়—তার প্রায় অর্ধেক থাকে হাতে আর পায়ে। জন্মের সময়ে বাচ্চাদের থাকে ৩০০টা হাড়—ছেলেবেলাতেই ৯৪টা হাড় মিলেমিশে যায়।

প্রশ্ন : হাড় কি পাথরের মত শক্ত হতে পারে?

মা : তাই তো হয়। ওজন বইবার সময়ে গ্রানাইট পাথরের মত মজবুত। দেশলাই বাক্সর সাইজের হাড়ের চাঁই ৯ টন ওজন ধরে রাখতে পারে—কংক্রিটের চাইতে চারগুণ বেশি।

প্রশ্ন : বুকের ধুকপুকুনি ঘুমোলও বন্ধ থাকে না কেন মা?

মা : বন্ধ হলেই তো মৃত্যু। তাই সারা জীবন মানুষের হৃদযন্ত্র ধুকপুক করে ২০০ কোটি বার—পাম্প করে ৫০ কোটি লিটার রক্ত। ঘুমের সময়েও মুঠি সাইজের হৃৎপিণ্ড ঘন্টায় ৩৪০ লিটার রক্ত পাম্প করে যায়—

সাত মিনিট অন্তর মাঝারি সাইজের একটা মোটর গাড়ির পেট্রল ট্যাঙ্ক ভরে দিতে পারে। সারাদিনে যতখানি পেশিশক্তি তৈরি করে, তাই দিয়ে মাঝারি সাইজের একটা মোটর গাড়িকে ৫০ ফুট ওপরে তুলে ফেলা যায়।

প্রশ্ন : ধুকপুকুনির রেট কী, মা?

মা : ধুকপুকুনির রেট মানেই তো নাড়ীর গতি—পালস রেট—যা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে মিনিটে ৭০-৭২ বার—জিরেন অবস্থায়; প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে মিনিটে ৭৮-৮২ বার—এটাও জিরেন অবস্থায়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, মায়েদের ধুকপুকুনি বাবাদের চেয়ে বেশি—জিরিয়ে থেকেও! জোরালো ব্যায়ামের সময়ে পালস্ রেট বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় মিনিটে দুশ বার।

প্রশ্ন : ফুসফুসে রক্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার নল কত আছে?

মা : তিরিশ হাজার কোটি ক্যাপিলারি—ক্ষুদে রক্ত বওয়া নলকে বলে ক্যাপিলারি। একটার পেছনে একটা জুড়লে লম্বায় দাঁড়াবে ২৪০০ কিলোমিটার।

প্রশ্ন : কত জল আছে এই শরীরে?

মা : বড়দের শরীরে থাকে ৪৫ লিটার—শরীরের ওজনের ৬৫ শতাংশ। জলের শরীর বলতে পারিস।

প্রশ্ন : খাবার হজম করায় কে?

মা : পাকস্থলির হজমি অ্যাসিড—দারুণ কড়া অ্যাসিড—দস্তাও গলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পাকস্থলির আস্তরণ এত তাড়াতাড়ি নতুন করে নিজেকে বানিয়ে নেয় যে, আস্তরণকে ক্ষইয়ে দেওয়ার সময়ই পায় না জাঁদরেল অ্যাসিড। মিনিটে ৫০০০ কোটি কোষ তৈরি হচ্ছে পুরোনো কোষদের জায়গায়—তিনদিন অন্তর নতুন হয়ে যাচ্ছে পাকস্থলির আস্তরণ।

প্রশ্ন : কিডনি কি শরীরের ফিলটার?

মা : জানিস তাহলে! প্রায় দশ লক্ষ ছাঁকনি আছে দুটো কিডনির প্রত্যেকটাতে। মিনিটে ১·৩ লিটার রক্ত ছেকে দিচ্ছে দুই কিডনি হাতে হাত মিলিয়ে। রক্ত থেকে নোংরা আলাদা করে দিয়ে পেচ্ছাবের সঙ্গে বের করে দিচ্ছে দিনে প্রায় ১·৪ লিটার হিসেবে।

প্রশ্ন : এক মিনিটে কত রক্ত যায় ফুসফুসে?

মা : শরীরের সমস্ত রক্ত—প্রায় সাড়ে চার লিটার—ফুসফুস ধুইয়ে যায় মিনিটে মিনিটে। মানুষের লাল রক্ত কণিকা বানিয়ে দেয় হাড়ের মজ্জা—সেকেণ্ডে প্রায় ১২ লক্ষ। প্রতিটির আয়ু ১০০-১২০ দিন। সারা জীবনে হাড়ের মজ্জা বানায় প্রায় আধ টন লাল কণিকা।

প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় দেহযন্ত্র কে, মা?

মা : চামড়া। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় কুড়ি বর্গ ফুট জায়গা জুড়ে থাকে; প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় তা সতেরো বর্গফুট। অর্থাৎ মেয়েদের গায়ের চামড়া একটু কম! চামড়ার খোসা উঠে যাচ্ছে সবসময়েই—স্তরে স্তরে চলে যাচ্ছে—কিন্তু তার জায়গায় অবিরাম নতুন চামড়ার চালান দিয়ে যাচ্ছে নতুন টিস্যু। প্রায় ৫০ দিন অন্তর। গড়ে, প্রতি মানুষ সারা জীবনে ১৮ কিলোগ্রাম চামড়া ফেলছে এইভাবে। বলা যায়, খোলস ত্যাগ করছে ৫০ দিনে একবার—সারাজীবনে ১৮ কিলো!

প্রশ্ন : মানুষের সবচেয়ে ছোট পেশি কোথায় থাকে, মা?

মা : কানে। এক মিলিমিটারের চেয়ে সামান্য বেশি লম্বা। এই কানেই এমন একটা জায়গা আছে—যেখানে রক্ত বওয়া নল একটাও নেই—অথাৎ সেখানে রক্ত যায় না। এরকম জায়গা শরীরের আরও আছে—রক্তের চলাচল সেসব জায়গায় নিষেধ। সুতরাং শরীর পুরোপুরি রক্তময়—এ ধারণা ভুল। রক্তহীন জায়গাও আছে বৈকি। ভেতরের কানের কোষগুলো অবিরাম রসনিষিক্ত হয়ে থাকে--রক্তের বদলে। কেন? শব্দের কম্পন এখানে স্নায়ু তাড়নায় রূপান্তরিত হয়। নইলে যে শরীরের নিজেরই কানে-তালা-ধরানো ধুকপুকুনির আওয়াজে কালা হয়ে যাবে স্পর্শ সচেতন স্নায়ুগুলো।

প্রশ্ন : ঘুমিয়ে থেকে লম্বা হই একদিন বলেছিলে—কতখানি?

মা : ৮ মিলিমিটার—রাতে ঘুমোনোর সময়ে—পরের দিনই বেঁটে হয়ে ফিরে যাস ঘুমোনোর আগের হাইটে। সারাদিনে যতবার বসছিস, দাঁড়াচ্ছিস—শিড়দাঁড়ার কার্টিলেজ চাকতিগুলো স্পঞ্জের মত চেপেচুপে থাকছে মাধ্যাকর্ষণের জন্যে। রাতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেই, চাপ চলে যাচ্ছে—চাকতিরা ফের ফুলে উঠছে। এই কারণে লম্বা মহাকাশ ভ্রমণ সেরে আসার পর মহাকাশচারীরা সাময়িকভাবে দু-ইঞ্চি লম্বা হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : শরীরে নাকি চুনকাম করার জিনিসও আছে?

মা : আছে। রক্ত ছাড়া আছে অনেক কিছু। গড় হিসেবে, একটা ছোট চালাঘর চুনকাম করার মত চুন আছে, ১২·৭ কেজি কোক-কয়লায় যতটা কার্বন থাকে তা আছে, ২২০০ দেশলাই কাঠি বানানোর বারুদের ফসফরাস আছে, প্রায় এক চামচ গন্ধক আছে, ২৫ মিলিমিটার লম্বা একটা পেরেক বানানোর মত লোহা আছে —আর আছে প্রায় ৩০ গ্রামের মত অন্য সব ধাতু।

প্রশ্ন : চোখের পেশিকে কত মেহনত করতে হয় মা?

মা : চোখের যে পেশি ফোকাস করার কাজের জন্যে মোতায়েন, তার নড়াচড়া ঘটে সারাদিনে এক লক্ষ বার। পায়ের পেশিকে এই ব্যায়ামে রপ্ত করাতে গেলে তোকে হাঁটতে হবে সারাদিনে ৮০ কিলোমিটার।

প্রশ্ন : চোখের পর্দা কত বড়?

মা : রেটিনা বা অক্ষিপটের সাইজ তো মোটে এক বর্গ ইঞ্চি। কিন্তু এইটুকু জায়গাতেই আছে ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ আলোক-সচেতন কোষ : সাদাকালো দৃশ্য দেখবার জন্যে ১৩ কোটি 'রড' কোষ; রঙিন দৃশ্য দেখবার জন্যে ৭০ লক্ষ শঙ্কু কোষ।

প্রশ্ন : সারা জীবনে একজন মানুষ কত খায়, মা?

মা : গড়ে সাহেব-মেমরা খাবার খায় ৫০ টন, জল আর তরল জিনিস খায় ৫০,০০০ লিটার। দিশি লোকদের পেটের সাইজ নিশ্চয় কম নয়—কিন্তু অত খাবার আছে কিনা। সন্দেহ।

প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিকরা কি বলতে পারেন, বড় হয়ে কে তালঢ্যাঙা হবে, কে স্পোর্টসম্যান হবে, কে পালোয়ান হবে, অথবা কে ক্রিমিন্যাল হবে?

মা : ক্রোমোসোম বিচার করে তা বলা যায়। খুব ছোট্ট সুতোর মত এই ক্রোমোসোম থাকে দেহ-কোষের কেন্দ্রীনে। মানুষের কোষে থাকে ৪৬টা। ক্রোমোসোমদের মধ্যে ভারসাম্য যদি অস্বাভাবিক হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় পাঁচমিশেলি বৈশিষ্ট্য। যেমন, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কিছু সোভিয়েত খেলোয়াড় মেয়ের ক্রোমোসোম প্যাটার্ন অস্বাভাবিক রকমের—xxy; সোজা কথায়, একটা বাড়তি পুরুষ y ক্রোমোসোম পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। তাই তাদের শরীরে আসে বাড়তি শক্তি। যে পুরুষের ক্রোমোসোম প্যাটার্ন xyy—তাদের

এই y ক্রোমোসোম ফাউ হিসেবে চলে আসে বলে তারা আর পাঁচজনের চেয়ে হয় বেশি ঢ্যাঙা, বেশি রোখা। আমেরিকার গবেষণায় দেখা গেছে, এই ধরনের অস্বাভাবিক ক্রোমোসোম প্যাটার্ন নিয়ে যে পুরুষ জন্মায়—ক্রাইমের দিকে সে ঝুঁকতে পারে।

প্রশ্ন : লম্বা হওয়াটা তাহলে স্রেফ জন্মগত? নিজেদের চেষ্টায় হওয়া যায় না?

মা : প্রথম ধারণাটা ভুল। খাওয়ার ওপর কিছুটা নির্ভর করে। যেমন, বিলিতি খাবার জাপানিদের বাড়-এর ছক পাল্টে দিয়েছে। ১৯০০ সালে ১২ বছরের জাপানি ছেলেমেয়েদের গড় উচ্চতা ছিল ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি। বিলেত আমেরিকার প্রভাবে এল নাটকীয় পরিবর্তন। জাপান থেকে যে ছেলেমেয়েরা আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, তারা খেত বেশি প্রোটিন—বেশির ভাগই মাংস। ১৯৫৭ সালে দেখা গেল ওই বয়েসের জাপানে থাকা ছেলেমেয়েদের চাইতে এরা হয়েছে বেশি লম্বা। ১৯৭০ সালে কিন্তু জাপানে থাকা ছেলেমেয়েরা আমেরিকায় থাকা জাপানি ছেলেমেয়েদের মতো খাওয়ার অভ্যেস রপ্ত করে নিয়েছিল। আজকের জাপানি মেয়ে-পুরুষরা যথাক্রমে গড়ে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি আর ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা—ব্রিটেন আর আমেরিকানদের চেয়ে সামান্য খাটো। সুতরাং, বেঁটে জাপানি—একথা তার বলা যায় না।

প্রশ্ন : শরীরে কত চুল আছে মা?

মা : গড়ে মেয়ে আর পুরুষের সারা শরীরে থাকে ৫০ লক্ষ চুল। একদম চুল থাকে না ঠোঁটে, হাতের তালুতে, পায়ের চেটোয়, আঙুলের পাশে আর ডগায়। যদিও গোড়ার ওপর থেকে সব চুলই মরা, মাথার প্রায় এক লাখ চুল প্রতি মাসে বাড়ে দশ মিলিমিটার হারে—গরমকালে বাড়ে সামান্য বেশি। কাটলে চুলের বাড় কমেও না—বাড়েও না। রোজ ১০০টা পর্যন্ত চুল পড়ে প্রত্যেকেরই—যদিও ছ' বছর পর্যন্ত চুল থেকে যেতে পারে নিজের জায়গায়। আচমকা শক্ রাতারাতি চুল সাদা করে দেয়—এটা ভুল ধারণা; আসলে শক্ খসিয়ে দেয় সাদা ছাড়া অন্য রঙের চুল—সাদা চুল তখন আর ঢাকা পড়ে থাকে না বলেই চোখে লাগে।

প্রশ্ন : মরা মানুষের চোখ ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখা হয় কেন, মা?

মা : চোখের কর্নিয়ায় রক্ত বওয়া নল থাকে না। খারাপ কর্নিয়া কেটে ফেলে দিয়ে সে জায়গায় মরা মানুষের ভালো কর্নিয়া বসিয়ে দেওয়া যায়। রক্ত বওয়া নল নেই বলে সাদা রক্ত কণিকা তেড়ে এসে আগন্তুক টিস্যুর ওপর হামলা জুড়তে পারে না—চোখ ফিরে পায় চোখ হারা মানুষ।

প্রশ্ন : জন্তুদের শরীরের অংশ মানুষের শরীরে বসানো যায় না?

মা : যায়। এ-ব্যাপারে শুয়োর মানুষের সেরা বন্ধু। শুয়োরের হার্ট ভালভ্ মানুষের অকেজো হার্ট ভালভের জায়গায় বসানো যায়—হঠাৎ দরকারে নিদারুণ পুড়ে যাওয়া চামড়া পাল্টে শুয়োরের চামড়াও বসিয়ে দেওয়া যায়। তার কারণ কেমিক্যাল কম্পোজিশনের দিক দিয়ে শুয়োরের টিসু মানুষের টিস্যুর কাছাকাছি—অন্য জন্তুর ক্ষেত্রে তা নয় বলে তাদের শরীরের অংশ কেটে এনে আমাদের শরীরে বসালে আমাদের শরীরের বডিগার্ডরা তা খারিজ করে দেয়।

প্রশ্ন : বডি টেম্পারেচার কি এক-এক জায়গায় এক-এক রকম?

মা : মুখে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখি বলে? বগলে দিলে তো এক ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়। মুখের চাইতেও এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি দেখা যায় শরীরের আর একটা অংশে।

প্রশ্ন : হেঁচকি ওঠে কেন মা?

মা : বুকের গহ্বর আর উদরের মাঝে পেশি দিয়ে তৈরি যে পার্টিশন আছে, তাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম। এই ডায়াফ্রাম আর পাঁজরাদের মাঝে মাঝে থাকা পেশি আচমকা কুঁচকে গেলেই হেঁচকি ওঠে। ফলে, হুট করে দম নিয়ে বাতাস নিতে হয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে—ঠেকিয়ে রাখা যায় না—কিন্তু সেই বাতাস ফুসফুসে পৌঁছোতে পারে না, কেননা পেশিতে দমকে দমকে খিঁচ ধরছে বলে বাতাসের নল বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত এই স্প্যাজম্ মিনিট কয়েক ধরে হয়েই চলে যায় আবার ফিরে আসে। ঠাকুমা দিদিমারা তখন একটু একটু করে ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দেন, দম বন্ধ করে থাকতে বলেন। এর ফলে ফুসফুসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনে—উইণ্ড পাইপ খুলে যায়। চার্লস অসবর্ন নামে এক আমেরিকান ১৯২২ সালে শুয়োর মারবার সময়ে হেঁচকি তোলা শুরু করেন—১৯৮৪ পর্যন্ত খবরে জানা গেছে, তখনও তিনি হেঁচকি থামাতে পারেননি—৬২ বছর ধরে তুলে গেছেন ৪৩ কোটি হেঁচকি! ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।

প্রশ্ন : লজ্জায় মুখ লাল হয় কীভাবে?

মা : মেয়েরাই মুখ লাল করে ছেলেদের চেয়ে। লজ্জা পেলে অথবা আত্ম-সচেতন হয়ে গেলেই—মগজ থেকে স্নায়ু সঙ্কেত গিয়ে একটা শক্তিশালী কেমিক্যালকে রক্তে মিশিয়ে দেয়; এর নাম পেপটাইড। মুখ, ঘাড় আর বুকের ওপর দিকের চামড়ার ছোট ছোট রক্ত বওয়া নলগুলোকে প্রসারিত করে পেপটাইড—তখন বেশি রক্ত ছুটে যায় সেই-সেই জায়গায় মুখ লাল তো হবেই।

প্রশ্ন : হাঁচি কেন?

মা : আগন্তুক বস্তুকণা বা গ্যাস নাকের স্নায়ুপ্রান্তে বিরক্তি জাগালেই শরীরের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে তাদের গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করা: এরই ফল হাঁচি। কাশির সময়ে যা হয়, দম নিতেই হয় হাঁচবার আগে—স্নায়ুদের কাজ তাই। উইণ্ডপাইপের মাথায় 'গ্লটিস' বন্ধ করে দেয় 'ল্যারিঙক্স'—ফলে, চাপ বাড়তে থাকতে ফুসফুসে। তারপরেই 'গ্লটিস' খুলে যায়—বিস্ফোরকের বেগে নাক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে মিউকাস আর বস্তুকণাকে বের করে দেয় এক ধাক্কায়—ঘন্টায় ১০০ মাইলেরও বেশি বেগে যা ঘটতে পারে।

প্রশ্ন : কাশবার সময়ে কী ঘটে, মা?

মা : হাঁচির মতই বিস্ফোরক বাতাস ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে বিরক্তিকর বিদেশি বস্তুকে অথবা জমে-থাকা মিউকাসকে এক ঝটকায় বের করে ফুসফুসের প্রধান বায়ুপথ থেকে।

প্রশ্ন : কাটাকুটি মেরামত হয় কীভাবে?

মা : সামান্য কাটা থেকেও রক্ত ঝরে গিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে—কিন্তু শরীর মহাশয় রক্ত বন্ধ করার বন্দোবস্ত করে রেখেছে নিজে থেকেই। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জুড়ে দেয় ক্ষত মুখ। কী ভাবে? প্রথমেই রক্তের ক্ষুদে কোষ প্লেটলেট-রা গুঁতোগুঁতি করে ক্ষত মুখে ছিপি বানিয়ে নেয় নিজেদের দেহ দিয়ে। সেই সঙ্গে সেরোটোনিন নামে একটা কেমিক্যাল ছেড়ে দেয় যাতে ছিড়ে যাওয়া রক্তবহা নলগুলোর মুখ সরু হয়ে গিয়ে বেশি রক্তপাত ঘটাতে না পারে। একই সঙ্গে জখম রক্তবহা নলগুলোর গা থেকে থমবোপ্লাসটিন নামে আর একটা কেমিক্যাল বেরিয়ে এসে ফাইব্রিন নামে সুতো-সুতো প্রোটিন বানিয়ে চটচটে জালের আকারে লাল কোষদের ফাঁদে ফেলে আরও স্থায়ী ডেলা তৈরি করে ক্ষত মুখ আটকে দেয়।

প্রশ্ন : নাক ডাকার আওয়াজ কত বেশি হতে পারে?

মা : ৬৯ ডেসিবেল পর্যন্ত তো বটেই—একটা নিউম্যাটিক ড্রিল চালালে যা আওয়াজ হয়, প্রায় তার সমান। মুখবিবরের নরম ছাদ আর টনসিলের পেছনকার ঢালু তালু কাঁপে বলেই বিতিকিচ্ছিরি এই আওয়াজটা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, নাক তখন বন্ধ থাকে—মুখ দিয়ে চলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ। চিত হয়ে শুলেই যে সবসময়ে নাক ডাকবে, তা নাও হতে পারে। নাসিকা গর্জন স্তব্ধ করার সেরা পদ্ধতি হল, নাক-ডাকিয়েকে অন্য পজিসনে শুইয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন : চামড়া কি মানুষের বর্ম?

মা : বটেই তো। আরও বেশি। শরীরে তৈরি উত্তাপের ছ-ভাগের পাঁচ ভাগ বেরিয়ে যায় চামড়ার ফুটো দিয়ে। ফুটোগুলো যদি বন্ধ থাকে, তাপ আর ঘাম বেরোতে পারবে না এবং ফল মৃত্যু। ফুটোরা কিন্তু একমুখো—বেরোতে দেয়, ঢুকতে দেয় না। চামড়ার বাইরের দিকটা ওয়াটার প্রুফ হয়ে থাকে সিবেসাস গ্ল্যাণ্ডদের তেলতেলে বস্তুর দৌলতে। এই চামড়াই দু-রকম কাজ দেখায় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ছোঁয়ায়। রশ্মির সঙ্গে এরগোসটেরল নামে একটা জিনিস মিশিয়ে দিয়ে ভিটামিন D বানিয়ে নেয়। একই সঙ্গে বানিয়ে নেয় কালো রঙ মেলানিন—যাতে অতিরিক্ত অতিবেগনি বিকিরণে নিজে জ্বলে না যায়—রোদে ঝলসালে রঙ কালচে মেরে যায় এই কারণেই।

প্রশ্ন : নাড়িভুঁড়ির কেরামতিটা কী রকম?

মা : খাবার যেখানে হজম হয়, তার নাম ক্ষুদ্রান্ত। শরীর থেকে তাকে টেনে বের করে মেলে ধরলে লম্বায় হবে ২২ ফুট। তার ভেতরকার ঢেউ-ঢেউ সবকটা অংশকে চ্যাপ্টাভাবে বিছিয়ে দিলে জায়গা নেবে ৩৬০ বর্গগজ। শরীরের ভেতরে কিন্তু এলাহি এই ব্যাপার-স্যাপার গুটিয়ে থাকে ঠিক আট ফুটের মধ্যে—কনসাটিনো বাদ্যযন্ত্রের মত। ক্ষুদ্রান্তের মূল যা কাজ—খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিন শুষে নেওয়া—তা ঘটে ক্ষুদ্রান্তের খুবই অল্প জায়গার মধ্যে—বিশাল অঞ্চল কাজেই লাগে না। রোগে পড়লে ক্ষুদ্রান্তের কিছুটা যদি কেটে বাদ দেওয়া হয়—বাকি অংশ কাজ চালিয়ে যায় আগের মতই।

প্রশ্ন : টনসিল পাকলে কাটতে দাও না কেন?

মা : আগে ধারণা ছিল, টনসিলই বুঝি যত রোগের ডিপো। তাই ঘচাঘচ কেটে বাদ দেওয়া হত। এখন জানা গেছে, টাটানো টনসিল কারও মৃত্যু ঘটিয়েছে, এমন নজির নেই। উল্টে, টনসিল আর অ্যাডেনয়েড—শরীরের এই দুটো অংশই রোগের প্রকোপ থেকে শরীর রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে জন্ম থেকেই। নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়ে আর খাবারের সঙ্গে যদি ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট বা অ্যালার্জি-করার বস্তু ঢুকে পড়ে—এদের নিজেদের কিছু কোষের বিশেষ অ্যান্টিবডিদের লেলিয়ে দেয় আততায়ীদের দিকে; আরও কিছু কোষ গিলে নেয় হানাদারদের।

প্রশ্ন : ফুসফুসের কেরানির কথা বলবে?

মা : ফুসফুস তো নিছক ফুলো থলি নয়—বড় জটিল তার গড়ন। ৩০ কোটি বাতাসের থলি আছে সেখানে—রক্ত এই সব জায়গা থেকে টেনে নেয় অক্সিজেন। থলিগুলোকে চ্যাপ্টা করে বিছিয়ে দিলে জায়গা নেবে ১২০ বর্গগজ—ডাবলস্ টেনিস কোর্টের প্রায় আধখানা। ফুসফুসকে ফোলানো ভারি সোজা—খেলনা বেলুন ফোলানোর চাইতে ১০০ গুণ সোজা। ফুসফুসের মাত্র ১৪ শতাংশ বাতাস পাল্টে যায় এক-একটা শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে।

প্রশ্ন : মেঘলা দিনে কি চামড়া জ্বলে যায়?

মা : নিশ্চয়। ৮০ শতাংশ অতিবেগুনি রশ্মি মেঘ ফুঁড়ে নেমে আসে।

প্রশ্ন : অক্সিজেন কি কখনো বিষের কাজ করতে পারে?

মা : পারে। বায়ুমণ্ডলের চাপের আড়াই গুণেরও বেশি খাঁটি অক্সিজেনে শ্বাস-প্রশ্বাস চালালে তা বিষের কাজ করবে। এই কারণেই গভীর জলের ডুব সাঁতারুরা খাঁটি অক্সিজেনের বদলে সঙ্গে নেয় চেপেচুপে রাখা বাতাস—যার মধ্যে অক্সিজেন থাকে বিশ শতাংশ। অথবা বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে হিলিয়াম নামে একটা গ্যাস।

প্রশ্ন : অতি-শক্তির জোগান কে দেয়, মা?

মা : নাম তার অ্যাড্রেনালিন—একটা হরমোন। শরীরে-মনে চাপ পড়লে স্বাভাবিক সীমার বাইরে বাড়িয়ে দেয় মানুষের শক্তি। ১৯৬০ সালের ২৪ এপ্রিল আমেরিকায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওইদিন একটি ছেলের ওপর ১·৬ টন ওজনের একটা গাড়ির জ্যাক ভেঙে চেপে বসেছিল। তার মা আতঙ্কে এক ঝটকায় ছেলের বুকের ওপর থেকে টেনে তুলেছিল অত ভারি গাড়ি। মাত্র ৫৫·৮ কেজি যাঁর ওজন—এই অতিশক্তি আচমকা এসে গেছিল তাঁর শরীরে—শিরদাঁড়ার খানকয়েক হাড়ে চিড় ধরে গেছিল—কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ধেয়ে আসা হরমোন তাকে অলিম্পিক ওয়েটলিফটারের মতই পালোয়ান বানিয়ে ছেড়েছিল।

প্রশ্ন : সব ব্যাকটিরিয়াই কি মানুষের শত্রু?

মা : না। মানুষ কখনোই একা নয়, কোটি কোটি পোকা পুষে রেখেছে নিজের শরীরে—এদের বেশির ভাগ ব্যাকটিরিয়া। ৬০ কোটিরও বেশি ব্যাকটিরিয়া থাকে শুধু চামড়ায়, মুখের লালায় আর পেটের হজম করার ব্যবস্থার নিচের অংশে। এ ছাড়াও, বেশ কয়েকটা ফাঙ্গাস, একটা ভাইরাস, আর মাকড়শার মত এক ধরনের পুঁচকে পোকা থাকে রীতিমত স্বাস্থ্যবান মানুষেরও শরীরে। পেটের ব্যাকটিরিয়া যতক্ষণ পেটেই থাকে—কারো ক্ষতি তো করেই না, উল্টে রোগের ঘটক জীবাণু দৈবাৎ গিলে ফেললে তাদের আর বাড়তে দেয় না। সাধারণত মাংসে যে ভিটামিন B_{12} পাওয়া যায়—গাছপালা থেকে তা বানিয়ে নেয় কিছু ব্যাকটিরিয়া। রক্তের কোষ বানাতে কাজে লাগে এই ভিটামিন।

প্রশ্ন : চামড়ায় কারা থাকে?

মা : চার প্রধান গ্রুপের ব্যাকটিরিয়া—শরীরের প্রায় সব জায়গায়। বৈজ্ঞানিকদের কাছে এদের নাম: ১) কর্নিব্যাকটিরিয়া—এদের মধ্যে আছে কর্নিব্যাকটিরিয়া এক্‌নিস, যা থেকে হয় ব্রন; ২) মাইক্রোকক্‌কাই; ৩) স্ট্রেপটোকক্‌কাই; আর ৪) কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া।

প্রশ্ন : নিরীহ ব্যাকটিরিয়ারা চামড়ার কোন কোন জায়গায় থাকে?

মা : বগলে আর কুঁচকিতে। এদের নাম: ১) কোঅ্যাগুলেস নেগেটিভ স্ট্যাফাইলোকক্‌কাই; ২) গ্রাম পজিটিভ কক্‌কাই; ৩) ডিপথেরয়েড্‌স্‌। বগলের চামড়ার প্রতি বর্গমিলিমিটারে থাকতে পারে ৮০০ ব্যাকটিরিয়া। অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৫,১৬,০০০। হাতের সামনের দিকের মত শুকনো জায়গায় প্রতি বর্গমিলিমিটারে থাকে প্রায় ২০টা ব্যাকটিরিয়া—অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৩,০০০।

প্রশ্ন : মুখের লালায়?

মা : কম পক্ষে ছ-ধরনের ব্যাকটিরিয়া থাকে মুখের লালায়—এদের কেউ কেউ দাঁতের পাথরি, দাঁতের ক্ষয় আর মাড়ির রোগের জন্যে দায়ী। এদের নাম: স্ট্রেপটোকক্‌কাই; কর্নিয়া ব্যাকটিরিয়া; ফিউসোব্যাকটিরিয়া;

নাইসেরিয়া; ব্যাসিলাই; আর স্পাইরোচেট্স্।

প্রশ্ন : খাবার হজম হচ্ছে যেখানে, সেখানে?

মা : সে জায়গাটার নাম বৃহদন্ত্র। এখানে আছে এই কটা টাইপের ব্যাকটিরিয়া: কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া—বিশেষ করে এস্চেরিচিয়া কোলাই; ব্যাকটিরয়েডস্; ল্যাকটোব্যাসিলাই ক্লসট্রিডিয়া; আর স্ট্রেপটোকক্কাই। বৃহদন্ত্রে এরা যতক্ষণ আছে, কোনো ক্ষতি করছে না। কিন্তু ঠাঁইনাড়া হলেই করবে। যেমন, আলসার হলে, বা অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেলে শরীরের অন্য জায়গায় ছিটকে গিয়ে পেরিটোনাইটিস ঘটিয়ে ছাড়বে—যার মানে উদর-গহ্বরের জ্বালাযন্ত্রণা আর স্ফীতি। এছাড়াও ঘটাবে ব্লাড পয়জনিং আর ইউরিনারি ইনফেকশন।

প্রশ্ন : চামড়ায় ফাঙ্গাস থাকে না?

মা : অবশ্যই থাকে। সাধারণত তিন ধরনের 'ঈস্ট' থাকে চামড়ায়। প্রধানত বুকে আর পিঠে ম্যালাসেজিয়া ফারফার। ক্যানডিডা অ্যালবিকান্স্ থাকে প্রধানত পায়ের আঙুলের ফাঁকে—মুখেও থাকে, যার ফলে হয় শিশুদের গলার রোগ 'থ্রাশ'। মাথায় থাকে প্রধানত ট্রাইকোসপোরা বেইজলি। এই 'ঈস্ট'রা নিজেরাই কিন্তু ফাঙ্গাস। এ ছাড়াও আরও দু-ধরনের ফাঙ্গাস থাকে চামড়ায়—ট্রাইকোফাইটন আর মাইক্রোসপোরাম। এদের জন্যেই হয় দাদ আর হাজা।

প্রশ্ন : মাকড়সার মত পোকা থাকে কোথায়?

মা : চুলের গোড়ার থলিতে—যে গর্তয় থাকে চুলের শেকড়। বেশির ভাগ পুরুষের মুখের সিবেসাস গ্ল্যাণ্ডেও থাকে। মাকড়সা ফ্যামিলির এই ক্ষুদে পোকাদের নাম ডেমোক্লেক্স ফলিকিউলোরাম।

প্রশ্ন : ভাইরাসের ঘাঁটি কোথায়?

মা : নাম তার হারপিস সিমপ্লেক্স—৯০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নার্ভ ফাইবারে জাঁকিয়ে বসে থাকতে পারে শুধু এই ভাইরাসই। এমনিতে চুপচুপ, কিন্তু যার শরীরে বাসা বেঁধে আছে, তার স্বাস্থ্য খারাপ হলেই মাথাচাড়া দেয়—জঘন্য ঘা বানায় ঠোঁটে। গায়ে বেশি রোদ লাগলেও এইরকম ঘা মাথা চাড়া দেয়।

প্রশ্ন : বাবা আর মায়ের চেহারা ছেলেমেয়েরা পায় কোন নিয়মে?

মা : বাবা আর মায়ের শরীরের যা-যা বৈশিষ্ট্য, সেগুলোকে দুভাগে ফেলেছেন বৈজ্ঞানিকরা; ডমিনান্ট আর রিসেসিভ। ছেলেমেয়েদের শরীরে ডমিনান্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি; যাওয়ার সম্ভাবনা যেগুলোর কম, তাদের বলা হয় রিসেসিভ বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন : ডমিনান্ট বৈশিষ্ট্য কোনগুলো মা?

মা : কোঁচকানো চুল, কালো চুল, যে-চুল লাল নয়, চামড়ার স্বাভাবিক রঙ, বাদামী চোখ, খারাপ দৃষ্টিশক্তি, পুরু ঠোঁট, খাটো আকৃতি, নাভাস ভাব, A অথবা B ব্লাড গ্রুপ, রেসাস পজিটিভ ব্লাড।

প্রশ্ন : রিসেসিভ বৈশিষ্ট্যগুলো?

মা : সিধে চুল, হাল্কা চুল, লাল চুল, বেশি সাদাটে চুল, চামড়া আর লালচে চোখ, নীল অথবা ধূসর চোখ, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি, পাতলা ঠোঁট, ছোট চোখ, লম্বাটে আকৃতি, শান্ত ভাব, O ব্লাড গ্রুপ, রেসাস নেগেটিভ ব্লাড।

ফ্যাশন

প্রশ্ন : ‘কসমেটিকস্’ শব্দটা কোত্থেকে এল মা?

মা : মেয়েদের রূপচর্চায় গন্ধদ্রব্যের ব্যাপারে খুব নাম করেছিলেন গ্রীক গন্ধবিজ্ঞানী ‘কসমাস্’। ‘কসমেটিকস্’ তাঁর নাম থেকে এসেছে, না গ্রীক শব্দ ‘কসমেটিকস্’ থেকে এসেছে—তা ভাবার বিষয়।

প্রশ্ন : গন্ধদ্রব্য কি আদিম যুগেও ছিল?

মা : আদিম যুগে গন্ধদ্রব্য বলতে সুগন্ধিত ফুল ছাড়া কিছু ছিল না। ফুল দিয়েই সাজগোজ করত মেয়েরা। এ রেওয়াজ এখনো আছে আদিবাসীদের মধ্যে।

প্রশ্ন : সাজগোজে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয় কবে?

মা : সভ্যতার সূচনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই বলা যায়। পিরামিডে শুনো সুগন্ধ-দ্রব্য পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০ সালে নীল উপত্যকার মিশরীয় রাখাল আর শিকারীরা রেড়ির তেল গায়ে মাখত রোদের আঁচ থেকে চামড়া বাঁচানোর জন্যে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ সালে মিশর আর মেসোপটেমিয়ার মেয়েরা রাঙা চরণ আর রাঙা হাতের জন্য শরণ নিত হেনা-র রঞ্জকপদার্থের। Kohl দিয়ে চোখের পাতায় ছায়া রচনা করত যাতে উটকো বিপদ ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে। Kohl তৈরি হয় ধূসর খনিজ সিসে, কালো অ্যান্টিমনি আর উজ্জ্বল সবুজ ম্যালাকাইট থেকে। আজকের দিনে একে Eye Shadow বলা হয়। এই মিশরেরই রানী নেফারতিতি চুনি রঙে রাঙিয়ে নিতেন হাত আর পায়ের নখ—রাজপরিবার ছাড়া সাধারণের কাছে নিষিদ্ধ ছিল সেই রঙ। মিশরের আর এক রানী ক্লিওপেট্রা গাল রাঙাতেন হলদেটে লাল প্রাকৃতিক ফেরিক অক্সাইড দিয়ে; চোখের ওপরের পাতায় দিতেন নীলচে-কালো রঙ, নিচের পাতায় সবুজ রঙ। সিসের ব্যবহারে গ্রীক মেয়েরাও পেছিয়ে থাকেনি। সিসের গুড়ো দিয়ে চামড়াকে করত সাদা—চুলকে কালো। এ-সবই খ্রিস্টপূর্ব সময়ের কথা।

প্রশ্ন : ‘কসমেটিকস্’ সম্পর্কে প্রথম বই কে লিখেছিলেন?

মা : তাঁর নাম ওভিড—রোমের কবি। লিখেছিলেন ১০ খ্রিস্টাব্দে। চামড়া মসৃণ রাখার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন যবের ময়দা, ডিম আর নারসিসাস ফুলের কুঁড়ি। একসঙ্গে মিশিয়ে চটকে নিয়ে গায়ে মাখতে হত।

রোমের সম্রাটও পেছিয়ে থাকেননি রূপচর্চায়।

প্রশ্ন : রূপচর্চায় রোম সম্রাট? তিনি কে, মা?

মা : নিরো। সম্রাজ্ঞীকেও শিখিয়েছিলেন কীভাবে সিসে আর খড়ির গুঁড়ো দিয়ে মুখ সাদা করতে হয়, কীভাবে গাল রাঙাতে হয়, কোল দিয়ে ছায়াময় চক্ষু রচনা করতে হয়। সালটা মনে রাখিস—৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

প্রশ্ন : কোল্ড ক্রিমের ফুরমুলা জানতেন না?

মা : ২০০ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন জল, মৌ-মোম আর অলিভ তেল মিশিয়ে বানিয়েছিলেন ক্রিম। মুখে ঘষলে জল উবে যেত, মুখ ঠাণ্ডা হত। আজকের কোল্ড ক্রিম বলতে গেলে একই সংমিশ্রণ। রানী এলিজাবেথের রূপচর্চায় ছিল বড় স্বার্থপরতা।

প্রশ্ন : রূপচর্চায় স্বার্থপর ছিলেন রানী এলিজাবেথ?

মা : সাহেবদের দেশে তিনিই প্রথম রানী যিনি টলটলে পরিষ্কার মুকুরে মুখ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ দিতে চাননি কাউকে। বয়স বেড়েছে, রাজসভায় নিষিদ্ধ হয়েছে মুকুর। ইনিও চুল লাল করতেন, মুখ সাদা করতেন, ভুরুর লোম তুলে ফেলতেন। একশ বছর পরে কিন্তু এক অদ্ভুত রূপচর্চা শুরু হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে।

প্রশ্ন : অদ্ভুত রূপচর্চা?

মা : মেয়েরা মুখে রঙ মেখে তার ওপর কালো তারা, আধখানা চাঁদ আর সূর্য আঁকতো। নিউকাস্‌ল্‌-এর ডাচেস্‌ মুখের ব্রণ আর ধ্যাবড়া দাগ ঢাকবার জন্যে এই ফ্যাশনটা চালু করেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে দেখা গেল-পুরুষরাও পেছিয়ে নেই প্রসাধনের ব্যাপারে। তৈরি হল পাউডার রুম যত্রতত্র।

প্রশ্ন : পাউডার রুম?

মা : শৌখিন ব্রিটিশ মেয়ে পুরুষরা এ ঘরে ঢুকতেন চুল, পরচুলা আর মুখ পাউডারে প্রলিপ্ত করার জন্যে। তারপর এমন একটা সময় এল যখন ব্রিটেনে প্রসাধন ব্যাপারটাই সেকেলে হয়ে গেল। তখন রানী ভিক্টোরিয়ার যুগ। সাদাসিধে থাকাটাই ছিল ভিক্টোরীয় আদর্শ। মজার ব্যাপারটা ঘটল আমেরিকায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। শেক্সপিয়রের বই বেচতে গিয়ে এক ভদ্রলোক সুগন্ধি কারখানা খুলে বসলেন।

প্রশ্ন : শেক্সপিয়র ফেলে সুগন্ধি?

মা : ভদ্রলোকের নাম ডেভিড ম্যাককোনেল। বাড়ি-বাড়ি যেতেন শেক্সপিয়রের রচনাসংগ্রহ বেচতে—ফ্রি দিতেন এক শিশি সেন্ট। কদর বাড়ল কিন্তু সেন্টের—কবির নয়। ধুরন্ধর ম্যাককোনেল অমনি কসমেটিকস্‌ ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন, বাড়ির বউদের দিয়েই বাড়ি-বাড়ি কসমেটিকস্‌ বিক্রি চালিয়ে গেলেন। তিপ্পান্ন বছর পরে তাঁর 'ক্যালিফোর্নিয়ান পারফিউম কোম্পানি'র নাম পাল্টে দিলেন নতুন নাম—অ্যাভন। আজও বিখ্যাত এই কোম্পানি—যার শুরু শেক্সপিয়রের বই বেচতে গিয়ে!

প্রশ্ন : নেল-পালিশ এল কার মাথায়?

মা : আমেরিকানদের মাথায়—১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক-এর দেশজোড়া উৎপাদন। অর্থাৎ নখের পরেই ঠোঁট। প্রসাধন-পাগলামি উদ্দাম হয়ে উঠল। কিন্তু ১৯২০-তে হলিউডে সিনেমা যুগ এসে যেতেই, রূপপালী পর্দায় মেকআপ ম্যানদের সৃষ্টি অপরূপাদের দেখেই খিলেন-ভুরু আর ধনুক-ঠোঁট নিয়ে মেতে উঠল মেমসাহেবরা—উজ্জ্বল রঙের চাহিদাও বাড়ল তখন।

প্রশ্ন : জামাকাপড়ের বাবুয়ানিতে কে সবচেয়ে বেহিসেবী, মা?

মা : একজন আরব রাজকুমারী। প্যারিসের রিজ-এ হয়েছিল একটা ফ্যাশন-শো ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। সিয়াপারেল্লি নামে এক ওস্তাগর পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মসলিন গাউন বানিয়ে ইস্পাতের বর্মমোড়া গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন সেখানে। দাম তার দশ লক্ষ পাউণ্ড। ৫১৬টা হিরে বসানো গাউন। মানানসই দামি জুতো পাওয়া গেল না বলে মডেল মেয়েটিকে খালি পায়েই হাঁটতে হয়েছিল। জমকালো সেই গাউন কিনে নিয়ে যান যে আরব রাজকুমারী—এখনও তিনিই নাকি তাঁর মালিক—বলেছেন সিয়াপারেল্লি।

প্রশ্ন : মানানসই জুতোর অভাবে খালি পায়ে হাঁটতে হল মডেলকে?

মা : বছর তিনেক পরে অবশ্য অভাব মিটিয়ে দিয়েছিলেন নিউইয়র্কের ডিজাইনার ইয়ানতুর্নি। তিন বছর একনাগাড়ে মেহনত করে বানিয়েছিলেন পালক হাল্কা একজোড়া জুতো—তাও এক হাজার ডলার অগ্রিম নেওয়ার পর। খদ্দেরের পায়ের প্লাস্টার ছাঁচ তুলে চামড়ার ভাঁজ আর রেখার সঙ্গে মিলিয়ে বানিয়েছিলেন বিচিত্র সেই পাদুকা। অস্ট্রিচ-পালকের চাইতে বেশি ভারি হয়নি নাকি সেই পাদশ্রী।

প্রশ্ন : শুধু মেয়েদের জামাজুতোর কথা বলছ কেন?

মা : বটে! বটে! আজকে যে ট্রাউজার্স বিপ্লব দেখছিস, এর শুরু উনিশ শতকের গোড়ায়। হাঁটু-কামড়ে ধরা চুড়িদার পায়জামার মত পরিধেয়র বদলে ফ্যাশন-সচেতন পুরুষরা ট্রাউজার্স পরতে শুরু করলেন। রেগে গেলেন রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার। ট্রাউজার্সকে তিনি নাশকতামূলক মনে করেছিলেন—খুব সম্ভব ফরাসি বিপ্লবের চরমপন্থীরা এই পোশাকে অভ্যস্ত ছিল বলে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে বড় বর্বর হুকুম দিলেন আলেকজাণ্ডার—সৈন্যরা যেন সমস্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখে নেয় ভেতরে পুরুষ আরোহীরা ট্রাউজার্স পরে বসে আছে কিনা—দেখলেই ঘ্যাঁচ করে কেটে দেওয়া হোক হাঁটু থেকে পা-দুখানা। ফলে, ঘাঘচ পা বাদ হয়ে গেছিল বিস্তর ট্রাউজার্স-প্রিয় পুরুষের। আর শুনবি?

প্রশ্ন : না। কপাল ভাল মেয়েদের। ফ্যাশনের হিড়িকে পা বাদ যায়নি। তাই না মা?

মা : কিন্তু ভোগান্তি কম হয়নি। ভিক্টোরীয় যুগের মেয়েদের পা দেখানো বারণ ছিল। লোকে ছি ছি করত। আমাদের যেমন ঘোমটা আর বোরখা, ওদের তেমনি পা-ঢাকা টাইট মোজা, আজও ফ্যাশনদুরস্ত মেয়েরা ওইভাবে পা না ঢেকে পথে বেরোয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার মোজা পরে কাপড় নষ্ট করতে বারণ করা সত্ত্বেও নিষেধের তোয়াক্কা রাখেনি বীরাঙ্গনারা। মোজার কাপড় বাজার থেকে উড়ে যাওয়ার পরেও পা দেখানোয় নারাজ মেয়েরা বিশেষ একধরনের মেক আপ লাগিয়েছিল পায়ে। মোজা না পরার গোঁ ধরে কিন্তু বিখ্যাত হয়ে গেছেন তিন অভিনেত্রী।

প্রশ্ন : অভিনেত্রীদের গোঁ? কারা, মা?

মা : প্রথম গোঁ দেখান পর্তুগাল রাজার সহচরী এবং অভিনেত্রী গ্যাবি ডেসলিস্। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মোজা বর্জন করলেন—জার্মানির আত্মসমর্পণ না ঘটা পর্যন্ত আর মোজা স্পর্শ করবেন না। ১৯২০-তে হলিউডের পোলা নেগ্রি দেখালেন তাঁর নগ্ন পাদপদ্ম; ১৯২৬-এ জোয়ান ক্রফোর্ড সন্ধ্যায় মোজাপরা ছেড়ে দিলেন।

প্রশ্ন : মোজা না পরার জন্যে হৈ চৈ হয়নি?

মা : দারুণ রকম হয়েছিল। বিস্তর কথার ঝড়ের পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাশন ম্যাগাজিন 'স্কেচ' লিখেছেন, 'মোজা না পরা সুরুচির পরিচয় নয়, চামড়াকেও কোমল রাখে না।' ১৯৬০-এ মেলবোর্নের মেট্রন-রা ক্ষেপে গিয়েছিল মডেল-মেয়ে শিরম্পটন টুপি, দস্তানা মোজা না পরে সম্মানীয় অতিথির আমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল বলে। তারপরেই ১৯৮৩-তে ওয়েলস্-এর রাজকুমারী তাঁর শুভ্র সুন্দর দুই পায়ে শুধু সোনালি প্রলেপ লাগিয়ে, গেলেন একটা সরকারি খানাপিনার আসরে। রাজপরিবারের এহেন অনুমোদন পাওয়ার পর বিষয়টা নিয়ে আর কেউ মুখ খোলেনি।

প্রশ্ন : গোঁফ রাখার জন্যে কেউ গজরায়নি?

মা : ভিক্টোরীয় পুরুষদেরও নাজেহাল হতে হয়েছিল বৈকি। ১৮৬২-তে হেনরি বাড নামে এক টাকার কুমির উইল করে গিয়েছিলেন, তাঁর দুই ছেলে গোঁফ না রাখলে তবেই সম্পত্তির মালিক হতে পারবে। তার সাত বছর পরেই একজন ব্রিটিশ খাট-নির্মাতা মৃত্যুকালে প্রতি কর্মচারিকে মাথাপিছু দশ পাউণ্ড দিয়ে গেলেন—যদি তাদের গোঁফ না থাকে। ১৯০৪-এ লণ্ডনের রিজেন্ট স্ট্রিটের কাপড়ের দোকানদাররা (গোঁফওলা অথবা মাঝে সিঁথিকাটা) পুরুষদের চাকরি দিতে চাননি। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের অভিনব ফতোয়ার মধ্যে ছিল মিহি চালাকি: During working hours গোঁফ চলবে না!

প্রশ্ন : আজকাল তো চোখের পাতার লোমও নকল! বুদ্ধিটা কার?

মা : একজন আমেরিকান ফিল্ম ডিরেক্টরের। তাঁর নাম ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ। ১৯১৬-তে 'ইনটলারান্স' ছবি তৈরি করার সময়ে অভিনেত্রী সীনা ওয়েন-এর চোখের পাতায় এমন নকল লোম লাগিয়েছিলেন যা আছড়ে আছড়ে পড়ত দুই গালে—বেশ বড় লাগত চোখদুটো। খুব মিহি চুল, মানুষেরই চুল, তার চোখের পাতায় সেঁটে দিয়েছিল একজন পরচুলা নিমার্তা। 'ইনটলারান্স' ছবি সমালোচকদের কাছে কদর পেলেও পয়সা পায়নি— দেনায় ডুবে যেতেন না গ্রিফিথ যদি বুদ্ধি করে পেটেন্ট নিয়ে রাখতেন নকল চক্ষুপক্ষের!

প্রশ্ন : 'জীন্স্'-এর শুরু হল কিভাবে?

মা : ১৮৫০-এ লেভী স্ট্রস নামে একজন জাহাজের পাল নির্মাতার আবিষ্কার বলে মনে করা হয়। ইনি থাকতেন সানফ্রানসিসকো-তে। জীন্স্ নামটা এসেছে gene (অথবা jene) fustion থেকে—এর মানে, ভারি টুইল্ড্ সুতির কাপড়, প্রথমে তৈরি হয় ইটালির জেনোয়া-তে। ডেনিম নামটা এসেছে ফরাসী শব্দগুচ্ছ Serge de Nimes (Serge of Nimes) থেকে।

প্রশ্ন : টুঈড?

মা : দুটো সরল ভুলের জন্যে স্কটল্যাণ্ডের এই কাপড়ের নাম দাঁড়িয়েছে টুঈড। একজন স্কচ তাঁতি কোনাকুনিভাবে বোনা কাপড়—যার নাম twilled—পাঠিয়েছিল লণ্ডনের ব্যবসায়ী জেমস্ লকি-কে ১৮৩২ সালে। স্কটল্যাণ্ডি উচ্চারণে twilled-কে লিখেছিল tweeled। লকি পড়লেন tweed। শেষের এই নামটাই দাঁড়িয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ওরস্টেড?

মা : উলের সুতো থেকে প্রথমে তৈরি হয়েছিল নরফোকের ইংলিশ গ্রাম ওরস্টেড-এ। কিন্তু কোন্ সালে তা কেউ জানে না।

প্রশ্ন : পপলিন?

মা : গোড়ায় ছিল কর্ডেড কাপড়—সিল্ক আর ওরস্টেড দু-রকম সুতো থাকত তাঁতির মাকুর টানা আর পোড়েনে। প্রথম তৈরি হয় ফ্রান্সে ১৭ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অ্যাভিগনন শহরে যাকে বলা হত papa lino অথবা papal city—পপলিন নামটা এসেছে সেই থেকে। সিল্ক বিদায় নিয়েছে অনেকদিন—এখনকার পপলিনে থাকে কটন আর ওরস্টেড।

প্রশ্ন : টুপি নিয়েও কি এমনি কাহিনী আছে?

মা : ইংরেজ ভূস্বামী উইলিয়াম কোক অডার দিয়ে প্রথম বানিয়েছিলেন bowler টুপি শিকারে বেরিয়ে ডালপাতার চোট থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য। দোকানে দাঁড়িয়ে দুবার নেচেছিলেন প্রথম তৈরি টুপির ওপর। বাহাদুর টুপি তাতেও বেঁকেচুরে গেল না দেখে কিনে নিলেন বারো শিলিং দিয়ে। যেহেতু টুপি বানিয়েছিলেন Thomas Bowler নামে এক ভদ্রলোক, টুপির নামও হয়ে গেল Bowler; ১৯৫০ পর্যন্ত বৃটিশ অফিসকর্মীরা বড় ভক্ত ছিল এই ত্যাঁদোড় টুপির। তারপর একই ডিজাইনের টুপি 'ডার্বি' টুপি হয়ে নাম কিনল আমেরিকায়—লর্ড ডার্বি তা মাথায় পড়ে ঘুরে বেড়াতেন বলে।

প্রশ্ন : ফেজ টুপির জন্ম কোথায়?

মা : রেশমি ঝাপ্পা বা টাসেল ঝোলানো লাল টুপি 'ফেজ'-এর গড়ন মাথা চ্যাপ্টা শঙ্কু বা মোচার মতন। মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানদের প্রতীক ছিল এই টুপি। তুরস্কে কিন্তু ফেজ নিষিদ্ধ হয়েছিল মুস্তাফা কামাল-এর আদেশে। ১৯২২-এ সুলতানদের হটিয়ে তিনি পশ্চিমী সভ্যতার জোয়ার এনেছিলেন দেশময়।

প্রশ্ন : অ্যাকটরদের টুপি কখনো ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়নি?

মা : Trilby নাটকের মঞ্চ অভিনয়ে বোহেমিয়ান চরিত্ররা মাথায় দিতেন নরম ফেল্ট হ্যাট—কিনারা চওড়া—চুড়ো তোবড়ানো। টুপির এই স্টাইলের নাম হয়ে গেল trilby—নাটকের হিরোইনের নাম ছিল তাই। জাদুকরের সম্মোহনে গান গেয়ে দেশকে নাচিয়ে বেড়াত মিষ্টি মেয়েটি। আবার পুরুষ টুপি দেখে মেয়েদের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কাহিনীও আছে।

প্রশ্ন : টুপি দেখে অজ্ঞান?

মা : এ ঘটনা ঘটেছিল লণ্ডনে। জেমস্ হিদারিঙটন নামে এক শৌখিন ভদ্রলোক চকচকে, লম্বা 'টপার' হাট মাথায় দিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। ভিড়ের ধাক্কায় জ্ঞান হারিয়েছিল মেয়েরা, হাত ভেঙে গেছিল একটি ছেলের, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আজব টুপিধারী ভদ্রলোক এবং শান্তিভঙ্গের জন্যে জরিমানা দিয়েছিলেন ৫০ পাউণ্ড। কিন্তু এই টুপিই সম্ভ্রান্ত মহলে জায়গা করে নিয়েছে তারপরেই—পরেছেন রাজদূতেরাও।

শব্দ

প্রশ্ন : যে শব্দ শোনা যায় না, তা কি মানুষের ক্ষতি করে, মা?

মা : করে বইকি। এ শব্দকে বলা হয় আলট্রাসোনিক ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ—অর্থাৎ যা বিশ হাজার হার্জ-এর ওপরে—তা কানে শোনা না গেলেও কানের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। কলকারখানায় এই শব্দের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। চুপিসাড়ে শব্দদানব শ্রবণশক্তির বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে। পাওয়ারফুল আলট্রাসোনিকের আওতায় থাকলে তার ধাক্কা গিয়ে পড়ে ব্রেনের আর শিরদাঁড়ার স্নায়ুকোষগুলোয়—তখন বমি পায়, কানের মধ্যে জ্বলুনি আরম্ভ হয়। অথচ কেন যে এমন হচ্ছে, তা ধরা যায় না। আওয়াজ তো শোনা যাচ্ছে না। এই হল অতি-শব্দ দানবের দুশমনি।

প্রশ্ন : অতি-শব্দ দুশমনের পেছনে অতি-মিহি শব্দ দোস্ত লেলিয়ে দিলে হয় না?

মা : অতি-মিহি শব্দ দোস্ত নয়—সে আর এক দুশমন। এ শব্দের নাম ইনফ্রাসাউণ্ড ফ্রিকোয়েন্সি—অথাৎ যা বিশ হাজার হার্জের তলায় থাকে। বেঁটে দানবও বলতে পারিস। মানুষের ব্যালেন্সের সেন্স নষ্ট করে দেয়, ভয়ানক অবসাদ জাগায়, মেজাজ তিরিক্ষে করে দেয়, বমি পায়। বেঁটে শব্দদৈত্য, মানে এই ইনফ্রাসাউণ্ড, যখন সাত হার্জে এসে দাঁড়ায়, তখন তা মিলে যায় ব্রেনের আলফা তরঙ্গের সঙ্গে। ফলে, একমনে কিছু ভাবা যায় না, কাজ করা যায় না। অনেকক্ষণ ধরে তীব্র ইনফ্রাসাউণ্ডের আওতায় থাকলে ইন্টারন্যাল ব্লিডিংও হতে পারে। 'নয়েজ কন্ট্রোল ইন ইনডাস্ট্রি' বইটা পড়লে আরও জানতে পারবি।

প্রশ্ন : হার্জ কী, মা?

মা : এক সেকেণ্ডে একটা পয়েন্ট দিয়ে যতগুলো শব্দের ঢেউ বয়ে যায়, তাকে বলে সেই শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক। আর, এই ফ্রিকোয়েন্সির ঐকিক বা ইউনিটকে বলা হয় হার্জ—যা এক সেকেণ্ডে এক সাইল বা আবর্তনের সমান।

প্রশ্ন : শব্দের বেঁটে দৈত্য আর অতি দৈত্য ছাড়াও তো মেজ দৈত্য আছে?

মা : তাকেই বলা যাক ব্রহ্মদৈত্য—শব্দব্রহ্ম যখন দৈত্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে ব্রহ্মদৈত্যই বলা উচিত। শব্দ যখন চড়া হয়, অসহ্য হয়, শব্দ-যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়—তখন তা Noise হয়ে যায়। নয়েজ-এর বাড়াবাড়ি ঘটলেই শরীর আর মন বিগড়োবেই।

প্রশ্ন : কতটা বাড়াবাড়ি?

মা : সেটা শোনবার আগে, ডেসিবেল কাকে বলে জানতে হবে। ডেসিবেল হল সাউণ্ড লেভেলের ইউনিট। শব্দ মাপবার স্কেল। সবচেয়ে কম যে শব্দ কানে ধরা পড়ে, তাকে ধরা হয় শূন্য ডেসিবেল। এই হিসেবে স্যাটার্ন বুস্টার রকেটের শব্দচাপ ২০০ ডেসিবেল, বুইং-৭০৭ যখন ফুল পাওয়ারে থাকে—তখন তার শব্দ চাপ ১৬০ ডেসিবেল, ৭৫ জন বাদকের অর্কেস্ট্রা ১৪০ ডেসিবেল, মোটর গাড়ি ৮০ থেকে ১০০ ডেসিবেল, সাধারণ কথাবার্তা ৬০ থেকে ৮০ ডেসিবেল, ফিসফিসানি ২০ থেকে ৪০ ডেসিবেল, নিউজপেপার প্রিন্টিং ঘরে ৮৫ ডেসিবেল। রোজ আট ঘণ্টা ধরে হপ্তায় পাঁচদিন হিসেবে ৩০ থেকে ৪০ বছর ৯০ ডেসিবেলের আওয়াজ শুনে গেলে মানুষ পাকাপাকি ভাবে কালা তো হবেই। ৮০ ডেসিবেল থেকে ৯০ ডেসিবেলের মধ্যে কানের ক্ষতি হতে পারে। তবে হ্যাঁ, ১৩৫ ডেসিবেলের ওপরে কান চাপা না দিয়ে কেউ যেন অনেকক্ষণ ধরে জগঝম্প কোলাহলের মধ্যে না থাকে। আর ১৫০-এর বেশি ডেসিবেলে কোনোভাবেই থাকা উচিত নয়। কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে এমন ভাবে যে আর তা মেরামত করা যাবে না। কানের হাড় ভেঙে যেতে পারে অথবা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যেতে পারে, এমন কি ভেঙে আর সরে গিয়ে ডিমের মত জানলা ফুটো করে ঢুকেও যেতে পারে।

প্রশ্ন : কি বলছো? কানের মধ্যে জানলা, পর্দা আর হাড়গোড়?

মা : শোনার যন্ত্রটা তিন ভাগে রয়েছে কানের মধ্যে: বাইরের কান, মাঝের কান, ভেতরের কান। শব্দের ঢেউকে গ্রহণ করে শব্দশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপ দিচ্ছে প্রথম দুটো ভাগ; ভেতরের কান এই যান্ত্রিক শক্তিকে স্নায়ু উদ্দীপনার সিরিজ বানিয়ে ছাড়ছে। শব্দের ঢেউ কানের সরু নলে তো বেশি ঢুকতে পারে না—তাই কানের ছড়ানো পাতা বেশি করে শব্দের ঢেউ জড়ো করে কানের ফুটোয় ঢুকিয়ে দেয়—ঠিক যেন ফানেলের মধ্যে দিয়ে শব্দের স্রোত নামতে থাকে সরু পাইপের মধ্যে। এই পাইপের শেষে থাকে টিমপ্যানিক মেমব্রেন বা ইয়ার ড্রাম বা কানের পর্দা। শব্দস্রোত এই পদাকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দেয়। পর্দার সঙ্গে লেগে রয়েছে ছোট ছোট তিনটে হাড়—এরা থাকে মাঝের কানের বাতাস ভর্তি চেম্বারে। প্রথম হাড়টা লেগে থাকে কানের পর্দার সঙ্গে—তৃতীয় হাড়টা লেগে থাকে একটা ঝিল্লী পর্দায়—যার কাজ মাঝের কান আর ভেতরের কানকে আলাদা করে রাখা। এই পদটাকেই বলা হয় ওভ্যাল উইনডো—ডিমের মত জানালা।

প্রশ্ন : হাড় দুটোকে চালাচ্ছে কে?

মা : দুটো পেশি। চড়া আওয়াজে এরা কুঁচকে যায়—হাড়গোড়ের কাজ কমিয়ে দেয়—ভেতরের কানে যাতে শব্দের ধাক্কা না পৌঁছোয়—তার খবরদারি করে।

প্রশ্ন : সর্দি হলেও তো কানে কম শুনি। সর্দির সঙ্গে শব্দের কি সম্পর্ক?

মা : কোনো সম্পর্ক নেই। মাঝের কান থেকে মুখগহ্বরের পেছন দিক পর্যন্ত একটা নল আছে—অথাৎ বাইরের জগতের সঙ্গে মাঝের কান যোগাযোগ রেখেছে এই নলের মধ্যে। কেন? না, আশপাশের বাতাসের চাপের সঙ্গে মাঝের কানের বাতাসের চাপকে এক লেভেলে রাখতে হয় বলে—নইলে কান তেমন ভাবে কাজ

করে না। এই নল এমনিতে বন্ধ থাকে, কিন্তু কিছু গেলবার সময়ে খুলে যায় যাতে কানের পর্দার দুপাশের বাতাসের চাপ সমান অবস্থায় থাকে। যদি কোনো কারণে এই নল বুঁজে যায়, তখন কানের পর্দা খুশিমত কেঁপে কেঁপে উঠতে পারে না—তখনি কানে কম শোনা যায়। চাপের গরমিল খুব বেশি হলে কান টনটন করতে থাকে। মাথায় ঠাণ্ডা বসে গেলে, শ্লেষ্মায় ইউসট্যাচিয়ান টিউব বুঁজে যায়, এমন কি মাঝের কানেও শ্লেষ্মা ঢুকে পড়ে—তখন চাপ আর গরমিল কাটিয়ে উঠতে পারে না। হাড়গোড় ঠিকঠাক কাজ করে না—কানে কালা হয়ে থাকতে হয় সর্দি না সারা পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ভেতরের কানে কি ঘটে?

মা : আগেই বলেছি স্নায়ুর উদ্দীপন ঘটে সেখানে। ভেতরের কান দু-পদ্ধতিতে কাজ করে; একটা যন্ত্র অর্ধ-বৃত্তের মত নলের মারফত ব্যালেন্স বজায় রাখে; আর একটা যন্ত্রের নাম Cochlea—শোনবার যন্ত্র। এই যন্ত্রটা শামুকের খোলার গড়নে প্যাঁচালো স্প্রিং-এর মতন—প্যাঁচ খুলে মেলে ধরলে লম্বায় ৩৫ মিলিমিটার, ব্যাস মোটে ৩ মিলিমিটার ঠিক সেইখানে যেখানে সে লেগে রয়েছে ডিম-জানালার সঙ্গে—যার অপর দিকে লেগে রয়েছে মধ্য-কানের শেষের হাড়। তরল পদার্থ বোঝাই Cochlea-র আর একদিক রয়েছে ঝিল্লী দিয়ে তৈরি 'গোল জানলা'য়—যার ওপর রয়েছে প্রায় ৩০,০০০ অত্যন্ত অনুভূতিসচেতন চুলের কোষ। এরাই 'গোল জানলা'র নড়াচড়ার তর্জমা করে রায় উদ্দীপক বানিয়ে পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে।

প্রশ্ন : মানুষের কানে এত জটিল কলকজা?

মা : এই কারণেই নানা রকমের আওয়াজের তফাত ধরতে পারে মানুষের কান। এই সূক্ষ্ম কলকজায় যাতে চোট না লাগে শব্দের উটকো উৎপাতে, সে ব্যবস্থাও রয়েছে যন্ত্রদের মধ্যে। দু-রকম পাহারার আয়োজন হয়েছে। ৯০ ডেসিবল আওয়াজে মধ্য-কানের হাড়গোড়ের সঙ্গে লাগাননা পেশি টাইট হয়ে গিয়ে যন্ত্রদের তাণ্ডব-নৃত্য রুখে দেয়। কিন্তু ১৪০ ডেসিবল আচমকা আওয়াজে হার মানে পুঁচকে পেশিরা—তখন মধ্য-কানের হাড় তিনটে সামনে পেছনে দোলন ভুলে গিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুলে চাপ কমিয়ে আনে।

প্রশ্ন : শুধু কি কলকারখানার আওয়াজেই কালা হতে হয়?

মা : মাথায় গাঁট্টা মারলে, অথবা কানের পাশে পটকা ফাটালেও পর্দা চৌচির হতে পারে, চুলের কোষে চোট লাগতে পারে, হাড় তিনটেকে উল্টোপাল্টা করে দিতে পারে। অসুখেও মধ্য-কানের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়—স্নায়ু চুল-কোষগুলোকেও খেয়ে খেলতে পারে। কানে খোল জমলে, অথবা আজেবাজে জিনিস কানে ঢোকালে কানের ফুটো বুঁজে গিয়ে, অথবা কানের পর্দা ফেটে গিয়েও কালা হওয়া সম্ভব। এ ছাড়াও, কুইনাইন বা স্ট্রেপটোমাইসিনের মত কিছু ওষুধও ভেতরের কান পুড়িয়ে দিয়ে বধিরতা এনে দিতে পারে। সবশেষে জানবি, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে কানের জোর কমে। একে বলে প্রেসবাইকোসিস। ছেলেদের ক্ষেত্রে ৩০ আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর থেকে তার শুরু।

প্রশ্ন : কেন? মেয়েরা পরে কালা হয় কেন?

মা : অত চেঁচাচ্ছিস কেন? এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। হতে পারে, ছেলেদের ঘরের বাইরের কাজকর্মে বেশি আওয়াজ শুনতে হয় বলেই হয়ত এমনটা হয়—নিছক বয়সকে দোষ দেওয়া যায় না। ২০-২২ বছর বয়েসে শূন্য ডেসিবেলের মৃদু আওয়াজ যারা শুনতে পায়, ৭০ বছর বয়েসে ৪০ ডেসিবেলের নিচের আওয়াজ আর তারা শুনতে পায় না।

প্রশ্ন : কিন্তু একজনের কাছে যা শব্দ-যন্ত্রণা, আর একজনের কাছে তো তা শব্দ-সুখ?

মা : ঠিক তাই। শব্দের ধরনের ওপর, আর ব্যক্তিবিশেষের মন, স্বাস্থ্য আর পরিবেশের ওপর নির্ভর করছে সেই শব্দ যন্ত্রণা বা সুখ। তোদের কাছে মাইকের গান আরামের, আমার কাছে আতঙ্ক। মাথা খারাপ করে ছাড়ে। কিন্তু শব্দ যখন সত্যি সত্যিই শরীর আর মনকে ড্যামেজ করে—তখন তো তা ক্ষতিকর নয়েজ বটেই। বিস্ফোরক বা কলকারখানার একটানা অনেকদিনের আওয়াজ ভেতরের কানের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে, চামড়ার বিদ্যুৎ পরিবাহিতায় পরিবর্তন আনে, ব্রেনের ইলেট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটির হেরফের ঘটায়, হৃদঘাত আর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার পালটে দেয়, গতি-সঞ্চালক প্রেরণাও আর সঠিক থাকে না। চড়া শব্দ যে জন্তু জানোয়ারদেরও ক্ষতি করে, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : শব্দদৈত্যের খপ্পরে জন্তু জানোয়ার?

মা : যা বলিস। তাদের বেশ কয়েকটা অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ডের সাইজ পাল্টে দেয়, রক্তের চাপে গরমিল আনে, রক্তবাহী নলগুলো সরু হয়ে যায়, চোখের তারা বেড়ে যায়। এগুলো মানুষের ক্ষেত্রে এখনো নথিভুক্ত হয়নি। তবে মেজাজ তিরিক্ষে হওয়া, বমি-বমি ভাব, অবসাদ, উদ্বেগ, ঘুম ছুটে যাওয়া, খিদে চলে যাওয়া—জন্তুদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। অদৃশ্য উৎপাত রক্তমাংসের শরীরে গণ্ডগোল বাধাচ্ছে, মনকেও বিকল করবার উপক্রম করছে।

প্রশ্ন : কি যে বলো! মনের মধ্যে শব্দ ঢুকবে কী করে?

মা : ঘুম তো কেড়ে নেয়। তখন মেজাজ সপ্তমে উঠে যায়—মাথায় খুন চাপে—শব্দ-যন্ত্রণার কারক বস্তু বা ব্যক্তিকে বরদাস্ত করা যায় না। কথা জড়িয়ে যায় উৎকট আওয়াজকে চাপা দিতে গিয়ে—ফলে, দক্ষতা কমে যায়, বড্ড একা-একা লাগে নিজেকে, দুর্ঘটনা ঘটানোর প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রচণ্ড আওয়াজের ফলে কলকব্জার ওয়ার্নিং বেল, ট্রাক বা গাড়ির হর্ন, তারস্বরে হুঁশিয়ারি কানে ঢোকে না। বহু পরীক্ষায় দেখা গেছে, নয়েজ বেশি হলে কাজের পরিমাণ আর নৈপুণ্য দুটোই কমে যায়। শব্দ-চাপ কমিয়ে আনলে কাজের ভুলও কমে যায়—সবসময়ে যদিও তা হয় না। কলকোলাহলে মেজাজ ক্ষিপ্ত হলে কাজে কামাইও বেড়ে যায়। মনের অবস্থা যে শোচনীয় হয় বিরক্তিকর আওয়াজে—তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে বিস্তর।

প্রশ্ন : উল্টোটাও তো ঘটতে পারে। ফাঁকিবাজ আর অকাজের লোক শব্দের দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারে?

মা : তাদেরকে ধরবার জন্যে আছে অডিওমেট্রি বিজ্ঞান। যে-যন্ত্র দিয়ে মানুষের শ্রবণ ক্ষমতার লেভেল মাপা যায়, তাকে বলে অডিওমিটার। শব্দ ক্ষতি করার মত লেভেলে পৌঁছেছে কি না তা বোঝার জন্যে আছে সাউণ্ড লেভেলমিটার। সাউণ্ড প্রেসার লেভেল যখন ৮৫ ডেসিবেল, তখন তা একটানা ২৪ ঘণ্টার বেশি সহ্য করা ঠিক নয়। এইভাবে দেখা গেছে, পৌনে চার মিনিটের বেশি ১১১ ডেসিবেল সাউণ্ড প্রেসার লেভেল সহ্য করলে ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন : নয়েজ কন্ট্রোল করতে গেলে শব্দকে কোন লেভেলে বাঁধতে হবে, মা?

মা : ৫০ হার্জ থেকে ১০,০০০ হার্জ-এর মধ্যে। কানের জোর যার ভাল, সে মানুষ কিন্তু শুনতে পায় ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ। এক কথায়, একেই বলে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি। কলকাতা তার ধার

ধারে না—তাই সে এখন বিশ্বের সবচেয়ে কোলাহলময় শহর। ৬ লক্ষ গাড়ির আওয়াজকে তো আর গলা টিপে মারা যাবে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, টিনাইটাস রোগটা এ শহরেও বেশ জেঁকে বসেছে।

প্রশ্ন : টিনাইটাস! সেটা কী?

মা : কানের রোগ। হতে পারে অনেকগুলো কারণে: কানে জীবাণু সংক্রমণ, অ্যানিমিয়া, কানে শোনার নার্ভের ওপর টিউমারের চেপে বসা, ভেতরের কানের কাছে ধমনির মধ্যে দিয়ে রক্তের হুশ্ করে ধেয়ে যাওয়া, কানের পর্দার ওপর একগাছি চুল এলিয়ে থাকা। 'মাইসিন' জাতীয় কিছু ড্রাগ রাতারাতি টিনাইটাস রোগ ডেকে আনতে পারে—সবচেয়ে বড় কারণটা অবশ্য নয়েজ—যেটা এই শহরে সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন : টিনাইটাস কী ধরনের রোগ, মা?

মা : ভেতরের কানের চুল-কোষের কথা আগেই বলেছি—মাকড়শার জালের মত সূক্ষ্ম এই চুল-কোষ চিরুনির দাঁতের মত দাঁড়িয়ে থাকে—হেলে পড়ে কাঁপুনির ঠেলায়—ব্রেনকে পাঠিয়ে দেয় একটা ইলেকট্রিক সিগন্যাল—কীভাবে যে এই সংকেত সৃষ্টি করে, সেটা যদিও আজও এক রহস্য। ব্রেন সেই সংকেত থেকে শব্দের স্তর ঠিক করে নেয়। যদি বেশি চাপ পড়ে, চুল-কোষ ভেঙে যায়—পায়ে দলাইমলাই ঘাসের মত। তখন একটানা সাইরেন বা ট্রেনের বাঁশি বা সোঁ-সোঁ আওয়াজ শুনেই যেতে হয় জীবনভোর। দমাদম পটকা ফাটাস তো কালীপুজোয়—অনেকক্ষণ কানে আর কিছু শোনা যায় না। কান ভোঁ-ভোঁ করে। কেন? বেশ কয়েকটা চুল-কোষ গোড়াসমেত উপড়ে গেল বলে। বড় হলে টিনাইটাস রোগ দেখা দেবেই। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। কানে তালা লেগে থাকা, কানের মধ্যে প্রায় ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পাওয়া—এ সব দেখা দিলেই ডাক্তার দেখানো দরকার।

প্রশ্ন : তবে যে বললে কানের মধ্যে পাহারাদার আছে জোর শব্দকে কমিয়ে দেওয়ার জন্যে?

মা : আছে। এক সেকেণ্ডের ০·০৬৩ ভাগের মধ্যে তারা কাজও শুরু করে দেয়। কিন্তু কাহিল হয়ে পড়ে এক মিনিটের মধ্যেই। শব্দ যদি বারবার হতে থাকে—বেড়েই চলে—পাহারাদার পেশি করবে কি?

প্রশ্ন : যারা কনসার্ট বাজায়, তাদের কানের ক্ষতি হয় না?

মা : জেট ইঞ্জিনের, আওয়াজ যা, রক কনসার্ট আর স্টিরিও হেডসেটের আওয়াজও তাই—১৩৫ ডেসিবেল। দু-মিনিটেই চুল-কোষদের ধ্বংস করে দিতে পারে। রাস্তাঘাটের নয়েজ ৯০ ডেসিবেল—বিকেলে পথে বেরোলে তাই মেজাজ সপ্তমে ওঠে।

প্রশ্ন : যারা বন্দুক চালায়?

মা : শটগানের আওয়াজ ১৫৬ ডেসিবেল—রক কনসার্টের ১০০ গুণ বেশি। কান ভোঁ-ভোঁ করা মানে বিপজ্জনক সঙ্কেত। একটা হিসেব মনে রাখিস, দশ ডেসিবেল বৃদ্ধি মানেই শব্দের তীব্রতা দশগুণ বেড়ে যাওয়া। সাইলেন্সরহীন মোটর সাইকেলের আওয়াজ ১০৫ ডেসিবেলের ধারেকাছে—এক ঘণ্টাতেই কানের দফারফা করে দিতে পারে অনেকের।

প্রশ্ন : ওয়াকম্যান? শুনবো না?

মা : কমিয়ে শুনবি। জোর আওয়াজের ধারেকাছে থাকবি না। একের পিঠে ২৪টা এক ওয়াটকে একের পিঠে ২৪টা শূন্য বসিয়ে ভাগ করলে যা দাঁড়ায়, ততটুকু শব্দশক্তিও অক্ষতকর্ণ শিশু শুনতে পায় মশা ডানা নাড়লেই। কিছু আফ্রিকান আদিবাসীর কান এত প্রখর যে ফুটবল মাঠের এদিকে ফিসফিস করলেও ওদিকে

বসে শুনতে পায়। কিন্তু শহরের রাশি রাশি আওয়াজের জঞ্জাল আমাদের কানের সেই ক্ষমতা শেষ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

প্রশ্ন : সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ ফ্রিকোয়েন্সির বাইরের স্বাভাবিক শব্দ কি তাহলে নেই পৃথিবীতে?

মা : আছে। সে সব শব্দের জন্যে আমাদের কান তৈরি হয়নি। বেড়াল, গিনিপিগ, ইঁদুর সেকেণ্ডে ৩০,০০০ আবর্তনের কম্পন-তরঙ্গ শুনতে পায়—বাদুড়ের ভেতরের কান শুনতে পায় ১০০,০০০ আবর্তনের কম্পাঙ্ক। কিন্তু সে তো নিঃশব্দ শব্দ। আর এক বিভীষিকা। কেন, তা আগেই বলেছি।

হিরে

প্রশ্ন : হিরে তো শুধু কার্বন দিয়ে তৈরি মা, তবে এত দামি কেন?

মা : হিরে খুঁজতে খরচ, খনি থেকে তুলতে খরচ, দেশের সরকারকে টাকা দিতে খরচ, জহুরিদের হাত বদল হতে হতে মুনাফা জোগাতেও খরচ। যে জিনিসের গুণ অনেক, মেলে কম—তার দাম তো বেড়েই চলে।

প্রশ্ন : হিরে তো শুধু বড়লোকদের জন্যে, তাই না মা?

মা : একশ বছর আগে তাই ছিল। এখন হিরে দিয়ে শুধু জড়োয়া গয়না নয়, কারখানার যন্ত্রও তৈরি হচ্ছে। আফ্রিকায় আর রাশিয়ায় বিশাল হিরের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে হিরে এখন আর সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নয়।

প্রশ্ন : হিরে নাকি খুব শক্ত?

মা : প্রকৃতির তৈরি সমস্ত জিনিসের মধ্যে হিরে সব চাইতে শক্ত, সব চাইতে খাঁটি।

প্রশ্ন : তাহলে আমাকে হিরের টুকরো বলো কেন? আমি কি শক্ত?

মা : তুই বড় জেদি বলে। গ্রীক আর ল্যাটিন শব্দ adamas মানে খুব কঠিন জিনিস। তা থেকে এল প্রাচীন শব্দ adamant। ইংরেজিতে এই শব্দটাকেই ধার করে মানে করা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন বস্তু, হিরে, চুম্বক পাথর, একগুঁয়ে। এদের মধ্যে শেষের মানেটাই বেশি চালু। adamantine মানে পাথরের মত শক্ত, হৈরিক, ইচ্ছাশক্তিতে বা চরিত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী। হিরেকে প্রথমে বলা হয়েছিল adamas, তারপর adamant, সবশেষে diamond। মাঝে diamant শব্দটা এসেছিল প্রাচীন ফরাসিতে, ইংরেজিতে এসেছিল dyamaund আর adamaund পনেরো শতকের গোড়ায়, কবিরা বলতেন diamaund। ষোল শতকের মাঝখান থেকে diamond বানানটা চালু হয়ে যায়। মনে রাখিস, গ্রীক adamao মানে 'আমি পোষ মানাই', 'মাথা হেঁট করাই'।

প্রশ্ন : এতই শক্ত হিরে? পিটিয়ে ছাতু করা যায় না?

মা : ইস্পাতকেও ফুটো করে দিতে পারে। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ ডাইস-এর ফাঁকে হিরে রেখে দু-পাশ থেকে ভয়ানক চাপ দিয়ে হিরের এই আশ্চর্য ক্ষমতা হাতেনাতে দেখিয়েছেন। চেপেচুপে হিরে-কে তেড়াবেঁকা করা

যায় না—যেমন তোকে করা যায় না—কিন্তু হাতুড়ির একঘায়ে হিরে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

প্রশ্ন : তাহলে নিশ্চয় অ্যাসিড, অ্যালকালি, আগুন দিয়েও হিরে-কে জব্দ করা যায়?

মা : সব চাইতে কড়া অ্যাসিড আর অ্যালকালিতে ডুবিয়ে রাখলেও হিরে হিরে-ই থাকবে—যেমন তুই। কিন্তু আগুনে পুড়ে যাবে—কার্বন দিয়ে তৈরি বলে। হিরে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হয়ে উড়ে যাবে।

প্রশ্ন : কাঁচ আর হিরে দুটোই যদি হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়িয়ে যায়, তা হলে হিরে যাচাই করব কী করে?

মা : হিরে যাচাই-এর অন্য পথ আছে। তার জন্যে জহুরি আছে। তবে সেকালে বোকা হিরে সংগ্রাহকদের এইভাবে ঠকানো হত। খনিমজুর হয়তো নিয়ে এল একগাদা হিরে, ধূর্ত জহুরি একটা হিরে ধাঁই করে গুঁড়িয়ে দিয়ে বলত—'দেখলে তো, বিলকুল কাঁচ।' হতাশ মজুর সব 'কাঁচ' ফেলে দিয়ে চলে যেত। জহুরিদের চালাকি ধরতে না পেরে মজুররা নিজেরাই কত ভালো হিরে কৃস্ট্যাল এইভাবে যাচাই করতে গিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলেছে।

প্রশ্ন : হিরে তা হলে হিরে কাটে কী করে?

মা : জহুরি জানে, হিরের একটা 'নরম' দিক আছে। হিরে দিয়ে সেদিকে টানলেই হিরে কাটা যায়। এই কায়দাটা হিরে-কাটিয়েদের কাছে গুপ্ত-বিদ্যে হিসেবে থেকে গিয়েছিল কয়েক-শ বছর।

প্রশ্ন : বেশির ভাগ ঐতিহাসিক হিরে নাকি ভারতের হিরে?

মা : ঠিক জেনেছিস। একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা-বাদশারা পেল্লায় হিরে ধারণ করে জাহির করত তাদের সামাজিক মর্যাদা। তাই আজও বেশির ভাগ ঐতিহাসিক-হিরে এই ভারতবর্ষেরই হিরে। প্রতিটি হিরেই ঘটনাবহুল—কয়েক ক্ষেত্রে রক্তাক্ত ইতিহাসের স্বাক্ষর। ফরাসি জহুরি জাঁ ব্যাপতিস্তে ট্যাভারনিয়ার প্রাচ্যদেশে বার ছয়েক টহল দিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকটা ইতিহাসবিখ্যাত হিরে পাচার করেছেন ইউরোপে।

প্রশ্ন : সবচেয়ে বেশি ইতিহাসবিখ্যাত তা হলে কোন্ হিরে?

মা : কোহিনূর। মানে, আলোর পাহাড়। মালব রাজাদের দখলে ছিল ১৩০৪ পর্যন্ত। মোগল সম্রাটরা বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনের ময়ূরের একটা চোখ বানিয়েছিলেন কোহিনূর দিয়ে। আর একটা চোখ হয়েছিল আকবর শাহ্ হিরে দিয়ে। পারস্যের শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে কোহিনূর নিয়ে যান সঙ্গে করে। পরে তা ফিরে আসে পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের হাতে, সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে—কিন্তু তা দেননি। কোহিনূর তিনিও রাখতে পারেননি—যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই হিরে নিয়ে গিয়ে ভেট দেয় মহারানী ভিক্টোরিয়াকে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নিজেও এই ভারতবর্ষেরই একটা প্রকাণ্ড হিরে গেঁথে রেখেছিলেন নিজের তরবারিতে।

প্রশ্ন : সেকী! নেপোলিয়ানও ইণ্ডিয়ান ডায়মণ্ড লুঠ করেছিলেন?

মা : লুঠ করতে যাবেন কেন? বড় বড় যে-সব হিরে পাচার হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে, তাদের শেষের দলে ছিল রিজেন্ট হিরে। ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছিল ১৭০১ সালে। ওজন ৪১০ ক্যারাট। ইংল্যান্ডে গিয়ে তার নাম হল 'পিট' হিরে। ফ্রান্সের রিজেন্ট পরিবার তাকে কিনে নিয়ে নতুন নাম দিল 'রিজেন্ট'। মেরি অ্যান্তোনিয়েতের বড় প্রিয় ছিল এই হিরে। ফরাসী বিপ্লবে চুরি হয়ে যায়—১৫ মাস পরে তাকে পাওয়া যায় প্যারিসের একটা বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে বরগার মধ্যে। তারপর অনেক হাত ঘুরে পৌঁছয় নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হাতে—উনি তখন ফ্রান্সের সম্রাট।

প্রশ্ন : হিরে নাকি অনেক ট্র্যাজেডি ঘটায়?

মা : 'হোপ' ডায়মণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমনি অনেক ট্র্যাজেডি। ট্যাভারনিয়ার ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন এই হিরে। তখন তার নাম ছিল ব্লু ডায়মন্ড। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে উধাও হয়ে যায়—আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হোপ ডায়মণ্ড নাকি তারই অংশ—যার দখলে গেছে, তার কপালেই সর্বনাশ লিখেছে। আসলে, হিরে-ই সম্ভবত একমাত্র ঘনীভূত বস্তু-সম্পদ যার বিনিময়ে বড় বড় চাওয়া-পাওয়ার আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। তাই সমাজের অনেক উত্থান-পতন এবং সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধে হিরের ভূমিকা রয়ে গেছে।

প্রশ্ন : হিরের ব্যবসায় তাহলে ভারতবর্ষই এগিয়ে ছিল অতীতে?

মা : তা তো বটেই। নিদেনপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব চার শতক থেকে হিরের বাণিজ্য চলেছে ভারতবর্ষে। তার ওপর খাজনা চাপানো হয়েছে, বাইরে রপ্তানি করা হয়েছে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ইজরায়েল, মিশর, সিংহল, আরবদেশে।

প্রশ্ন : হিরের ব্যবসা কারা করত, মা?

মা : পুব এশিয়া আর রোম সাম্রাজ্যে—আবার মধ্যযুগে ইউরোপে আর পুব এশিয়ায় হিরের একচেটিয়া বাণিজ্য চালিয়েছে আরব আর পারসিকরা—ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত। ভারতবর্ষের দামি আর ভালো হিরেগুলো নিজেদের কাছে রেখে ছোট ছোট কম দামের হিরে বেচত অন্য দেশে। হিরে উপত্যকার কিংবদন্তী রচনা করেছিল হিরের এই জাত ব্যবসায়ীরাই।

প্রশ্ন : হিরের উপত্যকা?

মা : রোম দেশের প্লিনির লেখায় জানা যায়, হিরে মেলে হিরের উপত্যকায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-এ ভারতবর্ষে এসে নাকি হিরের উপত্যকার সন্ধান পেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার। সাপেরা পাহারা দেয় সেখানে। শুধু চোখে-চোখে হিরে-লোভীদের মেরে ফেলে ভয়ঙ্কর সাপের দল। আলেকজাণ্ডারের ঘোড়েল সৈন্যরা নাকি আয়না ধরেছিল সেই সাপেদের সামনে। নিজেদের চাহনিতেই অক্কা পেয়েছিল সর্পকুল। লুঠ হয়ে গিয়েছিল হিরে উপত্যকা। তারপর ভেড়ার মাংস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল গর্তের মধ্যে। চর্বিতে আটকে গিয়েছিল হিরে। লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল শকুনিদের। হিরে আটকানো মাংস তুলে নিয়ে শকুনিরা নিজেদের আস্তানায় পৌঁছতেই আলেকজাণ্ডারের সেনাদল সেখানে হানা দিয়ে উদ্ধার করেছিল বিস্তর হিরে। কন্সটানটিয়া-র বিশপ এই কাহিনী লেখেন প্রথমে—মার্কোপোলো তার পুনরাবৃত্তি করেন। একই কাহিনী ঢুকে গেছে সিন্ধবাদ নাবিকের অ্যাডভেঞ্চারে। আসলে, গোলকুণ্ডার হিরে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে করেই রটিয়েছিল হিরে উপত্যকার কাহিনী—যাতে আশেপাশের নদীখাতের হিরের আসল উৎস সন্ধানীদের কাছে অজানা থেকে যায়। হিরে নাকি জ্যান্ত পাথর, এমন রটনাও তো হয়েছে একসময়ে।

প্রশ্ন : জ্যান্ত হিরে! বংশবৃদ্ধিও করে নাকি?

মা : উদ্ভট এই ধারণাও ছিল সাহেবদের মধ্যে। বিশ্বাসটা ভারতবর্ষ থেকেই ছড়িয়েছিল সেদেশে। হিরের নাকি জাদুকরি এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। হিরে নাকি অসুখ সারায়, সর্বনাশ রোধ করে, বদ প্রেতাত্মা তাড়ায়। পকেটে হিরে রাখলে মানুষের ভাগ্যকে সেইভাবেই গড়ে নেওয়া যায়। মানুষের শরীরে ব্রহ্মাণ্ডের আদল রয়েছে—এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে আর একটা বিশ্বাস—ভালো কর্মফল অনুসারে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়—খারাপ কর্মফল থাকলে জন্মান্তর ঘটে পশু, গাছ, খনিজের মধ্যে—যতক্ষণ না পরিশুদ্ধ হয়ে পরমাত্মায়

বিলীন হচ্ছে। সুতরাং রত্নদের প্রাণ তো থাকবেই। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে এই ধারণাই চলে গিয়েছিল প্রাচ্যদেশ, মিশর, গ্রীস হয়ে ইউরোপের অ্যালকেমিস্টদের কাছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো মনে করতেন, রত্নদের মধ্যে অন্য নক্ষত্রের আত্মা থাকে বলেই তারা জীবন্ত। সোনার বিশুদ্ধ রূপ নাকি হিরে। অ্যারিস্টটলের শিষ্য থিওফ্রেসটাস দামি পাথরদের দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন—স্ত্রী আর পুরুষ। এ থেকেই দানা বাঁধলো আর একটা কিম্ভুত বিশ্বাস—হিরেদের ছেলেপুলেও হয়। ১৫৬৬-তে লেখা De Gemme Tigur গ্রন্থে এরকম দু-খানা হিরের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। সতেরো শতকের একটা খবরে জানা গেল, বোর্নিও আর ইণ্ডিয়ার দুটো শূন্য হিরের খনিতে নতুন করে হিরে আবির্ভূত হয়েছে। ওই সতেরো শতকেই জোহানেস বুস্টা মানটিয়াস নামে এক ভদ্রলোক জানালেন, দুটো হিরে বিয়ে করে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করছে।

প্রশ্ন : তাজ্জব কথা বলছ, মা! হিরে যদি জ্যান্ত হয়, তা হলে তার মৃত্যুও তো হবে?

মা : ঠিক এই কথাই বলেছিলেন রেনেসাঁ যুগের জেরোম কার্ডান। জন্মেছিলেন ১৫০১ সালে। দামি পাথরের প্রাণ তো আছেই, তাদের অসুখ হয়, বয়স বাড়ে, মৃত্যুও হয়। ১৮৭৬ সালেও ভারতবর্ষে শোনা গেছে, হিরের মধ্যেও আছে বর্ণাশ্রম। রঙ অনুসারে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণে বিভক্ত। ওষুধ হিসেবে হিরের ক্ষমতা নিয়েও কি কম ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল দেশে বিদেশে।

প্রশ্ন : হিরের ওষুধ?

মা : হিরে নাকি বিষের ক্ষমতা নাশ করে। বিষের সান্নিধ্যে রাখলে খাঁটি হিরে কালচে মেরে যায়—বিষকে নিজের গায়ে টেনে নেয় বলে—ভেতরে ঢুকতে পারে না। গোটা হিরে গিলে ফেললে কিন্তু তা মারাত্মক বিষ হয়ে দাঁড়ায়। হিরে শুঁকলে, অথবা তাকে গায়ে ঠেকিয়ে রাখলে, অথবা তাকে মুখে পুরে রাখলে রোগ-টোগ পাঁই পাঁই করে পালায়। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল অশুদ্ধ হিরে বিষাক্ত—জনডিস, কুষ্ঠ, প্লুরিসি রোগ ডেকে আনে—মানুষকে খোঁড়া করে দেয়; নানা রঙের হীরক-চূর্ণ খেলে নাকি মানুষের শক্তি, সৌন্দর্য, এনার্জি, সুখ, সাহস বেড়ে যায়—দীর্ঘ জীবন পায়। সবই ভুল। হিরের গুঁড়ো খাইয়ে মানুষ মারার ঘটনা অনেক আছে।

প্রশ্ন : হিরে খাইয়ে মানুষ খুন?

মা : শোনা যায়, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক-কে হিরের গুঁড়ো খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তুরস্কের সুলতান বাজাজেত-এর গুণধর পুত্র খাবারে হীরক-চূর্ণ মিশিয়ে কবরে পাঠিয়েছিল পিতৃদেবকে। ১৫৩২ সালে পোপ অষ্টম ক্লিরেন্ট-কে তাঁর চিকিৎসকরা দামি পাথরের গুঁড়ো খাইয়েছিল ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে। হিরের গুঁড়োও ছিল তার মধ্যে। চোদ্দ চামচ পর্যন্ত খেতে পেরেছিলেন, তারপর পা দিলেন স্বর্গের পথে। ফ্রান্সের দ্বিতীয় হেনরীর দজ্জাল রানী ক্যাথরিনের বিখ্যাত রসায়ন poudre de succession নাকি হিরের গুঁড়ো ছাড়া কিছুই নয়—সেঁকো বিষও নাকি ছিল তার মধ্যে। হিরে যে বিষাক্ত, এই সত্যটা ছড়ানো হয়েছিল আরও একটা উদ্দেশ্যে—খনি থেকে মজুররা হিরে গিলে ফেলে বাড়ি ফিরে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেনি প্রাণের ভয়ে। বিষাক্ত হিরেই কিন্তু তার ম্যাজিক শক্তির জন্যে ঘরে ঘরে প্রণম্য হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে।

প্রশ্ন : হিরের মধ্যে ম্যাজিক?

মা : সতেরো শতকে জ্যোতিষীরা হিরেকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছে। হিরে নাকি মুখে পুরে রাখলে দাঁত খসে পড়ে গোড়াশুদ্ধ। হিরে পাগলদের ভাল করে, ভূতপ্রেত তাড়ায়। দুঃস্বপ্ন কাটায়। হিরে পরে যুদ্ধে নামলে ভয় চলে যায়, সাহস শতগুণ বাড়ে, যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে। হিরে তন্ত্রমন্ত্রের কুপ্রভাব আটকে দেয়, মামলা জিতিয়ে

দেয়। কিন্তু দু-পক্ষই হিরে ধারণ করলে কী ঘটবে, তা আর বলা হয়নি। বাড়ির কোণে বা বাগানের গাছে হিরে ছুঁইয়ে দিলে নাকি বজ্র, ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হিরের মধ্যে নাকি চৌম্বক ক্ষমতাও আছে। আসলে, হিরেকে ঘষলেই তার মধ্যে স্থির বিদ্যুৎ এসে যায়—কুচো কাগজ আর হাল্কা জিনিস টেনে নেয়; সহজ এই এক্সপেরিমেন্টটা কেউ কখনো করেনি। ম্যাজিক কথাটার এমনিই মাহাত্ম্য।

প্রশ্ন : এইজন্যেই রত্নদের রানী হয়ে বসেছে হিরে?

মা : চিরকাল এই গৌরব তার ছিল না। পারসিকরা মুক্তোর আদর করত বেশি তার জেল্লার জন্যে—কাটাই-ছাঁটাই হওয়ার পর হিরে উঠে আসে সবার মাথায়—তার আগে ছিল সতেরো নম্বর রত্ন—হিরের চেয়ে দামি ছিল চুনি আর পান্না।

প্রশ্ন : সেভেনটিন্‌থ্ থেকে ফার্স্ট বয় হয়ে গেল হিরে?

মা : গুণের কদর কি রাতারাতি হয় রে? রত্নদের কদর হয় তিনটে কারণে: তারা সুন্দর, টেকসই, দুষ্প্রাপ্য। এই তিন ব্যাপরেই হিরে সবাইকে টেক্কা মেরেছে। হিরেই একমাত্র কালারলেস আর স্বচ্ছ রত্ন—অথচ তার মধ্যে যেন আগুন আছে, তার জেল্লা তুলনাবিহীন বলেই তাকে adamantine বলে ডাকা হয়। হিরের মত টেকসই কোনও রত্নই নেই—মুক্তো তো বেশ নরম। ফি বছরে প্রায় সাতটন হিরে উঠছে খনি থেকে—তবুও তা চাহিদার তুলনায় কম। পৃথিবীর সব খনিতে হিরে একদিন ফুরোবেই—তখন হয়তো সাপ্লাই আসবে অন্য গ্রহ থেকে—আরও চড়া দামে। ফার্স্ট বয়-ই থেকে যাবে হিরে। মানুষের হাতে গড়া হিরেও তো পাল্লা দিতে পারছে না প্রকৃতির হিরের সঙ্গে।

প্রশ্ন : মানুষের তৈরি হিরে?

মা : সিনথেটিক ডায়মণ্ড-কারখানায় তৈরি। প্রথম তৈরি হয় আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানিতে—১৯৭০ সালে। এখন করছে ইউরোপের সুমিটোমো ইলেকট্রিক। এদের তৈরি হিরেতে প্রতি দশ লক্ষ ভাগের একশ ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন—তাই তা হলদেটে। ওটাকে একভাগে নামিয়ে আনতে পারলে স্বচ্ছ বা নীলচে হিরে তৈরি সম্ভব হবে। কিন্তু কোম্পানি চায় না স্বচ্ছ হিরের উৎপাদন তার প্রয়োজন কেবল জুয়েলারিতে বলে। হলদেটে টিফানি আর ক্যানারি হিরের চাহিদা কলকারখানা আর মিলিটারিতে। তবে হ্যাঁ, নাইট্রোজেন-ফ্রি সিনথেটিক ডায়মণ্ড ক্ষুদে সার্কিট আর ব্যাটারিতে বসিয়ে রুগীর দেহে লাগানো যাবে—কেন না, বিকিরণ রেকর্ড করবার ক্ষমতা সিনথেটিক ডায়মণ্ডের আছে—ন্যাচারাল ডায়মণ্ডেরও আছে—কিন্তু যাদের সে ক্ষমতা আছে, তাদের বেছে বের করাটা মুশকিল।

প্রশ্ন : পেল্লায় সাইজের সিনথেটিক ডায়মণ্ড তৈরি করা যায়?

মা : জাপানের ডায়মণ্ড প্রেস-এর সাইজ হাইটে আড়াই মিটার, ডায়ামিটারে দু-মিটার। বাড়ির সমান প্রেস বানালে আধমিটার লম্বা কি তারও বড় সাইজের সিনথেটিক ডায়মণ্ড তৈরি সম্ভব—কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

প্রশ্ন : সিনথেটিক ডায়মণ্ড তাহলে কত বড়?

মা : চার বছর আগে Guinness Book of Records'য়ে ঠাঁই পেয়েছিল যেটি, তার ওজন ছিল চার ক্যারাট—বৃহত্তম সিনথেটিক হিরে। গত বছরে তাকে টেক্কা মেরেছে দশ ক্যারাট ওজনের একটা সিনথেটিক হিরে। এরপর সাউথ আফ্রিকান মাইনিং গ্রুপ বানিয়েছে এগারো ক্যারাট সিনথেটিক। আমেরিকার জেনারেল ইলেট্রিক

কোম্পানি জানিয়েছে, ক্যারাট সাইজের দিক থেকে তাদের তৈরি সিনথেটিক ডায়মণ্ড মাইক্রোচিপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে—লেজারে নয়া উদ্ভাবন ঘটাবে।

প্রশ্ন : প্রকৃতির তৈরি হিরের দর কি তাহলে পড়ছে?

মা : দর, আদর, কদর—কোনোটাই কমেনি। যদিও আসল আর নকল হিরের কার্বনের গঠন একই রকম। পার্থক্য ধরাও মুশকিল। তবুও কারখানার হিরে প্রকৃতির হিরেকে কোণঠাসা করতে পারেনি, পারবেও না। কারণ, আসল একটাই—নকল অনেকগুলো।

প্রশ্ন : হিরের অনেক নকল?

মা : সিনথেটিক তাকেই বলব যখন তা একই বস্তু দিয়ে তৈরি হয়। কার্বন দিয়ে হলে তা সিনথেটিক হিরে। কিন্তু যখন হাই-ডেনসিটি কাঁচ দিয়ে হচ্ছে, তখন তা নকল হিরে। স্ট্রনসিয়াম টাইটানেট বা ফ্যাবুলাইট আসল হিরের তুলনায় বেশি ঝকঝকে, কিন্তু অনেক নরম; Yurium aluminate, সংক্ষেপে Y. A. G. শক্ত বটে, নকল হিসেবে উত্তম, কিন্তু আসল হিরের আগুন তার মধ্যে ততটা নেই; তবে জারকোনিয়াম অক্সাইড দিয়ে তৈরি নকল হিরে চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সবচেয়ে বেশি। Lithium niobate-এর হুবহু যমজ প্রকৃতির মধ্যে নেই—সুতরাং প্রকৃত সিনথেটিক কেউই নয়।

প্রশ্ন : হিরের আস্তানাটা কোথায়, মা?

মা : রোমদেশে এক মস্ত পণ্ডিত ছিলেন প্রথম শতাব্দীতে। নাম তাঁর প্লিনি। মারা যান ৭৯ খ্রিস্টাব্দে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ ধরনের সঙ্কলন করেছিলেন ৩৭টা গ্রন্থে। অনেকদিন ধরেই এঁর দেওয়া অনেক উদ্ভট তথ্যকে বৈজ্ঞানিক ঘটনা বলে মনে করা হয়েছিল। এঁর ভাইপোর নামও প্লিনি। আমি কিন্তু কাকা প্রিনির কথা বলছি। ইনিই বলেছিলেন, হিরে থাকে সোনার সঙ্গে। কিন্তু এখন জানা গেছে, সোনার সঙ্গেই হিরে পাওয়া যায় ঠিকই, তবে তা লক্ষ লক্ষ বছরের ঝড়বৃষ্টি আর জমির নাচুনি কুঁদুনির ফলে গায়ে গা লাগিয়ে উঠে আসে বলে হিরের আসল উৎস যেখানে, সেখানে সে সোনার সঙ্গে থাকে না। কিংবদন্তী যাই বলুক, যতদূর জানা গেছে, হিরের সবকটা আগেকার উৎস ছিল মরা অথবা ভরা নদীর খাতে। দু-হাজার কি তারও বেশি বছর ধরে ভারতবর্ষই ছিল হিরে পাওয়ার জায়গা। ষোল শতাব্দীতে প্রথম হিরে তোলা হয় বোর্নিওতে। ১৭২৫ সালে ব্রেজিলে সোনার খনি অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছিল হিরের খনি। ১৮৬৬-তে যখন তা ফুরিয়ে এসেছে, ঠিক তখনই আশ্চর্যভাবে আবিষ্কৃত হল দক্ষিণ আফ্রিকার হিরের খনি। ১৯৫৪-তে পাওয়া গেল রাশিয়ার মেরু অঞ্চল Yakutia-তে বড় বড় হিরের খনি। এখন তা দক্ষিণ আফ্রিকার খনিদের সমান হয়ে যাচ্ছে। মজাটা কি জানিস, যতবার নতুন নতুন জায়গায় হিরে পাওয়া গেছে, ততবারই গুজব ছড়ানো হয়েছে—ঝুটো! সাচ্চা হিরে ওটা নয়।

প্রশ্ন : আজ পর্যন্ত কত হিরে উঠেছে মাটির তলা থেকে?

মা : প্রায় দু-শ টন। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায়। খুব বেশি? মোটেই না। খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে পাওয়ার মেহনত কম হিরে খোঁজার চেয়ে। এখন হিরের উৎপাদন বছরে প্রায় ১২ টন। প্রায় এক পঞ্চমাংশ রত্ন হিসেবে যায়, বাকিটা সিনথেটিক ডায়মণ্ড—ইন্ড্রাস্ট্রিতে লেগে যায়। তোর আংটিতে আছে আধ ক্যারাট হিরে—মানে ১০০ মিলিগ্রাম।

প্রশ্ন : খনি থেকে হিরে তোলে কীভাবে?

মা : হিরের গায়ে চটচটে 'গ্রীজ' লেগে থাকে, জল পিছলে যায়। তাই গ্রীজ-এর ওপর খনির বালি-পাথর-মাটি ফেলে দিলে হিরে আটকে থাকে গ্রীজে—জল ঢেলে দিলেই হিরে ছাড়া স-ব বেরিয়ে যায়।' আংটির হিরেকে মাঝেমধ্যে পালিশ করতে হয়, এইজন্যেই---গায়ের আঠা পেছনে লেগে থাকে, পালিশ না করলে ওপরের ঝকঝকানিও থাকে না।

প্রশ্ন : হিরের ঝকমকানি বাড়ানোর জন্য বাদ দিতে হয় কতখানি?

মা : মোটামুটি হিসেবে, দু-ক্যারাট ওজনের হিরেকে কাটছাঁট করলে পাওয়া যায় এক ক্যারাট হিরে। হিরে যদি দোষের হয়, তাহলে কাটলে আরও ছোট হয়ে যায় এক ক্যারাটের এক পঞ্চমাংশ, কি আরও ছোট।

প্রশ্ন : হিরের মূল উৎস কোথায়, তা কিন্তু বললে না, মা?

মা : মূল উৎস পৃথিবীর গহন গভীরে। সেখান থেকেই নানাভাবে সরে এসে জমা হয়েছে যেখানে-যেখানে, 'হিরের খনি' বলা হচ্ছে তাদেরকেই। প্রথম দিকের সব কটা 'হিরের খনি' ছিল ভরা অথবা মরা নদীর তীরে অথবা খাতে, পাললিক নুড়ির মধ্যে। নদীর স্রোত শুধু হিরে নয়, অন্যান্য ভারি আর শক্ত কৃস্ট্যালও টেনে এনে জমিয়ে রেখেছে এই সব জায়গায়। ভরা নদীর কাছে এই সব পাললিক শিলার নাম দেওয়া হয়েছিল River digging; মরুভূমির বালির তলায় পাওয়া গিয়েছিল কিছু পাললিক নুড়ি—হাজার হাজার বছর আগে নদী বয়ে গিয়েছিল সেখানে—এখন তা বালি দিয়ে ভরাট। এদেরকে বলা হয় dry digging; গত শতাব্দীর শেষার্ধে দেখা গেল, আফ্রিকায় কয়েকটা dry digging রয়েছে বিশেষ ধরনের পাথর দিয়ে গড়া বিশাল স্তম্ভের চুড়োয় —হিরে ধরা পড়েছে সেই থামের মধ্যে। বিশেষ এই dry diggingগুলোর নতুন নাম দেওয়া হল—pipe অথবা pipe mine—নাম শুনেই বুঝেছিস, নলের আকারে এ খনি থাকে মাটির তলায়।

প্রশ্ন : ইণ্ডিয়ায় 'পাইপ মাইন' নেই?

মা : আছে। উত্তর ভারতের পান্না অঞ্চলে। তিনটে পাইপের একটায় কাজ চলছে বাণিজ্যিক পরিবেশে।

প্রশ্ন : নদীর তীরে আর খাতে যদি হিরে থাকে, তাহলে কলকাতার ধারেকাছে নেই কেন?

মা : কলকাতার পশ্চিমে নদীর কাছে হিরে পাওয়া গিয়েছিল বইকি। তবে পৃথিবীবিখ্যাত হিরেগুলোর বেশির ভাগই এসেছে দক্ষিণ ভারতের কোলার থেকে।

প্রশ্ন : কোলারে তো সোনার খনি আছে, মা?

মা : সোনার সঙ্গেই প্রথম হিরে উঠেছিল ভারতবর্ষে। এই কোলারেই ১৫৬০ সালে হঠাৎ ২৫ ক্যারাট ওজনের হিরে পাওয়া যেতেই খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ফরাসি জহুরী ট্যাভারনিয়ার সে জায়গায় গিয়েছিলেন। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে ষাট হাজার স্ত্রী-পুরুষ বাচ্চাদের কাজ করতে দেখেছিলেন। এখানেই পাওয়া গিয়েছিল কোহিনূর, রিজেন্ট, গ্রেট মোগল ট্যাভারনিয়ার ব্লু এবং আরও অনেক ইতিহাসবিখ্যাত হিরে। টলেমি-র লেখা থেকে জানা যায় ইণ্ডিয়ায় আছে নাকি হিরের নদী। তখনকার ভারতবর্ষে নদীর জলে বয়ে আসা বালি আর নুড়ির মধ্যেই পাওয়া যেত হিরে।

প্রশ্ন : ভারত, ব্রেজিল, রাশিয়া ছাড়া আর কোথাও হিরে পাওয়া যায় না?

মা : দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা আর ভেনিজুয়েলা, বোর্নিও আর ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্, কেপটাউন, কিমবারলি, কানাডার সেন্ট লরেন্স নদী এলাকা, চিনদেশের কয়েক জায়গায় হিরে অল্প-সল্প পাওয়া যায় বৈকি।

প্রশ্ন : মাটির তলায় হিরে কীভাবে জন্মায়, মা?

মা : পৃথিবীর ভেতরে গলিত ম্যাগনা-র মধ্যে কৃস্টালের রূপ নিয়েছে কার্বন। দীর্ঘ সময় ধরে—জন্ম নিয়েছে হিরে। অন্যান্য খনিজও নিশ্চয় দানা বেঁধেছে একই সঙ্গে। তারপর গ্যাসের বিস্ফোরক চাপের ঠেলায় উঠে এসে ঠাঁই নিয়েছে ভূত্বকের খাঁজে আর পাইপে। ঠেলার চোটে উঠতে-উঠতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে ম্যাগমা-র—সঙ্গে করে টেনে এনেছে অন্যান্য পাথর আর খনিজ। জন্ম নিয়েছে কিমবারলাইট পাথরের। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, কিমবারলাইট পাথর নিশ্চয় গলিত লাভার জমাট রূপ। চেরা গাজরের মত ক্রমশ সরু হয়ে নেমে যাওয়া কিমবারলাইট-পাইপগুলোও নিশ্চয় মরা আগ্নেয়গিরির শেকড়। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত Eric Brunton-এর লেখা Diamonds বইটা পড়ে জানলাম, এ ধারণা এখন আর ঠিক নয়। হিরে জন্মালে কী করে, তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না—লিখেছেন ব্রানটন সাহেব। অন্যান্য রত্নের মত নিশ্চয় পৃথিবীর গহন গভীরেই জন্মেছে হিরে; যে ম্যাগমা-র মধ্যে তার জন্ম, সেই ম্যাগমা-র উৎপত্তি ১২০ মাইলেরও বেশি নিচে বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু খুব সম্ভব হিরেরা নিজেরা উৎসের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন : হিরের উৎপত্তি নিয়ে অনেক তত্ত্ব রয়েছে মনে হচ্ছে?

মা : কিমবারলাইট পাথর হিরেকে নিয়ে আসছে পৃথিবীর ওপর দিকে। সুতরাং কিমবারলাইট-এর বিশ্লেষণের ওপর হিরের উৎপত্তি-রহস্য নির্ভর করে অনেকটা। একজন পৃথ্বী-বৈজ্ঞানিক কিমবারলাইট-এর নাম দিয়েছে 'জানলা'—যে জানলা দিয়ে পৃথিবীর ওপর দিকের ম্যান্টল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এই ম্যান্টলের বেশ কিছু খনিজ নমুনা থাকে কিমবারলাইট পাথরে—থাকে হিরের মধ্যেও; খুব একটা ছোট ম্যাগমা-র কণিকাও দেখা গেছে হিরের মধ্যে। সুতরাং বলা যায়, একই উৎস থেকে আবিভাব এদের। আসবার পথে অনুকূল চাপ আর তাপের পরিবেশে ভূত্বক থেকে প্রায় ৯৫ মাইল কি তারও বেশি নিচে বোধহয় হিরের দানা বাঁধা শুরু হয়েছিল। হিরে তৈরির জায়গা থেকে পাইপে আসা পর্যন্ত ব্যবধানের বৃত্তান্ত জানা যায়নি। কিছু বৈজ্ঞানিক বলেন, হিরের কৃস্ট্যাল আগে তৈরি হয়েছিল। আর একদল বলেন তার বিপরীত।

প্রশ্ন : কী কী উপাদান হিরেকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে?

মা : খুব সম্ভব এমন একটা জলীয় বস্তু হিরে গঠনে বড় ভূমিকা নিয়েছে যার মধ্যে আছে জল, কার্বন ডাই অক্সাইড, আয়রন সালফাইড, নিকেল, কপার, কোবাল্ট। কিন্তু কীভাবে, তা সংশয়াচ্ছন্ন। কিছু কর্মী মনে করেন, অধিকাংশ সিনথেটিক ডায়মণ্ডের মত, গ্রাফাইট থেকে সরাসরি কঠিন অবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে। আর একদল বলেন, একটা কার্বনময় তরল পদার্থ অথবা গ্যাসই প্রকৃত উৎস। একটা থিওরি বলছে, ভূত্বকে জলীয় পদার্থের সঞ্চয়ের মধ্যে হিরের বীজ তৈরি শুরু হয় এবং বড় হতে থাকে। তার ওপর কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কার্বন জমতে শুরু করে। এই কার্বন মিথেন গ্যাস থেকেও আসতে পারে—কিছু সিনথেটিক ডায়মণ্ড পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি হয়েছে এইভাবে। এই গ্যাসগুলোই আবার চাপ মেরে কিমবারলাইটকে তুলে দিয়েছে ওপরের দিকে।

প্রশ্ন : হিরে-ধারক পাথর কিমবারলাইট তাহলে লাভা নয়?

মা : না। লাভা ঠিকরে আসে ১০০০ থেকে ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়—যে টেম্পারেচারে যে-কোনও হিরেই উবে যাবে। কিছু কিমবারলাইট-এর মধ্যে পাওয়া গেছে কাঠ আর কয়লার টুকরো, এমনকি

মানুষের হাড়—নিশ্চয় ভূত্বক থেকে মাইলখানেক নিচে তা ছিল। কাজেই লাভারূপে কিমবারলাইট ভূপৃষ্ঠে আসেনি। এবং কিমবারলাইট-এর মধ্যেও হিরের জন্ম হয়নি।

প্রশ্ন : মিথেন তো জলার গ্যাস। তা থেকে হিরে হয়?

মা : সিনথেটিক ডায়মণ্ড নিয়ে যে-সব রাশিয়ান গবেষক কাজ করছেন, তাঁদের বিশ্বাস, হিরের মাতৃস্থানীয় বস্তু হল মিথেন—কার্বন ডাই অক্সাইড, মানে, $Co_২$ সহজেই ভেঙে গিয়ে কার্বনকে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর সঠিক চাপ আর তাপে হিরে দানা বেঁধেছে। গ্রাফাইট থেকে হিরের উৎপত্তি থিওরিকে এঁরা খারিজ করেছেন। সংক্ষেপে, কার্বন থেকে কার্বনের কৃস্ট্যাল তৈরি হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর peridotite ম্যান্টলের মধ্যে জমে থাকা গলিত ম্যাগমা-র বিপুল আধারে বিশেষ কয়েকটা অনুকূল জায়গায়। গ্যাসের চাপে ওপরে উঠে এসে plastic বা semi-plastic অবস্থায় খাঁজে-খোঁদলে ঢুকে পড়ে নিরেট হতে শুরু করে। ওপরে আসবার সময়ে ম্যাগমা-র রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং আরও অনেক পাথর আর খনিজ টেনে নিয়ে কিমবারলাইট পাথর হয়ে যায়।

প্রশ্ন : হিরের খনিদের বয়স কত?

মা : ৬০ মিলিয়ন থেকে ২৬০০ মিলিয়ন বছর।

প্রশ্ন : মোট কটা হিরে পৃথিবীবিখ্যাত হতে পেরেছে?

মা : প্রায় ৬৪টা। মানে, ৬৪টা রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

ইরাকের মরুযুদ্ধ ও পৌরাণিক অস্ত্র

প্রশ্ন : মাগো, মরুযুদ্ধ ঝটপট শেষ হয় না কেন?

মা : কারণ, মরুযুদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে। হুটপাট সিদ্ধান্ত মরুভূমির যুদ্ধে চলে না। আগে থেকে তৈরি পরিকল্পনা দিয়েও যুদ্ধ চালানো যায় না। অতীতের যুদ্ধগুলো থেকেই অনেক শেখবার আছে।

প্রশ্ন : বালির ওপর লড়াইয়ের কায়দা কি অন্যরকম হয়?

মা : রুক্ষ, ধূসর, ন্যাড়া, নিষ্প্রাণ মরুভূমিকে অনন্ত মহাশূন্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ বড় ভয়ানক জায়গা। নিউ টেস্টামেন্টের শেষ গ্রন্থ Revelation-এ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাট যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিশাল ইউফ্রেটিস নদীকেও শুকিয়ে দিয়েছিলেন ষষ্ঠ পরী। ব্যাবিলন থেকে আরম্ভ করে অতীতের অনেক বড় শহর ছিল এই ইউফ্রেটিসের পাড়ে। ২১০০ মাইল লম্বা এই নদীর বেশ কিছুটা বয়ে গেছে ইরাকের মধ্যে দিয়ে। মরুভূমির শুকনো বালি যুদ্ধ করার উৎসাহ নিভিয়ে দেয়—শত্রুর পেছনে ধাওয়া করার ইচ্ছে আর থাকে না। যে ধুধু বালির তেপান্তরে না আছে সভ্যতার চিহ্ন, না আছে লুকোনোর জায়গা। দাবার ছক যেরকম সাদা কালো খুপরি ঘরের একঘেয়ে লড়াইক্ষেত্র—মরুভূমিও তাই। ছকে বাঁধা রণকৌশল এখানে চলে না।

প্রশ্ন : বাইবেলের সেই যুদ্ধের পর আর কি যুদ্ধ হয়নি ইরাকের মরুভূমিতে?

মা : অনেক হয়েছে। বুকের পাটা যাদের আছে, তারাই করাল মরুভূমির বুকে সামরিক ক্ষমতা জাহির করেছে—যেমনটা চলেছে উপসাগরীয় যুদ্ধে। সাতের শতকে এই বালির সমুদ্রেই যুদ্ধ জিতে আরবরা গড়ে তুলেছিল তাদের সাম্রাজ্য। বিশেষ করে, ৬৩৬ কি ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের দক্ষিণ পশ্চিমে আজকের আল-কাদিশিয়া শহরের কাছে, বেদুইনদের ঘিরে ধরে প্রায় খতম করে এনেছিল পারস্যের বিরাট সৈন্যবাহিনী। কিন্তু আচমকা রেগে টং হয়ে গিয়েছিল ক্রূর মরুভূমি। ঝড় উঠেছিল বিনা নোটিশে। বালির ঝাপটায় প্রায় অন্ধ হয়ে গেছিল দুর্ধর্ষ সৈন্যরা—সেই ফাঁকে আরব সৈন্য তাদেরই পাশ দিয়ে শত্রুব্যূহের একদম ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে খতম করে দেয় পারস্য সেনানায়ককে। এই হল মরুযুদ্ধ। আগে থেকে কিছু বলা যায় না। নেপোলিয়ন পর্যন্ত মিশরের মরুভূমিতে হেদিয়ে গেছিলেন—নীল নদের পাশে সৈন্য মোতায়েন রেখেও ১৭৯৮ সালে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : নেপোলিয়নও ব্যর্থ হয়েছিলেন মরুযুদ্ধে?

মা : নেপোলিয়নের মতলব ছিল ভারত আক্রমণ করা। কিন্তু মিশরের মরুভূমিতেই শেষ হয়ে যায় তাঁর সেই স্বপ্ন। বিলেত আমেরিকার বড় বড় যোদ্ধারা খুব বেশি লড়াই দেখাতে যাননি এই মরুভূমিতে। নেপোলিয়নের স্বপ্নভঙ্গের ১৪০ বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে উত্তর আফ্রিকায় প্রথমে ইউরোপিয়ানরা, পরে আমেরিকানরা বড় মাপের মরু লড়াইয়ে নেমেছিল। কিন্তু পশ্চিম মিশরের এল আলামেইনের যুদ্ধে যে রকম নাটক আর সঙ্কট দেখা গেছিল—সেরকমটা দেখা যায়নি আর কোনও যুদ্ধেই। এই যুদ্ধেই পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছিলেন দুই সেনাধ্যক্ষ—জার্মানির আরউইন রোমেল আর বৃটেনের বার্নার্ড মন্টগোমারি। খেল দেখিয়েছিলেন বটে মরুশিয়াল।

প্রশ্ন : মরুশিয়াল! যুদ্ধ লড়েছিল?

মা : ফিল্ড মার্শাল রোমেল এই খেতাব অর্জন করেছিলেন—মরুযুদ্ধে অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি আর চমকপ্রদ ধূর্ততা দেখিয়ে। ১৯৪১ সালে হিটলার তাঁকে পাঠিয়েছিলেন ইটালিয়ানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে, ব্রিটিশদের উত্তর আফ্রিকা থেকে তাড়ানোর জন্যে। গোহারান হারছিল ইটালিয়ানরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে। মহাধূর্ত রোমেল এই যুদ্ধেই 'মরু শৃগাল' খেতাব পেয়েছিল অদ্ভুত রণকৌশল মাথা খাটিয়ে বের করে। 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতি নিয়েছিলেন—তৈরি প্ল্যান ছুঁড়ে ফেলে দিতেন প্রয়োজন মনে করলেই। মাসের পর মাস যুদ্ধ চলেছে—রোমেলের সাঙ্গপাঙ্গরা হতভম্ব হয়ে গেছে তাঁর আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে। ব্রিটিশ সৈন্যদল মাত্র দু-মাসে ১,৩০,০০০ ইটালিয়ানদের বন্দী করে তাদের প্রায় হারিয়ে এনেছিল। কিন্তু ১৯৪২-এর জুলাই মাসে জার্মানরা অদ্ভুত কায়দায় অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ঘটিয়ে ব্রিটিশদের খেদিয়ে নিয়ে যায় লিবিয়ান মরুভূমির ওপর দিয়ে মিশরের ভেতরে। এল-আলামেইন ঘাঁটি ছাড়া ইংরেজদের হাতে তখন আর কিছুই ছিল না। এবং তখনই আসরে নামলেন এক ছিটগ্রস্ত সেনাধ্যক্ষ।

প্রশ্ন : ছিটিয়াল সেনাপতি?

মা : লেফটেন্যান্ট জেনারেল বার্নার্ড মন্টগোমারি ডিসিপ্লিনের এমনই অন্ধভক্ত ছিলেন যে লোকে তাঁকে বলত eccentric disciplinarian। নাৎসীদের হাতে কোণঠাসা হয়ে গিয়ে কিন্তু এঁকেই পাঠালেন উইন্সটন চার্চিল—ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। বৃটিশ সোলজাররা তাঁকে 'মন্টি' বলে ডাকতো। মন্টি-ই ঝটপটে নতুন করে গড়ে তুললেন সৈন্যদের ভাঙা মনোবল। ইনিও উপস্থিত বুদ্ধির জোরেই লড়াই চালিয়েছিলেন—চার্চিলের হুকুমের তোয়াক্কা রাখেননি—১৯৪২-এর আক্রমণে পাল্টা আক্রমণ চালাননি। উনি জেনে গেছিলেন, রোমেলের সৈন্যদের রসদ আসছে অনেক লম্বা পথে—জার্মান হাই কম্যাণ্ডের সমর্থনও তেমন বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই 'মন্টি' নতুন ট্রেনিং দিলেন নিজের সৈন্যদের—অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের পাহাড় জমিয়ে ফেললেন। অক্টোবরের ২৩ তারিখে তৈরি হলেন পাল্টা আক্রমণের জন্যে।

প্রশ্ন : মরু-শিয়াল কি তা জানতেন না?

মা : উনি তখন তৈরি ছিলেন না। পেটের অসুখের চিকিৎসার জন্যে আকাশপথে গেছিলেন ইউরোপে—যুদ্ধের ভার দিয়ে গেছিলেন ডেপুটির হাতে। এদিকে মিত্রশক্তির সৈন্য আর ট্যাঙ্কের সংখ্যা বেড়ে গেছে অক্ষশক্তির সৈন্য আর ট্যাঙ্কের চেয়ে। জার্মানদের রসদ যে পথে আসছে, তা তছনছ করে দিচ্ছে ব্রিটিশদের প্লেন আর যুদ্ধজাহাজ। তার চাইতেও বড় কথা, কূটবুদ্ধি ব্রিটিশরা জার্মানদের ভেতরে এনে দিয়েছিল একটা ভুল বিশ্বাস

—মিত্রপক্ষ নাকি হানা দেবে দক্ষিণ দিক থেকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাতে বৃটিশ বাহিনী বোমাবর্ষণ শুরু করেছিল ৯০০ কামান থেকে। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বেধে গেছিল তখুনি। হট্টগোলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান ডেপুটি সেনাধ্যক্ষ। হিটলার হুকুম দিলেন মরু-শৃগাল যেন এখুনি ফিরে গিয়ে আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যান। কিন্তু পনেরো আনা ট্যাঙ্ক খুইয়ে মরু-শৃগালকেও ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হল ৪ নভেম্বরে। আনন্দে ফেটে পড়ে বলেছিলেন চার্চিল—'এল-আলামেইনের আগে কখনো যুদ্ধে জিতিনি—এল-আলামেইনের পরে কখনো যুদ্ধে হারিনি।'

প্রশ্ন : কিন্তু মা, উপসাগরীয় মরুযুদ্ধে অন্যরকমের অস্ত্রশস্ত্র দেখা গেছে না?

মা : ভড়কে দেওয়ার মতো হাতিয়ার দেখিয়ে দিয়েছে দুই পক্ষই। ঠিক যেন হাজার হাজার বছর আগেকার রামায়ণ মহাভারতের অস্ত্রশস্ত্রগুলো নতুন করে ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন : কি যে বলো! বিংশ শতাব্দীতে রামায়ণ মহাভারতের অস্ত্র?

মা : হুবহু সেইগুলোই কি হচ্ছে! কিন্তু পৌরাণিক হাতিয়ারগুলোকেও তো আর কাল্পনিক মনে হচ্ছে না। যেমন ধর না, ব্রহ্মশির অস্ত্র। মানে, ব্রহ্মতেজপূর্ণ অস্ত্র। দ্রোণ তাঁর ছেলে অশ্বত্থামাকে দিয়েছিলেন এই অস্ত্র। অর্জুনও পেয়েছিলেন এই একই অস্ত্র। দ্রোণ কিন্তু তাঁর ছেলেকে বলে দিয়েছিলেন, খুব বিপন্ন হলেও খবরদার এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে যাবে না। অশ্বত্থামা কিন্তু অর্জুন, ভীম আর যুধিষ্ঠিরকে রথে চেপে তেড়ে আসতে দেখেই প্রাণের ভয়ে ছুঁড়েছিলেন ব্রহ্মশির অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে কালান্তক যমের মতো আগুন ঠিকরে গেছিল। অর্জুনও ব্রহ্মশির ছুঁড়ে অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকুটি করতে গেলেন। তাঁরও অস্ত্র জ্বলে উঠল প্রলয়ের আগুনের মত। এ যেন ঠিক স্কাড মিসাইলকে ঘায়েল করার জন্যে ছোঁড়া হচ্ছে প্যাট্রিয়ট মিসাইল। বুনো ওলের বাঘা তেঁতুল!

প্রশ্ন : সত্যি মা! খ্যাপা ক্ষেপণাস্ত্রদের সার্কাস হয়ে গেল যেন। সেকালে কি এরা ছিল?

মা : সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে প্রাস নামে একটা ক্ষেপণাস্ত্রের কথা আছে পুরাণে। সাত হাত লম্বা বাঁশ জাতীয় ডাণ্ডার মাথায় লোহার তীক্ষ্ণ ফলক, মূলে সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা, ফলকের নিচে আর মূলে সিল্কের স্তবক ঝুলত থোকা থোকা। এ ছাড়াও আগুন ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রও ছিল বইকি। সায়েন্স-ফিকশন বলেই মনে হয়েছে। এখন তো দেখছি সায়েন্স ফিকশন সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাতে করে ছোঁড়ার মত রোবট ক্ষেপণাস্ত্রও এসে গেছে উপসাগরীয় যুদ্ধে।

প্রশ্ন : রোবট ক্ষেপণাস্ত্র?

মা : রোবটদের তো ভয়ডর নেই, ক্লান্তি কি জিনিস তাও জানে না, কাজেই রোবট সোলজারদের আবির্ভাব তো ঘটবেই মরুযুদ্ধে—অতীতের শিক্ষা থেকেই বোধহয় রোবট যোদ্ধাদের বানানো হয়েছে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের জন্যে। রক্তমাংসের মানুষকে মরুভূমি হেদিয়ে দিতে পারবে—রোবটদের হবে কচু। যেমন RPV অথাৎ Remotely Piloted Vehicles, সবচেয়ে নিরীহটাকে দেখলে আঁতকে উঠতে হবে না। ওজনে মাত্র প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম। পিঠের ঝোলায় বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ডানা ছড়িয়ে যায় ২·৭ গজ পর্যন্ত। স্রেফ হাতে রেখে উড়িয়ে দেওয়া যায় ক্ষুদে ক্ষেপণাস্ত্রকে। তারপরেই তাকে গাইড করে রেডিও। একটানা উড়ে যায় কয়েক ঘন্টা। তখন কিন্তু সে উড়ুক্কু গোয়েন্দা। শত্রুরা কে কোথায় কীভাবে ঘাঁটি গেড়ে হাতিয়ার সাজিয়ে বসে আছে, সমস্ত কিছুর ছবি পাঠিয়ে যায় মানুষ-মালিকদের কাছে।

প্রশ্ন : তাজ্জব রোবট তো! শত্রুপক্ষ টের পায় না?

মা : না। উড়ুক্কু রোবটের ইলেকট্রিক মোটর চলে নিঃশব্দে। আকারেও এত ক্ষুদে যে চোখে ধুলো দিয়ে উড়ে যায় অনায়াসে—তাই তাকে মাটিতে পেড়া ফেলাও যায় না। এদিকে কম্যাণ্ডার সাহেব মাইল কয়েক দূরে টিভি স্ক্রীনের সামনে বসে তোফ আরামে দেখে যাচ্ছেন পর্বতমালার ওদিককার দৃশ্য। আগে হলে, সৈন্য পাঠিয়ে খবর আনতে হত—তারা হয়তো জানেও মরতো—কিন্তু এখন সে সবের কোনো ঝুঁকি নেই। আজব এই রোবট স্পাইকে বানিয়েছে আমেরিকার রোবোটিক টেকনোলজিস কোম্পানি। খামোকা যাতে কোনো পক্ষেই মানুষ মারা না যায়—তাই এত আয়োজন। রোমেল যে-যুদ্ধে হেরে পিটটান দিয়েছিলেন, সেই যুদ্ধে মারা গেছিল ৩২,০০০ জার্মান সৈন্য, ১৩,৫০০ মিত্রপক্ষের সৈন্য। এখন কিন্তু রোবটরা এসে চুলচেরা ছবি আর সঠিক খবর পাঠিয়ে রোধ করছে এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ আর অহেতুক নরহত্যা।

প্রশ্ন : জয় হোক রোবটদের! এয়ার ফোর্সকে তাহলে এখন পিঠে ঝুলিয়ে রাখা যায়?

মা : ঠিক তাই। খরচ পড়ে মাত্র চল্লিশ হাজার ডলার। পাইলট সমেত একটা বড় উড়োজাহাজের পেছনে খরচ পড়ে দু কোটি ডলার।

প্রশ্ন : সবচেয়ে ভাল হত যদি রোবট উড়িয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যেত। তাই না, মা?

মা : তাহলে তো রামায়ণের জিম্ভকাস্ত্র তৈরি করতে হয়।

প্রশ্ন : জিম্ভকাস্ত্র কী মা?

মা : যে অস্ত্র নিক্ষেপ করলে হাই তুলতে তুলতে শত্রুরা ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : মিসাইলের মাথায় ঘুমের ওষুধ পাঠিয়ে দিলেই তো হয়?

মা : তোর ব্রেনটা সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। তোরা দুজনেই মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়িসনি। তিনি হুমকি ছেড়েছিলেন, মরণ ঘুমের কেমিক্যাল আর বিষ গ্যাস পাঠাবেন মিসাইলের মাথায়। ট্র্যানইলাইজার পাঠালেও তো হয়—স্নায়ু শীতল হয়ে যুদ্ধের নেশা কেটে যাবে।

প্রশ্ন : তাহলে তো কেউ হারবে না?

মা : হারজিতের কথা এখন রাখ—অস্ত্রশস্ত্রের ওই ইঁদুর দৌড়ের খবর-টবর রাখ। উপসাগরের সেই যুদ্ধে পাঁচ লক্ষরও বেশি আমেরিকান সৈন্য আর ৩১টা দেশের সৈন্যরা সৌদি আরবকে আগলাতে আর কুয়েতকে ইরাকের খপ্পরমুক্ত করতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র...তার সব বলতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। শুধু আমেরিকান বাহিনীই এনেছিল অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির সাত রকমের হেলিকপ্টার যা দিয়ে জমিন্-যোদ্ধাদের খুব কাছ থেকে মদত দেওয়া যাবে। চার রকমের সাঁজোয়া গাড়ি, ছ'রকমের আকাশ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, পাঁচ রকমের কামান ব্যবস্থা, তিন রকমের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : ইরাকের হাতিয়ারের ভাঁড়ারে কী ছিল?

মা : হাই-টেক অস্ত্রশস্ত্র, মিলিটারি টেকনোলজি ইদানীংকালে যা কিছু বানিয়েছে—তার সবই।

প্রশ্ন : ইরাক বানিয়েছিল এত আধুনিক হাতিয়ার?

মা : এটাই আসল প্রশ্ন! এত বড় বড় অস্ত্র ইরাক একা বানায়নি, অনেকদিন ধরে তাকে দেওয়া হয়েছে। জমির ওপর থেকে জমির লক্ষ্যবস্তুতে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্যে। রয়েছে সোভিয়েত স্কাড মিসাইল, রয়েছে মিগ ফাইটার বিমান। একা সোভিয়েত নয়, চিন, ব্রিটেন, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, ব্রেজিল, আমেরিকা, স্পেন—এরাও শক্ত করেছে সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধের হাত। বেশি করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়েছে সাদ্দামের

অত্যাধুনিক কামানগুলো। আরও ভয়ঙ্কর আমেরিকার আকাশ গোলা। ইরাকের পনেরো ফুট পুরু কংক্রিট ফুটো করে পাতাল ঘরও উড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে তো এবার বালির তলায় পাতাল ঘরেও নিস্তার নেই সৈন্যবাহিনীর।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধে সত্যিই কি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল?

মা : হয়েছিল বলেই মনে করেন কিছু পণ্ডিত। পৌরাণিক অস্ত্রগুলোকে মোট ছ-ভাগে ভাগ করা যায়। ১) যন্ত্রমুক্ত—যা কিনা ক্ষেপণাস্ত্র, ইঞ্জিন দিয়ে ছোঁড়া হত; ২) হস্তমুক্ত—যা কিনা গ্রেনেডজাতীয় হাতিয়ার, হাতে করে ছোঁড়া হত; ৩) মুক্তামুক্ত—ত্রিশূল,বর্শা ইত্যাদি; ৪) বজ্র ও বিদ্যুৎ অস্ত্র—Themesteos যাদেরকে কামান বলে মনে করেন; ৫) তোমর, ভিন্দিপাল, কৃপাণ, ক্ষেপণি, নারাচ, রিষ্টি, ইত্যাদি; ৬) শতঘ্নী আর নালিক—ঐতিহাসিক লসেন এদেরকে কামান বলে মনে করেন।

প্রশ্ন : বাল্মীকি যুগের প্রধান অস্ত্র কী ছিল?

মা : বাণ। 'বাণ' শব্দ দিয়ে কিন্তু নানারকম যন্ত্রকেও বোঝাতো। প্রত্যেকটা যন্ত্রকে গড়া হত কীভাবে, তাদের দেখতে ছিল কী রকম—সবই লেখা আছে রামায়ণে। বিশেষ-বিশেষ শক্তি থাকত এক-একটা অস্ত্রে—তাই তাদের বলা হত দৈবাস্ত্র। এক-একজন দেবতার নাম জুড়ে দেওয়া হত এক-একটা অস্ত্রে। যেমন, ঐন্দ্র, ব্রাহ্ম, পাশুপত, ব্রহ্মশক্তি, ইত্যাদি অস্ত্রগুলোকে দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, প্রভৃতি ঋষিরা। এসব অস্ত্রের ব্যবহার ভালভাবে জানতেন শুধু এঁরাই। রামচন্দ্রকে অস্ত্র ব্যবহারের সঠিক শিক্ষাও দিয়েছিলেন এঁরা।

প্রশ্ন : বিশেষ শক্তির বাণ?

মা : কোনও বাণ ছিল আগুনের মত, কোনওটা সূর্যের সমান, কোনওটা বিদ্যুত আর উল্কার মত, কোনওটা ধোঁয়া রঙের। শুনে কি নিরীহ বাণ অথবা যন্ত্র মনে হচ্ছে?

প্রশ্ন : যন্ত্রের শক্তি বলেই তো মনে হচ্ছে। আগ্নেয় অস্ত্রগুলো ছিল কী রকম?

মা : এদের ভেতর থেকে ঠিকরে যেত আগুনে-গোলা আর আগুন-ছিটকানো তাল-তাল ধোঁয়া। ইঞ্জিনের শক্তির কথা আগেই বলেছি। কামান ছাড়া আর কিছু মনে হয় কি?

প্রশ্ন : সবই তো মনে করে নিতে হচ্ছে! আর কী কী অস্ত্র ছিল?

মা : বায়ব্য অস্ত্র—যা দিয়ে বাতাসের গতি বাড়িয়ে দেওয়া যেত। 'বাণ' নিক্ষেপ করে বাতাসের গতি বাড়িয়ে দেওয়া মানে ঝড় তৈরি করা। আচমকা এক জায়গায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর সে-জায়গায় বাতাস গরম আর হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে যায়, চারদিক থেকে ঝড়ের বেগে বাতাস ধেয়ে আসে। কি প্রচণ্ড শক্তি সেই অস্ত্রের মধ্যে থাকলে এমন ঝড় তোলা যায়? আরও আছে, আরও আছে। 'পর্জন্য' অস্ত্র দিয়ে মেঘবৃষ্টি আর জল আকর্ষণ করা যেত। সোজা কথায়, 'বাণ' মেরে আকাশ ভরিয়ে দেওয়া হত ঘন মেঘে, তারপর হুড় হুড় করে জল নামানো হত সেই মেঘ থেকে। আধুনিক রণকৌশলে এ-ধরনের বৈজ্ঞানিক অস্ত্র অবাক কিছু নয়—কিন্তু বাল্মীকিমশায় এ-রকম যুদ্ধাস্ত্র না দেখে লিখলেন কী করে?

প্রশ্ন : কল্পবিজ্ঞান লিখতেও তো পারেন?

মা : যা মনে করিস। 'সম্মোহন' অস্ত্রের হুমকি কিন্তু ইরাকে শোনা গেছে। রামায়ণী যুদ্ধে ছিল এই অস্ত্র।

প্রশ্ন : 'সম্মোহন' অস্ত্র?

মা : ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় ঘুমপাড়ানি ওষুধ পাঠানোর কথা বলছিলি একটু আগে। খুব সম্ভব ইরাক শেষ ঘুমপাড়ানি বোমার ট্রায়াল দিয়েছে ইরানের সঙ্গে লড়বার সময়ে। বসরার উত্তরে ইরানি সৈন্যরা শেষ ঘুম ঘুমিয়ে পড়েছিল সারা শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন না নিয়ে। নিশ্চয় অজানা কোনও জীবাণুর আক্রমণে। এই জীবাণু বোমাই নাকি ইরাকের হাতে তুরুপের তাস হয়ে উঠেছিল। আর এক যুদ্ধবাজরা হুমকি দিচ্ছেন এমন অস্ত্রের যা সেই অঞ্চলের সমস্ত অক্সিজেন টেনে নেবে—এমনকি ফুসফুসের ভেতর থেকেও। তার মানেই তো প্রথমে শ্বাসকষ্ট, তারপর মৃত্যু! রামায়ণী যুদ্ধেও 'সম্মোহন' অস্ত্র দিয়ে শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। কী ছিল সেই অস্ত্রে? বিষ গ্যাস না জীবাণু?

প্রশ্ন : রকেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কামানের গোলা?

মা : মাটির ওপর লড়াইতে ট্যাঙ্ক আর কামানের দরকার আছে। আমেরিকার আব্রামস ট্যাঙ্ক এদিক দিয়ে অজেয় বললেই চলে। পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণুযুদ্ধেও টিকে থেকে লড়ে যাবে—দুর্বলতা শুধু একটা জায়গায়; ৪৫ মাইল অন্তর তার 'দেখভাল' না করলেই নয়। ইরাক কামানের দিক দিয়ে কিন্তু টেক্কা মেরেছে আমেরিকাকে—বিশাল কামান হাউৎজার-ই আছে ১০০টা—যা থেকে রাসায়নিক শেল-ও ফেলা যাবে ৩১ মাইল দূরে। এত বড় কামান আমেরিকার নেই। তবে পাল্লা দিতে পারে রকেট আর কপারহেড ছুঁড়ে—হাউৎজারের গোলা শূন্যে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইলেট্রকনিক সঙ্কেত এসে গেলেই। আমেরিকা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারে এগিয়ে থাকলেও ইরাক এগিয়ে ছিল জীবাণু-যুদ্ধের ব্যাপারে।

প্রশ্ন : জীবাণু-বোমা নাকি? পরমাণু বোমার চেয়েও সাংঘাতিক?

মা : অনেক...অনেক মারাত্মক। এরকম বোমা নাকি আগে কখনও ব্যবহার করা হয়নি বলে সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিল। কিন্তু হয়তো ইরাক ট্রায়াল দিয়েছে জীবাণু-বোমার—ইরানের সঙ্গে লড়বার সময়ে। বসরার উত্তরে ইরানি সৈন্যরা শেষ ঘুম ঘুমিয়ে পড়েছিল সারা শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন না নিয়ে। নিশ্চয় অজানা কোনো জীবাণুর আক্রমণে।

প্রশ্ন : অজানা জীবাণু বলছো কেন?

মা : একেবারে অজানাই বা বলি কী করে? আফ্রিকার ৎসেৎসি (tsetse) মাছির কামড়ে ট্রিপানোসোম প্রোটোজোয়া শরীরে ঢুকে শেষ ঘুম এনে দেয়। বোটুলিজম রোগে জীবাণু যে টক্সিন বানায়, তা নার্ভের প্যারালিসিস ঘটায়। অনেক যন্ত্রণার পর আসে মৃত। জৈব অস্ত্র বানাতে গিয়ে আরও সাংঘাতিক কোন জীবাণু মানুষেরই হাতে তৈরি হয়ে যায়নি তো? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কালান্তক 'এডস' রোগের ভাইরাস মানুষেরই তৈরি। এক্সপেরিমেন্টের সময়ে ল্যাবোরেটরি থেকে সটকান দিয়ে গোটা পৃথিবীকে জ্বালিয়ে মারছে। মানুষের পরম শত্রু গুটিবসন্তের ভাইরাসকে কড়া পাহারায় গোপনে রেখে দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকায়। সাদ্দাম হোসেন মিসাইলের মাথায় কালান্তক জীবাণু যদি পাঠাত, তাহলে সেই অস্ত্র বুমেরাং হয়ে যেতে পারত।

প্রশ্ন : ব্যুমেরাং হবে জীবাণু বোমা?

মা : জীবাণু কি পোষা কুকুর যে মালিকের হুকুম মতো চলবে? তাকে ছেড়ে দিলে শত্রুসৈন্য সাবাড় করে সাদ্দামের দেশও তো ছারখার করে ছাড়তে পারে—যদি না অল্পায়ু, হয় সেই জীবাণুরা।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, সাদ্দাম হোসেন এত যোগাড়যন্ত্র করলেন কী করে?

মা : যাদের সঙ্গে লড়লেন, তারাই অনেক দিন ধরে দামি-দামি জোরালো হাতিয়ার সাপ্লাই করে এত ডেঞ্জারাস করে তুলেছেন সাদ্দামকে। এ ছাড়াও পৃথিবীবিখ্যাত আমেরিকান এক্সপার্টকেও সাদ্দাম কাজে লাগিয়েছেন স্রেফ টাকার জোরে।

প্রশ্ন : আমেরিকান এক্সপার্টকে কিনে নিয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন?

মা : নাম তাঁর জেরাল্ড বুল। দু-যুগ ধরে ইরাক তার শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্র তৈরি করেছে। ১৯৭০ সালে আনিয়েছে স্কাড-B মিসাইল। তার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে বানিয়েছে আল-হুসেন আর আল আব্বাস মিসাইল। দূর পাল্লায় আঘাত হানবার জন্যে। দুটোই প্রচলিত আর রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র মাথায় বয়ে নিয়ে যেতে পারে। রাসায়নিক আর জৈব অস্ত্রের এই যে সম্ভার সৃষ্টি—সেই সঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি—তার গল্পের শুরু ১৯৭৪ সালে—যদিও গল্পটা আজও সঠিকভাবে বলা হয়নি। এ খবর বেরোয় নামী ব্রিটিশ দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট'-এ।

প্রশ্ন : গল্পটা বলবে তো?

মা : ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈব আর সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞানের চার হাজারেরও বেশি বৈজ্ঞানিকদের কাজে লাগায় ইরাক। ১৯৮০ সালে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হতেই ইরাকের তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাদ্দাম হোসেন প্রাইভেট প্লেন পাঠিয়ে জেনেভা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসেন জেরাল্ড বুল-কে—পৃথিবীবিখ্যাত কামান বিশেষজ্ঞ—যাঁর সারা জীবনের অবসেশন ছিল এমন একটা 'সুপারগান' বা অতিকায় হাউজার কামান বানাবেন—যা স্যাটেলাইটকে সটাসট উঠিয়ে দেবে মহাশূন্যে অথবা হাজার হাজার মাইল দূরের শত্রু এলাকায় দমাদম নিক্ষেপ করবে কামানের গোলা। বুল সাহেবের এই আকাশ কুসুম স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে বটে, কিন্তু দশ-দশটা বছর ইরাকের গোলামি করে বানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী থানকয়েক কামান।

প্রশ্ন : জেরাল্ড বুল! জন্মস্থান?

মা : কানাডা। ছিলেন অ্যাসট্রো-ফিজিসিস্ট, হয়ে গেলেন আর্টিলারি এক্সপার্ট। গবেষণা চুক্তি ছিল মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে, কাজ করেছেন খোদ আমেরিকান পেন্টাগনেও, বিশাল বিশাল কামান সাপ্লাই করেছেন অনেক দেশে—বিশালতমগুলো বানিয়েছেন ইরাকের জন্যে—১৯৯০-র ২২ মার্চ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত—যে মৃত্যু নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়—কিন্তু থাক সেই রটনা। এর তৈরি GC-45 হাউৎজার কামান দেগে পরমাণু বোমা, রাসায়নিক বোমা পর্যন্ত ফেলা যায় ২৫ মাইল দূরে। সেই সব গোলার ওজন বিলেত আমেরিকার সেরা কামানের গোলার ডবল।

প্রশ্ন : সর্বনাশ! মিসাইল-ও বানিয়েছিলেন কি বুলসাহেব?

মা : স্কাড মিসাইলের রেঞ্জ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়াও বানিয়ে দিয়েছেন আল-ফাও আর মজনুন নামে দুটো অত্যুন্নত কামান। শুধু আল-ফাও থেকেই মিনিটে চারটে ১০৯ কেজি ওজনের শেল ছোঁড়া যায় ৩৫ মাইল দূরে ফেলার জন্যে। দুটো কামানই ঘণ্টায় ৭২-৮৮ কিলোমিটার স্পিডে ধেয়ে যেতে পারে রাস্তা বেয়ে।

প্রশ্ন : নল-বানর সত্যিই কি রোবট?

মা : রামায়ণ মহাভারতের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য যন্ত্রের মত হাতিয়ারদের নিয়ে লেখা খান পঞ্চাশেক বইয়ের নাম আমি জানি। আরও আছে। নিরঞ্জন সিংহ তাঁর একখানা বইতে থ হয়ে যাওয়ার মত একটা প্রশ্ন রেখেছেন:

হনুমান কি টেলিস্কোপিক রকেট?

প্রশ্ন : হনুমান? টেলিস্কোপিক রকেট? মানে?

মা : দানিকেনও মহাভারতের দিব্যাস্ত্রগুলোর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মহাভারত বাইবেলের চাইতেও বেশি Comprehensive —আধুনিক জ্ঞানের আলোয় এই মহাগ্রন্থ পাঠ করলে আখেরে কাজ দেবে। ১৯৭৫ সালের অগাস্টে কলকাতার জাদুঘরে দানিকেনের সামনে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের নানারকম ঘটনাগুলোর পেছনে বাস্তব বিজ্ঞানের হাত আছে। রামায়ণ মহাভারত, বেদ-বেদান্ত, ইত্যাদি ভারতীয় শাস্ত্রের অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বলে তিনি মনে করেন। যাই হোক, নল-বানর আসলে রোবট ছিল কিনা খতিয়ে দেখা যাক; রামায়ণের আদিকাণ্ডের ১৭ সর্গে ব্রহ্মা দেবতাদের ফরমাস করলেন, এমন সহায় বানাতে হবে রাম বেচারার জন্যে, যে সমস্ত হাতিয়ারদের দাপট তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। উনি নাকি নিজেও জাম্ববান তৈরি করে ফেলেছেন এই মতলবেই। দাপুটে রাবণকে খতম করতে হলে রামের হাতে দিতে হবে আরও দাপুটে সহায়। ব্রহ্মার গ্রীন সিগন্যাল পেয়েই অমনি ইন্দ্র তৈরি করে ফেললেন বালীকে, সূর্য করলেন সুগ্রীবকে, বৃহস্পতি করলেন তারাকে, কুবের করলেন গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা করলেন নলকে, অগ্নি বানালেন নীলকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ্য আর দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, পর্জ্জন্য শরভকে, বায়ু হনুমানকে। এদের সবার চেহারা করা হল বানরের মত —কেন না বানরদের সঙ্গে মিশে থাকতে হবে তো! অথচ সবাই মহাভয়ঙ্কর রোবট! এদের পাণ্ডা হল হনুমান!

প্রশ্ন : মাগো, এ যে মহাভয়ঙ্কর কল্পবিজ্ঞান?

মা : শুনে যা না! বিষ্ণুর বাহন গড়ুর আসলে একটা কলের পাখি—অর্থাৎ মহাকাশযান: রামের বাহন হনুমানকেও তৈরি করা হল সেইভাবে। সব রোবটকেই প্রোগ্রামিং করা থাকে—অথাৎ যে-রোবটের যে নির্দেশ-লিপি, সে তা মেনে চলবে। বিশেষ এই রোবটদের ক্ষমতা তখনই দেখা যায় যখন স্তব-টব করে তাদের প্রোগ্রামিং চালু করে দেওয়া হয়। তখন হনুমান লাফ মারেন শুধু পাহাড়ের ডগা থেকে এবং তখন যা কাণ্ড ঘটে, তা একালের রকেটের 'ব্লাস্ট অফ' দেখে দেখে সবাই জেনে গেছে। নল তো ক্ষুদে বিশ্বকর্মা। তার প্রোগ্রামিং চালু হয়ে যেতেই সে সাগরের ওপর সেতু তৈরি করে দিল পাকা ইঞ্জিনিয়ারের মতই। সুগ্রীব পুরো অঞ্চলে জরিপ করেছিলেন আকাশপথে—যুদ্ধের আগে এখন যা করা হয়—তাই সুগ্রীবের কাছে বসুন্ধরাকে গোষ্পদের মতই মনে হয়েছিল—মাটিতে হেঁটে জরিপ করলে পৃথিবীকে কক্ষনো অমন মনে হয় না।

প্রশ্ন : স্কাড তো এখন হিরো। কাদের আবিষ্কার মা?

মা : সোভিয়েত ইউনিয়নের। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র যুদ্ধ প্রযুক্তি পর্বে স্কাড জাতীয় লড়াকু মিসাইলদের মাঝামাঝি পাল্লায় ফেলা হয়েছে। অথাৎ, দূর পাল্লার মিসাইল এরা নয়। তবে গাড়িতে চাপিয়ে পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দেশদেশান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। জঙ্গলে এমনভাবে লুকিয়ে রাখা যায় যে এরোপ্লেন বা স্যাটেলাইট থেকে খর নজর হেনেও তাদের দেখা যায় না। স্কাড হয় দুরকমের। স্কাড-A সাইজে ছোট। খোলা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। স্কাড-B সাইজে বড়। পুরোপুরি ঢাকা গাড়িতে চাপিয়ে দেশদেশান্তরে পাঠানো যায়। গাড়ির পেছন দিকে উৎক্ষেপক মঞ্চে টিউবের মধ্যে শোয়ানো থাকে—টিউব খাড়া করে নিয়ে ছোঁড়া হয় স্কাড-কে। এদেরই যম প্যাট্রিয়ট অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট মিসাইল। এক একটা উৎক্ষেপকে থাকে তাড়াতাড়ি ছোঁড়ার মত চারটে মিসাইল—যাদের দৌড় ১৫০ কিলোমিটার তো বটেই—

আরও দূরে যেতে পারে। শত্রুপক্ষ ইলেকট্রনিক্স পাল্টা ব্যবস্থা হেনেও প্যাট্রিয়টকে রুখতে পারে না। চারটে মিসাইল ছোঁড়া হয়ে গেলেই আধ ঘন্টাও লাগে না আরও চারটেকে খাড়া করে নিতে। সঙ্কেত-সংবাদে যেই জানা যায়, শত্রুর বিমান বা মিসাইল, ধেয়ে আসছে এবং রয়েছে এখনও ৩০ মাইল দূরে—আকাশে উঠে পড়ে প্যাট্রিয়ট—ধেয়ে যায় উড়ুক্কু টার্গেটের দিকে। টার্গেটে হিট না করেও গায়ের কাছে ফেটে যায় যাতে রাশি রাশি টুকরো ছিটকে গিয়ে জখম করে দেয় শত্রুবিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রকে।

প্রশ্ন : লেসার রশ্মি দিয়ে টার্গেট হিট করার ব্যবস্থা অন্য অস্ত্রে নেই?

মা : আমেরিকান হেলিকপ্টার আর আর্টিলারি-তে আছে বইকি। অ্যাপাচি হেলিকপ্টার অমাবস্যার রাতেও উড়ে গিয়ে লড়ে যেতে পারে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল স্পিডে। পাইলট থাকে দুজন। তাদের হেলমেটের মধ্যে খবর পাঠায় অ্যাপাচি-র নাকে বসানো ইনফ্রা-রেড চাহনি—হেলমেটের সামনের কাঁচের পদায় ফুটে ওঠে খবরের পর খবর। পাইলট টার্গেট হিসেব করে নিয়ে—নিজের চোখে টার্গেটটি না দেখেই—বোতাম টিপে পাঠিয়ে দেয় লেসার-গাইডেড হেল-ফায়ার অর্থাৎ 'নরকের আগুন' মিসাইলকে। অ্যাপাচি তার নিজের লেসার রশ্মি ফেলে রাখতে পারে টার্গেটের ওপর—মিসাইল এগিয়ে যায় সেই পথ ধরে; অথবা অন্য কোনও লেসারের পথেও আঠার মত লেগে থাকে হেল-ফায়ার। সোজা কথায়, পাইলট চোখ বুজিয়ে বসে থাকলেও 'নরকের আগুন' লক্ষ্যবস্তুতে আছড়ে পড়ে নরক সৃষ্টি করবেই। পর-পর ১৬টা 'নরকের আগুন' কে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে একটা অ্যাপাচি-র। আমেরিকার গোলন্দাজ বাহিনীতেও রয়েছে লেসার নিয়ন্ত্রিত 'কপারহেড' শেল—যা নির্ভুল নিশানায় ট্যাঙ্ক-কে ফুটিগটা করে ছাড়বেই। রাতে লড়বার জন্যে নাইট-ভিশন চশমাও পরে থাকে সৈন্যরা।

প্রশ্ন : রামায়ণী 'আগ্নেয়' অস্ত্রকে আধুনিক কামান মনে করছ কেন, মা?

মা : রামায়ণেই বলা হয়েছে, এই অস্ত্রদের ভেতর ফোঁপরা থাকত। কামানের নলের ভেতর ঠিক তাই থাকে। 'নালীক' নামেও একটা অস্ত্র ছিল রামায়ণী যুদ্ধে; এটাও একরকম বাণ। ভেতরে ছিল ছেঁদা—তার মধ্যে থেকে তেড়েমেড়ে বেরিয়ে যেত আগুনে-ছাই আর লোহার গোলা। আধুনিক বন্দুক অথবা কামান ছাড়া আর কী হতে পারে?

প্রশ্ন : উল্কা-র মত দেখতে যে অস্ত্রটা, তার কাজ কী ছিল?

মা : এ থেকে আগুন ছোঁড়া হত—দূরের জিনিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। আধুনিক মর্টার বা Flame thrower কিন্তু ঠিক এই কাজই করে। বাল্মীকি তাকে বাণ বলেছেন। 'কণপ' নামেও একটা অস্ত্র ব্যবহার করেছে যুদ্ধপাগল সৈন্যরা। আগুনের গোলা থাকত তার মধ্যে। আগুনের শক্তিতে ছোট-ছোট গুলি তারা-র মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেত। অথাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে অগ্নিবর্ষণ হত এবং তা চারিদিকে ফেটে ছড়িয়ে যেত। মনে হচ্ছে যেন একটাই গোলা এতগুলো গুলিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে শত্রুপক্ষের মাথার ওপর। আধুনিক যুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে রকেট আকাশের একটা বিন্দু থেকে চারদিকে ধেয়ে যায় ঠিক এইভাবেই। মহাভারতের যুদ্ধেও 'কণপ' অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। 'কুলিশ' অস্ত্রটারও ব্যবহার হয়েছে রামায়ণ আর মহাভারতের যুদ্ধে—যার চেহারা ছিল আকাশের বজ্রের মত।

প্রশ্ন : কুলিশ? আকাশের বাজ?

মা : ইন্দ্রের অস্ত্র। বজ্রের মত অস্ত্র। সে তো ভয়ানক শক্তিতে ঠাসা অস্ত্র। হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি নাকি? বৈদ্যুতিক অস্ত্র? মৎস্যপুরাণ বলছে, দেবতাদের ইঞ্জিনীয়ার রবিকে ভ্রমিযন্ত্রে ভ্রমণ করিয়ে তাঁর তেজ আলাদা করে দিয়েছিলেন। সূর্যের সেই ভয়ঙ্কর তেজ থেকে অষ্টবজ্র তৈরি করেছিলেন—বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, ইন্দ্রের কুলিশ, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি আর কালীর খড়গ। এর মধ্যে বুক কাঁপানো হাতিয়ার হল চক্র, শূল আর কুলিশ। তিনটের পেছনেই রয়েছে সূর্যের শক্তি। কী সেই শক্তি? সৌরশক্তি না লেসার রশ্মিজাতীয় কোনও শক্তি?

প্রশ্ন : পারমাণবিক অস্ত্র নয় তো?

মা : সঠিক বলা মুশকিল। ব্রহ্মাস্ত্র আদৌ পরমাণু বোমা কি না, তা কেউ জানে না। সৌর অস্ত্র বলতে কি বোঝানো হয়েছে? সূর্যশক্তিকে সংহত করে ধ্বংসলীলা চালানো অস্ত্র? এদের নামের মধ্যেই রয়েছে বিস্তর রহস্য। ঠিক যেমন রহস্য রয়েছে 'শতঘ্নী' অস্ত্রটার মধ্যে।

প্রশ্ন : 'শতঘ্নী'? মানে, যে অস্ত্র একই সঙ্গে শত সহস্র মানুষ খতম করতে পারে?

মা : ঠিক বলেছিস। রামায়ণ আর মহাভারত—এই দুটো যুদ্ধেই শতঘ্নী অস্ত্র দেদার ব্যবহার করা হয়েছে। আগ্নেয় ওষধির বলে লোহার কাঁটা-ছাওয়া বিরাট পাথর ছুঁড়ে দেওয়া হত। দুর্গের তোরণে আর প্রাকারেও থাকত শতঘ্নী। ঐতিহাসিক লসেন মনে করেন, শতঘ্নী এক ধরনের কামান। এ ব্যাপারে দ্বিমতও আছে। আসলে কি জানিস, মহাভারত বা রামায়ণের অস্ত্রশস্ত্রগুলোর লম্ফঝম্পর বর্ণনা শুনলে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মনের চোখে প্রলয়সৃষ্টির যন্ত্রদের আভাস পাই, তাদের সঙ্গে এ যুগের বিকট অস্ত্রগুলোর প্রচণ্ড মিল আছে। যত অনুমান আর কল্পনার শুরু সেইখান থেকেই। যেমন, 'তুলাগুড়' বলে একটা অস্ত্র ছিল, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: ভাণ্ডগোলক, নালবন্দুক(?), যন্ত্রযুক্ত, বায়ুস্ফোট, সনির্ঘাত, মহামেঘস্বন। জিনিসটা দেখতে কী রকম, তা কিন্তু বোঝা গেল না। ধ্বনিময় শব্দগুলো থেকে আন্দাজ করা যায়, এমনই একটা যন্ত্র যার হাঁকডাক প্রচণ্ড, যা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আচমকা বাতাস সরিয়ে দিয়ে মেঘগর্জন সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজেই আঘাত হানতে পারে। ভাঁড়ের মত গোলা যদি এমন কাজ করে, তাহলে কি তা হ্যাণ্ড গ্রেনেড? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অজস্র অস্ত্র আর যুদ্ধের জন্য অনেক উপকরণের ব্যবহার হয়েছে। মরুযুদ্ধের সৈন্যরা মরুঝড়ে প্রায় অন্ধ হয়ে যায় চোখে গরম বালি ঢুকে গেলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঠিক তাই করা হয়েছে—শত্রুর শরীরে গরম বালি ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। জ্যান্ত সাপভর্তি কলসি, গরম গুড়, গলানো মোম, গরম তেল—সবই ছোঁড়া হত শত্রুকে টিপ করে।

প্রশ্ন : দিব্যাস্ত্রগুলো লোপ পেয়ে গেল কেন, মা?

মা : অসামান্য ক্ষমতার জন্যেই নিশ্চয় এই অস্ত্রগুলোকে দিব্য নাম দেওয়া হয়েছিল। দিব্যাস্ত্রের সৃষ্টি আর প্রয়োগপ্রণালী ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ গুরুপরম্পরায় এই সব অস্ত্রের সৃষ্টি আর সংহরণবিধি জানতে হত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন প্রমুখ দু-চারজন জানতেন দিব্যাস্ত্রদের কায়দাকানুন। অশ্বত্থামা দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে জানতেন, কিন্তু শেষটুকু ম্যানেজ করতে পারতেন না। অর্থাৎ এমনই সফিসটিকেটেড ওয়েপন যা আনাড়ির হাতে ছাড়া হত না। এ যুগেও তো মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রগুলোকে গোপনেই রাখা হচ্ছে। জেরাল্ড বুল গুপ্তঘাতকের হাতে মারা না গেলে না জানি আরও কত 'দিব্যাস্ত্র' দেখা যেত এই মহাযুদ্ধে। সে

কালের দিব্যাস্ত্রগুলোও হারিয়ে গেছে উপযুক্ত উত্তরসূরীর হাতে তুলে না দেওয়ার জন্যে—এটা আমার অনুমান।

প্রশ্ন : দিব্যাস্ত্র কি এতই অমোঘ ছিল?

মা : দিব্যাস্ত্রগুলো ছিল তুরুপের তাস। একবার তা দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্রতিপক্ষকে পাল্টা দিব্যাস্ত্র ছাড়তেই হত। যেমন, আগ্নেয়াস্ত্রর পাল্টা বরুণাস্ত্র। জল নিভিয়ে দেবে আগুনকে। বায়বাস্ত্রের পাল্টা গুহ্যাকাস্ত্র। গুহ্যাকাস্ত্রটা কি, তা জানা গেল না। খুবই গুহ্য অস্ত্র নিঃসন্দেহে—প্রলয় ঝড়কেও যে টাইট দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত গুহ্য-ই রয়ে গেল আশ্চর্য সেই অস্ত্র। এছাড়াও ছিল পরমাস্ত্র নামে এক অদ্ভুত অস্ত্র।

প্রশ্ন : অদ্ভুত অস্ত্র পরমাস্ত্র? দিব্যাস্ত্রের চেয়েও বড় নাকি?

মা : এই পরমাস্ত্রের নাম 'ত্বাষ্ট্র'। দিব্যাস্ত্র হলেও হতে পারে। রণক্ষেত্রে অর্জুন এই অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। 'ত্বাষ্ট্র' যে নিক্ষেপ করে, তার প্রতিবিম্ব গিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের ওপর। সকলেই তখন সকলের মধ্যে নিক্ষেপ্তার আকৃতি দেখতে পায়। অর্থাৎ শত্রুসৈন্যরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে অস্ত্র-নিক্ষেপ্তা মনে করে। ফলে, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে খতম করতে থাকে। অর্জুন এই অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। কুরুসৈন্যরা আশেপাশে শুধু অর্জুনকেই দেখতে পেয়েছিল—নিজেদের মধ্যেই কাটাকুটি করে শেষ হয়ে যায়। মনে তো হয়, এই পরমা আসলে একরকম মায়া। অথবা, দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টির বিষ গ্যাস।

প্রশ্ন : মায়া দিয়ে যুদ্ধ? অলৌকিক যুদ্ধ নাকি?

মা : হ্যাঁ। মায়াযুদ্ধ যেন ইন্দ্রজালের মত। বাস্তবিকই কোনও অস্ত্র নেই অথচ তার প্রয়োগ অসংখ্য। ম্যাজিকের ফলে সব সত্যি বলেই মনে হয়। রাক্ষস আর অসুররা মায়াযুদ্ধে অথাৎ ম্যাজিকযুদ্ধে ছিলেন অতিশয় নিপুণ। ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধে বিব্রত হয়ে গেছিলেন কর্ণের মত মহাবীরও। তিতিবিরক্ত হয়ে ইন্দ্রর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে 'একবীরহন্ত্রী' শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন ঘটোৎকচের দিকে। জলযুদ্ধের কথাও আছে মহাভারতে।

প্রশ্ন : মহাভারতে জলযুদ্ধ?

মা : নাম তাঁদের নিবাতকবচ। অত্যন্ত ভাল জলযোদ্ধা। সমুদ্রের মাঝে দুর্গ তৈরি করে থাকতেন সেখানে।

প্রশ্ন : সমুদ্রের মাঝে দুর্গ? ভাসমান নাকি?

মা : আজকালকার যুদ্ধজাহাজগুলোই তো এক-একটা ভাসমান দুর্গ। সেকালের ভাসমান দুর্গেও থাকত শতঘ্নী যন্ত্র আর বড় বড় মারণযন্ত্র। ডাঙার দুর্গেও থাকত। ফুটো দিয়ে আগুনের গুলি ছোঁড়া হত শত্রুদের দিকে। কামান বন্দুক বলেই তো মনে হয়।

প্রশ্ন : শস্ত্রবিদ্যায় গুরুপরম্পরার জন্যেই কি এই সব যন্ত্র লোপ পেয়েছে?

মা : হতে পারে। অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছিলেন দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে, দ্রোণাচার্য পেয়েছিলেন অগ্নিবেশ্যর কাছ থেকে, অগ্নিবেশ্য পেয়েছিলেন ভরদ্বাজের কাছ থেকে, ভরদ্বাজ পেয়েছিলেন বৃহস্পতির কাছ থেকে। অর্থাৎ গুরু দিয়েছেন শিষ্যকে—অর্জুন কি দেননি কাউকে?

প্রশ্ন : প্রথম কে বানিয়েছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র?

মা : বিশ্বকর্মা। দেবশিল্পী। দেবতাদের বিমান-নির্মাতা। বৈদিক ত্বষ্টা দেবতার কর্মশক্তি আত্মসাৎ করেছিলেন বলে এঁর আর এক নাম ত্বষ্টা। অথাৎ দেবতাদের গুহ্যবিদ্যাও ইনি জানতেন। রামের জন্যে সেতুবন্ধ তৈরির

সময়ে ইনিই তো নল-বানরকে সৃষ্টি করেছিলেন। একজন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তিনি যন্ত্রই সৃষ্টি করেন। নল কি তাহলে একটা যন্ত্র? রোবট?

প্রশ্ন : দানবদের ইঞ্জিনীয়ার তাহলে কে ছিলেন?

মা : ময়দানব। মায়াবী দানব। অদ্ভুত ক্ষমতা যাঁর থাকে, তাঁকে তো মায়াবী বলেই মনে হয় জামাই রাবণকে ইনিই দিয়েছিলেন এক অমোঘ শক্তি—যার নাম শক্তিশেল—যে শক্তির চোট খেয়ে লক্ষ্মণ চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। শেষকালে এই মহাশক্তিধরকে খতম করার জন্যে ইন্দ্রকে নিক্ষেপ করতে হয়েছিল তাঁর রহস্যময় অস্ত্র—বজ্র।

প্রশ্ন : পাথরের পাতালঘর উড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্র ছিল না?

মা : 'শক্তি' নামে একটা প্রাচীন অস্ত্র ধেয়ে যেত অনেক দূরে—হিমালয়কেও নাকি বিদীর্ণ করতে পারত। এ-অস্ত্রকে দুহাতে তুলে পাঠাতে হত। তাহলে কেন পাথরের পাতালঘর অথবা কংক্রিটের বাঙ্কার ফুটো করতে পারবে না? বাগদাদে আমেরিকানরা কিন্তু লেসার বোমা দিয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

প্রশ্ন : লেসার বোমা?

মা : স্কাডবিধ্বংসী প্যাট্রিয়ট আর নেভির টোমাহক মিসাইলের পরেই হিরো হয়ে গেছে এই লেসার বোমা। আমেরিকার টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস কোম্পানি আশ্চর্য এই অস্ত্র বানিয়ে রেখেছিল পাতালে লুকোনো সোভিয়েত মিসাইল খতমের জন্যে—তাই দিয়ে উড়িয়েছে বাগদাদের বাঙ্কার। হিটলারের ভি-টু'র জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল এশিয়ার মাটিতে, সাদ্দামের ভয়ে না জানি এবার এরকম আরও কত অস্ত্রের পরীক্ষা চলবে এশিয়ার মাটিতে! নিউক্লিয়র আর নিউট্রন বোমার আবিভাব ঘটলেও ঘটতে পারে। এয়ার ফোর্সের লেসার-গাউডেড ২০০০ পাউণ্ড বোমা থেকেই বাগদাদের ৫০০ পাউণ্ড লেসার বোমা তৈরি হয়েছিল। ১৫০০ পাউণ্ড ইস্পাত খোলসের মধ্যে থাকে ভয়ানক বিস্ফোরক tritnol। খোলসের গড়ন এমনই যে কংক্রিট ফুটো করে ঢুকে যায় অনায়াসে—ফিউজটা থাকে ল্যাজের দিকে—প্রথম ধাক্কায় যাতে ফিউজ উড়ে না যায়; সবটা ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সেকেণ্ডের কম সময়ের মধ্যে উড়ে যায় ফিউজ—ফেটে যায় লেসার বোমা। নাকের ওপর লাগানো লেসার নির্দেশক উড়িয়ে নিয়ে আসে লেসার বোমাকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে।

অস্ত্র আর যুদ্ধ

প্রশ্ন : নাপাম বোমা শব্দটার মানে কি, মা?

মা : Napthenate Palmitate একটা যৌগিক পদার্থ। Na আর Palm নিয়ে সন্ধি করে হয়েছে নাপাম। নাপাম বমো প্রথম কারা ছুঁড়েছিল শুনলে অবাক হয়ে যাবি—বাইজানটাইন গ্রীকরা। তাই একে বলা হয় গ্রীক আগুন। গ্রীক আগুনের মূল উপাদানের নাম আগেই বললাম—নাপাম বোমাতেও এই জিনিস আছে। রীতিমত দাহ্য পেট্রোলিয়াম জেলিকে বিশাল গুলতি দিয়ে ছুঁড়ে দিত গ্রীকরা, জলের সংস্পর্শে এলে আপনা থেকেই ধক্ করে জ্বলে উঠত গ্রীক আগুন—তাই বাইজানটাইন যুদ্ধজাহাজে মাথায় করে রেখে দেওয়া হয়েছিল আজব এই আগুনকে। 'গ্রীক আগুন' ইতিহাসের গতিও পাল্টে দিয়েছে বলা যায়। ৭১৬-১৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম আরবরা কন্সতান্তিনোপল অর্থাৎ আজকের ইসতানবুল-কে অবরোধ করা শুরু করেছিল তাদের কাঠের জাহাজ দিয়ে। শহরের বাইজানটাইন শাসক মশায়রা বেগতিক দেখে শরণ নিয়েছিল আগুনের গোলা অর্থাৎ 'গ্রীক ফায়ার'-এর। কাঠের জাহাজ জলের ওপর জ্বলে উঠেছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশালের মত—পুব ইউরোপে ইসলাম আর ছড়িয়ে যেতে পারেনি। তখনকার 'গ্রীক ফায়ার' তৈরি হত কি-কি উপাদান দিয়ে, তা বেশি গোপন করতে গিয়ে ফর্মুলাটাই গেছে হারিয়ে। খুব সম্ভব ন্যাপথা, গন্ধক, পেট্রোলিয়াম, আলকাতরা, তার্পিন তেল, কাঠকয়লা, কলি চুন আর সোরা তো থাকতই।

প্রশ্ন : বলতে পারো প্রথম অস্ত্রগুলো কে, কবে, কোথায় বের করেছিল?

মা : তীর থেকে পরমাণু—পর-পর বলে যাচ্ছি—বাদ দেব কেবল এই ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক অস্ত্রদের—প্রমাণ তো এখনও পাওয়া যায়নি। শুরু করছি খ্রিস্টপূর্ব থেকে: খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০,০০০-এ ছুঁচোলো লম্বা লাঠি—প্রথম বর্শা—ব্যবহার করা হয়েছিল ইউরোপে। ২,৫০,০০০-এ আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপে এল কুঠারের আকারে পাথর। ৪৫,০০০-এ ডগায় পাথর লাগানো বর্শা—ইউরোপে। ৩০,০০০-এ তীর আর ধনুককে মাথা খাটিয়ে বের করা হয়েছিল আফ্রিকায়। ৩০০০-এ প্রথম ধাতুর তলোয়ার আর ব্রোঞ্জের ঢাল তৈরি হয়েছে মেসোপটেমিয়া আর দক্ষিণ পুব ইউরোপে। লড়াকু গাড়ি, মানে, যুদ্ধরথ তৈরি হল সেই প্রথম। ২০০০-এ

মেসোপটেমিয়ায় প্রথম জানা গেল ব্রোঞ্জের বর্মের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ৭০০-এ ফিনিশীয় আর মিশরীয়রা দাঁড়-টানা যুদ্ধজাহাজ নামালো সমুদ্রে। ৫০০-এ গ্রীক আর কার্থেজেনিয়ান-রা চালু করল বিশাল গুলতি আর অতিকায় আড়-ধনুক। ২০০-এ চিনদেশ চালু করল হাতে-ধরা আড়-ধনুক।

প্রশ্ন : খ্রিস্টজন্মের পরের ইতিহাস?

মা : ৩০০ সালে ঘোড়সওয়ারের পা-দান তৈরি হল চিনদেশে। ৯৫০ সালে আতশবাজি আর সঙ্কেতের কাজে লাগানোর জন্যে গান-পাউডার ব্যবহার করল চিনদেশের মানুষ। ১২৫০-১৩০০ সালে খুব সম্ভব চিনের মানুষই ব্রোঞ্জ আর লোহার কামান ব্যবহার শুরু করেছিল; ইউরোপে প্রথম কামান ব্যবহারের রেকর্ড রয়েছে ১৩২৬ থেকে। ১৪৯৫-এ হোলি রোমান সম্রাট 'ম্যাক্সমিলিয়ান প্রথম' নলচের মধ্যে সামনের দিক দিয়ে বারুদঠাসা রাইফেল চালু করলেন বলে জানা যায়। ১৫৮৫-এ Antwerp অবরোধের সময়ে ভাসমান মাইন-বোমা ব্যবহার করে ওলন্দাজরা। ১৬৫০ সালে ইউরোপে বেয়োনেটের প্রথম ব্যবহার দেখালো ফরাসীরা। ১৮০০ সালে মার্কিন আবিষ্কারক রবার্ট ফালটন হাতেনাতে দেখিয়ে দিলেন সর্বপ্রথম ডুবোজাহাজ 'নোটিলস'। ১৮৩৩ সালে বীচ-লোডিং বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেলের ডিজাইন করে দিলেন প্রুসিয়ান আবিষ্কারক জোহান ড্রেজি এই রাইফেলের পেছন দিক দিয়ে গুলি-বারুদ ভরে ঝটিতি ছুঁড়ে দেওয়া যায়। প্রথম বোমাবর্ষণটা হয়েছিল কিন্তু বেলুন থেকে।

প্রশ্ন : বেলুন থেকে বোমাবর্ষণ? কোথায় মা?

মা : ভেনিসে। মানুষ ছিল না সেই বেলুনে। বেলুন উড়িয়ে দিয়েছিল অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা। সালটা ছিল ১৮৪৯। ১৮৬০ সালে প্রথম লোহার পাতমোড়া যুদ্ধজাহাজ HMS Warrior-কে জলে নামায় ইংল্যাণ্ড। ১৮৬২ সালে রিচার্ড গ্যাটলিং আবিষ্কার করলেন 'গ্যাটলিং গান'—বহু-নলা এই বন্দুক থেকে ঘন ঘন গুলিবর্ষণ করা যায় হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে; পাঁচ-নলা মডেল থেকে গুলি ছুটতো মিনিটে ৭০০টা, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১১টা থেকে ১২টা। নরহত্যার জন্যে অস্ত্র নয়—বিশ্বশান্তির জন্যে—এই মহান উদ্দেশ্য ছিল ডিনামাইট যিনি আবিষ্কার করেছিলেন —তাঁর মাথায়।

প্রশ্ন : ডিনামাইটের আবিষ্কারক তো আলফ্রেড নোবেল?

মা : হ্যাঁ। সুইডিশ কেমিস্ট। ১৮৬৭ সালে ডিনামাইট আর ১৮৭৫ সালে জেলিগনাইট আবিষ্কার করেছিলেন। দুটো বিস্ফোরকই পৃথিবীতে শান্তি নিয়ে আসবে, দেশে-দেশে এমনই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যে যুদ্ধবাজ দেশগুলোর লড়াকু-মনোভাব নেতিয়ে পড়বে—এই বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন। যুদ্ধ কিন্তু তারপরেও হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রশ্ন : আরও খুনে হাতিয়ার বেরিয়েছে?

মা : পুরোপুরি অটোমেটিক মেশিনগান আবিষ্কার করলেন আমেরিকান-ইংলিশ ইঞ্জিনীয়ার হিরাম ম্যাক্সিম ১৮৮৪ সালে। ১৯০৬ সালে ইংল্যাণ্ড জলে নামালো বিশ্বের প্রথম ইস্পাতের চাদরে মোড়া টারবাইন-প্রোপেলার-চালিত যুদ্ধজাহাজ HMS Dreadnaught।

প্রশ্ন : আকাশ থেকে মানুষ মানুষের মাথায় বোমা ফেলল কবে মা?

মা : টিনভর্তি ভয়ানক বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিন টুপ টুপ করে এরোপ্লেন থেকে ফেলেছিল ইটালিয়ানরা ১৯১১ সালে লিবিয়া-র আইনজারা-র মানুষের মাথায়।

প্রশ্ন : আকাশ-লড়াই শুরু হল কবে?

মা : ১৯১৫ সালে। জার্মানি আর ব্রিটেন কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি বাই-প্লেন উড়িয়ে লড়ে গেছিল শূন্যপথে। ফ্লেমগ্রোয়ার অর্থাৎ আগুন-ছোঁড়ার প্রথম আধুনিক হাতিয়ারের প্রয়োগ ঘটে এই বছরেই—ঘটায় জার্মান সৈন্যরা।

প্রশ্ন : প্রথম ট্যাঙ্ক?

মা : ইংল্যাণ্ড বানিয়েছিল ১৯১৬ সালে—লণ্ডভণ্ড করে ছেড়েছিল উত্তর ফ্রান্সের Somme যুদ্ধক্ষেত্র। তারপরেই এল টার্বোজেট—১৯৩৯ সালে; নামটা খটমটে—Heinkel He 178—শক্তির পরীক্ষা হয়ে যায় জার্মানিতে। জেট ফাইটার এল তার তিনবছর পরেই—১৯৪২ সালে—আকাশে উড়ে গেল অদ্ভুতনামী Messerschmitt Me 262। ওই বছরেই উড়ুক্কু বোমাকে আকাশে উড়িয়ে যুদ্ধবাজদের থমকে দিয়েছিল জার্মানি।

প্রশ্ন : উড়ুক্কু বোমা?

মা : V-1 ফ্লাইং বম্ব। দু'বছর পরেই ১৯৪৪ সালে জার্মানির V-2 অর্থাৎ A-4 রকেট আছড়ে পড়েছিল সদ্যমুক্ত প্যারিসে। এক বছর যেতে না যেতেই আমেরিকা শুরু করে দিল পরমাণু যুদ্ধের ইতিহাস—১৯৪৫ সালে কুড়ি কিলোটন অ্যাটম বোমা ধুলো করে দিল জাপানের হিরোশিমা-কে। ১০ মেগাটন প্রথম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাও চালিয়ে গেল আমেরিকা ১৯৫২ সালে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রথম ইন্টার কন্টিনেন্ট্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্থাৎ ICBM ছুঁড়ে বাজিমাত করেছিল কিন্তু রাশিয়া ১৯৫৭ সালে; SS-6 অথবা Sapwood নামধারী সেই মিসাইলের দৌড় ছিল ৬০০০ মাইল—নরহত্যার জন্যে নয়—প্রথম স্পুটনিক-কে আকাশে তুলে দেওয়ার জন্যে আবিষ্কারটা করেছিল রাশিয়া।

প্রশ্ন : সেই ICBM এখন দেশে-দেশে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে?

মা : সেটা তো নতুন আবিষ্কারের অপরাধ নয়। ১৯৬৯ সালে প্রথম হ্যারিয়ার 'জাম্প-জেট' তৈরি হয়ে খাড়াইভাবে আকাশে উঠে যাওয়া আরম্ভ করেছিল ব্রিটেনেরইরয়াল এয়ারফোর্সে—এখন তাকে কি কাজে লাগানো হচ্ছে? তবে হ্যাঁ, ১৯৭০ সালে জাহাজ থেকে জাহাজ লক্ষ্য করে ছোঁড়ার মত প্রথম মিসাইল বানিয়েছিল ফ্রান্স জাহাজ ধ্বংস করার জন্যেই। তারপরেই এল নিউট্রন বোমা—১৯৭৭ সালে—যা নির্বিচারে নরহত্যা করে যাবে, কিন্তু তাদের বাড়িঘরদোর অটুট রেখে দেবে! বাহবা দেওয়ার মত তাজ্জব এই বোমা বানিয়েছিল মার্কিন দেশ। প্রথম ট্রাইডেন্ট মিসাইলও বানিয়েছিল মার্কিন দেশ ১৯৮৩ সালে—ওই বছরেই এমন ক্ষেপণাস্ত্র চালু করেছিল ইউরোপ, যা জমি থেকে উড়ে গিয়ে খুঁজেপেতে নিয়ে ধ্বংস করবে লক্ষ্যবস্তু। ১৯৮৪-তে লম্বা ধাপে এগিয়ে গেল মার্কিন দেশ স্যাটেলাইট বিধ্বংসী কামান বানিয়ে। তারপর থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত নির্বিচারে নরহত্যার কতরকম উপকরণ যে বেরিয়েছে—তা তো রোজ খবরের কাগজ পড়েই জেনে ফেলেছিস ইরাকে যুদ্ধের দৌলতে। কিন্তু জানিস কি আরবরা একদিন বন্দুক থেকে সিসের বুলেটের বদলে তীর ছুঁড়ত শএুনিপাত করার জন্যে?

প্রশ্ন : বন্দুকের নল থেকে তীর নিক্ষেপ?

মা : ১৩০০ সালে এইভাবেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ঘটিয়েছিল আরবরা। সিসের নয়, লোহার বুলেটও ছোঁড়া হয়েছিল বন্দুক থেকে—১৩২৬ সালে ইটালির কাউন্সিল অফ ফ্লোরেন্সের একটা দলিল থেকে সেই খবর

উদ্ধার করা হয়েছে। বিস্ফোরক বস্তুটার আসল আবিষ্কারক কে, তা কেউ না জানলেও দশ শতকে চিনদেশে যে এই জিনিস দিয়ে আতশবাজি তৈরি আর সঙ্কেত সৃষ্টি করা হত—তা আমরা জানি। তবে অনেকেই জানেন না, ইউরোপে গান পাউডারের প্রথম ফর্মুলাটা বানিয়েছিলেন যিনি, তিনি যুদ্ধপাগল সৈন্য নন—একজন শান্তিপাগল সন্ন্যাসী।

প্রশ্ন : সন্ন্যাসীর ব্রেন থেকে গান পাউডারের ফর্মুলা?

মা : নাম তাঁর রজার বেকন—বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। জাতে ইংরেজ। ১৩ শতকে তাঁর তৈরি গান পাউডার ফর্মুলায় ছিল সাত ভাগ সোরা, পাঁচভাগ কাঠকয়লা আর পাঁচভাগ গন্ধক। চমকে ওঠার মত আর একটা ঐতিহাসিক খবর দিচ্ছি। ২৯ বছর ধরে একটা শহর ঘিরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার ঘটনা কখনো শুনেছিস?

প্রশ্ন : ২৯ বছর ধরে শহর অবরোধ? এত ধৈর্য কাদের ছিল মা?

মা : মিশরীয়দের। ধৈর্য, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় আজও ইতিহাসে ফার্স্ট হয়ে বসে আছে। খবরটা লিখে গেছেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ঐতিহাসিক হেরোডোটাস। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষের দিকে ইজরায়েলের অ্যাজোটাস শহরকে ঘিরে ধরে একটানা ২৯ বছর বসেছিল। শেষকালে আত্মসমর্পণ করে সেই শহর। আজকে সেই শহরের নাম Ashdod। ইতিহাস ঘাঁটলে এইরকম আরও আজব খবর পাবি। যেমন ধর, ধার করে কামান এনে একটা দুর্গ চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল—তারপর সেই ভাঙা দুর্গ দিয়ে কামানের দেনা শোধ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : কামান দেগে চূর্ণ দুর্গ দিয়ে ঋণ শোধ?

মা : তাজ্জব কি বাৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাজনের দেনা শোধ করার এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। এখানে মহাজন একটা শহর। শহরটার নাম চার্টাস—ফ্রান্সের শহর। টাকা ধার দেয়নি মহাজন—দিয়েছিল খানকয়েক খুনে কামান। ধার নিয়েছিলেন যিনি, তিনি হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নন—ফ্রান্সের ডিউক অফ বারগান্ডি—১৩৬৫ সালে। ক্যামবোল্স্ নামে একটা কেল্লাবাড়িকে গুঁড়িয়ে পাউডার করার ইচ্ছে হয়েছিল ডিউক সাহেবের। কামানের গোলায় অজেয় পাঁচিল ভেঙে পড়তেই ফুরিয়ে গেল কামানের কাজ—কিন্তু দেনা শোধ করতে হবে তো? ডিউক সাহেব মহাজন-শহরকে ক্যামরোল্স্ কাস্ল দিয়ে ঋণমুক্ত হয়ে গেলেন। সেইসঙ্গে আর একটা ঘটনা ঘটিয়ে ছাড়লেন—বিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখলেই যে কাস্ল অজেয় থাকতে পারে—এই ধারণার ইতি ঘটিয়ে ছাড়লেন।

প্রশ্ন : কামানের মুখে কেল্লা! কিন্তু মা, ইউরোপে সেই-কি প্রথম কামান ব্যবহার?

মা : না রে। দলিল-টলিল ঘেঁটে জানা গেছে, ইউরোপে প্রথম কামান চালানো হয়েছিল আরও ১৯ বছর আগে; ১৩৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় এডোয়ার্ড ক্রেসি-র যুদ্ধে গোহারান হারিয়েছিলেন ফরাসীদের। ক্রেসি জায়গাটা ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে। তবে হ্যাঁ, কামান দেগে নয়—তৃতীয় এডোয়ার্ড যুদ্ধে জিতেছিলেন স্রেফ সেকেলে অস্ত্রের জোরে—ইংরেজদের বিখ্যাত লম্বা ধনুকে মহাওস্তাদ তীরন্দাজরা টেক্কা মেরেছিল কামানকেও! তাই বলে কামানকে হেনস্থা করা যায় না। এমন ঘটনাও আছে যখন তোপের মুখে দুর্গের দেওয়াল উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কামান ঢালাই করা হয়েছে দুর্গের পাঁচিলেরই বাইরে।

প্রশ্ন : সেকী! পাঁচিলের পাশে কামান ঢালাই সেই পাঁচিলই ধসানোর জন্যে?

মা : এরই নাম যুদ্ধ পাগলামি। কন্সতানতিনোপল শহরটা ঘেরা ছিল পর-পর তিনটে পেল্লায় পাঁচিল দিয়ে। হাজার হাজার বছর ধরে কত হানাদার এসেছে কন্সতানতিনোপল-কে লুঠ করবে বলে—কিন্তু পাঁচিল তিনটের সামনে ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দিয়েছে। প্রত্যেকটা পাঁচিল ৩০ ফুট অর্থাৎ প্রায় তিনতলা উঁচু, ১৬ ফুট অর্থাৎ প্রায় দেড়তলা পুরু। এইরকম মহাকায় পাঁচিল ভেদ করে কে ঢুকবে? কন্সতানতিনোপল তাই ছিল অজেয় হাজার হাজার বছর ধরে। কিন্তু একদিন বিখ্যাত এই বাইজানটাইন শহরের মানুষগুলোর চক্ষু চড়কগাছ করে ছাড়ল তুরস্কের সৈন্যরা। সালটা মনে রাখিস—১৪৫৩। ৫৫ দিনের মাথায় শহর দখল করে নিল মাত্র ৭০টা কামান দেগে—তার মধ্যে ১২টা ব্রোঞ্জের কামান ঢালাই করেছিল শহরের পাশে—বেজায় ভারি বলে তাদের টেনে এনে পাঁচিলের পাশে খাড়া করতে বলদ লেগেছিল ১৪০টা, মানুষ ২০০ জন। এক একটা কামানের ওজন ছিল ১৯ টন! ভাবতে পারিস? লম্বায় ১৬ ফুট—নলের হ্যাঁ ২৬ ইঞ্চি, ৩৬০ কেজি ওজনের গোলা ছুঁড়ে ফেলত এক মাইল দূরে। সারা দিনে কিন্তু সাতবারের বেশি গোলা নিক্ষেপ করা যেত না একটা কামান থেকে—অত্যন্ত স্লো।

প্রশ্ন : রণক্ষেত্রে কামান তৈরির কথা কখনো শুনিনি, মা! সে কামান এখন কোথায়?

মা : কোনোটাই আর টিকে নেই। তবে হুবহু ওইরকম একটা কামান ঢালাই করা হয়েছিল ১২ বছর পরে ১৮০৭ সালে দারদানেলেস শহরে—শেষবারের মত তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল ব্রিটিশ ফ্রিগেট 'অ্যাকটিভ'কে ফুটো করার জন্যে। 'ফ্রিগেট' মানে তিন মাস্তুলওলা যুদ্ধজাহাজ যাতে ২৮ থেকে ৬০টা কামান থাকে। 'অ্যাকটিভ' ফুটো হয়েছিল বটে—কিন্তু জলে ডোবেনি। পেল্লায় সে কামান এখন রয়েছে 'টাওয়ার অফ লণ্ডনে'।
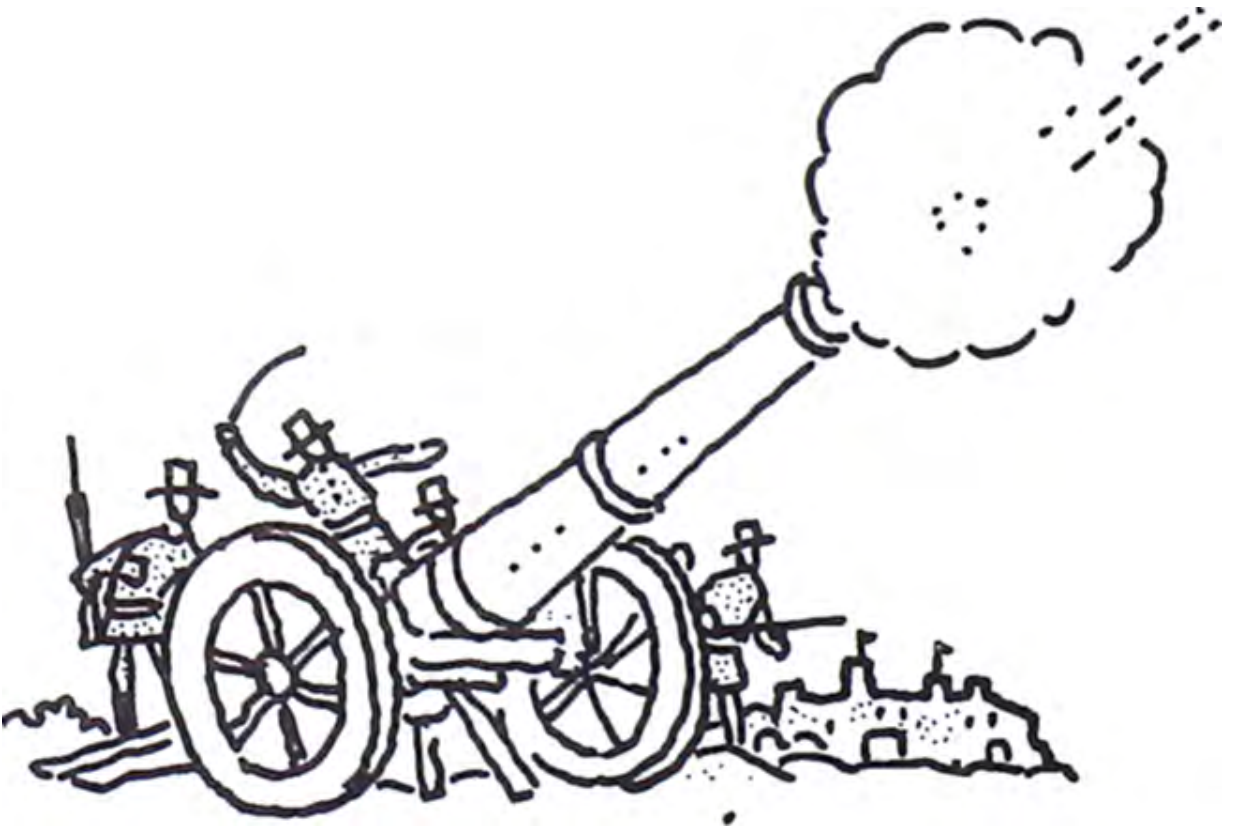
উদ্ভট আইডিয়া

প্রশ্ন : সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে পাক দিচ্ছে, এটা কি সত্যি?

মা : কলকাতার পথেঘাটে, বইমেলার গেটে এই উদ্ভট আইডিয়ার জনককে দেখা যাচ্ছে অনেকদিন ধরেই—রাস্তার ধারে জায়গা পেলেই তিনি লিখছেন তাঁর বদ্ধ বিশ্বাসকে—হ্যাণ্ডবিলও ছেপে বিলোচ্ছেন। তুই নিশ্চয় তাই দেখে ধোঁকায় পড়েছিস। এই ধরনের ডিগবাজি-খাওয়া হরেকরকম ধারণার অনেক প্রবক্তা বিদেশেও আছেন। তাঁদের কিম্ভুত বিশ্বাসগুলোর ব্যাপার শুনলে তোর মাথা ঘুরে যাবে। বল তো, শুক্রগ্রহ আসলে গ্রহ না ধূমকেতু?

প্রশ্ন : শুক্র তো গ্রহ, ধূমকেতু হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

মা : কিন্তু এই কথাই যে ডক্টর ইমানুয়েল ভেলিকোভস্কি বলেছেন তাঁর 'ওয়ার্ল্ডস্ ইন কলিসন্' কেতাবে। বইটা ছেপেছিল বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানি। বৈজ্ঞানিকরা পাছে ম্যাকমিলানের সব বই কেনা বন্ধ করে দেন, এই ভয়ে সে-বই চালান হয়ে যায় অন্য প্রকাশকের কাছে। কিন্তু তাতে ভেলিকোভস্কি-র সমর্থকের অভাব হয়নি। পরে আরো দুটো বই লিখেছেন। তিনটে বইতেই বাইবেলের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার আশ্চর্য ব্যাখ্যা জুগিয়ে গেছেন তাঁর পিলে চমকানো থিওরি শুনিয়ে। দানব-গ্রহ বৃহস্পতি থেকে একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে এসে ধূমকেতু হয়ে গেছিল। গোটা সৌরজগৎ জুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। সাময়িকভাবে মঙ্গলগ্রহ ছিটকে সরে এসেছিল পৃথিবীর কাছে। পৃথিবীর লাট্টু বনবনানি বন্ধ হয়ে গেছিল—ফলে, লোহিত সমুদ্র থেকে জল সরে গিয়ে শুকিয়ে গেছিল। ইজরায়েলের উদ্বাস্তুরা তাই হেঁটে পেরিয়ে গেছিল খটখটে সমুদ্র অঞ্চল। তারপরেই পৃথিবীজোড়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটতে থাকে। ধূমকেতু থেকে পেট্রল বৃষ্টি শুরু হয়—সেই পেট্রলেই চলছে আজকের মোটর। পৃথিবী আবার ঘুরপাক খেতে শুরু করে—লোহিত সমুদ্রে জল এসে যায়—ডুবে যায় মিশরীয়রা। এরপরেও বার কয়েক ফিরে এসে দুষ্টু ধূমকেতু গোটা পৃথিবীটাকে নাচিয়ে কুঁদিয়ে আগুন আর জলের প্রলয় সৃষ্টি করে নিজেই হয়ে যায় শুক্রগ্রহ।

প্রশ্ন : বিরাট গুলগল্প তো! ধূমকেতুর মধ্যে এত বস্তু কি থাকতে পারে?

মা : খাঁটি বৈজ্ঞানিকরা ঠিক তাই বলছেন। ধূমকেতু বলতে গেলে ফাঁকা-ই হয়। একটা হাতির পাশে একটা পিঁপড়ে যতখানি—মালমশলার দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর পাশে একটা ধূমকেতুও তাই। ও রকম পিঁপড়ের গুঁতো অতীতেও পৃথিবী খেয়েছে ধূমকেতুদের আগমনে—তাকে টানা হ্যাঁচড়া করতে পারেনি কেউই।

প্রশ্ন : ইমানুয়েল ভেলিকোভস্কি কিসের বৈজ্ঞানিক?

মা : মনের ডাক্তার। পদার্থবিজ্ঞানী নন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী নন, গণিতবিজ্ঞানীও নন। উনি কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, শুক্রগ্রহ আবার ধূমকেতু হয়ে গিয়ে পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে নাচাবে।

প্রশ্ন : নাচাক! পৃথিবীর মানুষকে এভাবে আর কে-কে নাচিয়েছে মা?

মা : চার্লস ডারউইনের পিণ্ডি চটকেছেন অনেক ব্যক্তি। তিনি নাকি বলেছেন, বাঁদরের বংশধর আমরা এই মানুষ। কক্ষনো তিনি তা বলেননি। উনি শুধু বলেছেন: মানুষ, নরবানর আর বাঁদর—এদের আগমন একই পূর্বপুরুষ থেকে। তার মানে এই নয় যে, বাদর আমাদের পূর্বপুরুষ। জন স্কোপস নামে এক শিক্ষক বিখ্যাত 'বাঁদর-মামলা' ঠুকে দিয়ে নাকের জলে চোখের জলে করেছিলেন ডারউইন সাহেবকে। মানুষকে ভগবান সৃষ্টি করেছে—বাঁদর তো করেনি। এখনও বিলেতে চলেছে 'ইভোলিউশন প্রোটেস্ট মুভমেন্ট'—সাদা বাংলায়: 'গোল্লায় যাক ডারউইন আন্দোলন'—যে আন্দোলনের মোদ্দা কথা: বাঁদর, নরবানর অথবা অন্য কোনো জন্তু মানুষের পূর্বপুরুষ—একথা ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে। মানুষ আর অন্য যে কোনো প্রাণীর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান—তা কোনোদিন ঘুচবে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার জীবাশ্ম দেখিয়ে কিস্‌সু প্রমাণ করা যায় না।

প্রশ্ন : মানুষ তাহলে এল কি ভাবে?

মা : টিকে থাকার লড়াইয়ে জিতে গিয়ে। পঞ্চাশ ফুট লম্বা টিরানোসরাসদের দাঁত ছিল ছ-ইঞ্চি লম্বা ধারালো ছোরার মত। মুখবিবর ছিল যে কোনো পলিটিসিয়ানের চাইতে বড়। কিন্তু ব্রেন ছিল এতই পুঁচকে যে পরিবেশ প্রতিকূলে যেতেই মানিয়ে নিতে না পেরে অক্কা পেল পটাপট করে—গাছে গাছে তখন লম্ফঝম্ফ করে বেড়াচ্ছিল 'প্রাইমেট' নামক স্তন্যপায়ী জীবরা—মানুষের বংশধর এরাই। ঘোড়ার পূর্বপুরুষ যেমন ইওহিপ্পাস, হাতিদেরও আবির্ভাব তেমনি সাত কোটি বছর আগেকার ছোট্ট এক স্তন্যপায়ী জীবদের নাতিপুতি থেকে। তবে হ্যাঁ, থিয়সফিস্টরা বলেছেন, মু আর লেমুরিয়া-রা ছিল মানুষের পূর্বপুরুষ।

প্রশ্ন : থিয়সফিস্ট?

মা : থিয়সফিস্ট মানে ব্রহ্মজ্ঞানী। মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্নেল অলকট, অ্যানি বেসান্ত নামী থিয়সফিস্ট। ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে পরমজ্ঞানের আলোচনায় এঁরা মু আর লেমুরিয়া-দের টেনে এনেছেন—স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এরা—যাদের শরীরের অর্ধেক ছিল রক্তমাংসের—বাকি অর্ধেক সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে তৈরি। পরে তাদের কায়া পূর্ণ আকার ধারণ করে। এরা থাকত মু মহাদেশে। সে দেশ এখন তলিয়ে গেছে। তারা গ্র্যাভিটি-কে কলা দেখানোর বিদ্যে রপ্ত করেছিল—তাই পরমানন্দে পাখির মত উড়ে বেড়াতো। বেঙ্গল ল্যান্সার্সের কর্নেল জেমস চার্চইয়ার্ড আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, ঠিক এই প্রক্রিয়ায় নাকি যিশুখ্রিস্ট জলের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতেন! পাতালের গ্যাসে আগুন ধরে যাওয়ায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মু মহাদেশ রসাতলে যেতেই কিছু আদমী পালিয়ে যায় আটলান্টিসে। গড়ে ওঠে আটলান্টিসের মহাসভ্যতা—এর পরের কাহিনী ফেঁদেছেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো।

প্রশ্ন : প্লেটোও মনগড়া গল্প লিখেছেন?

মা : প্লেটো তো কিছুই নির্জলা সত্যি বলে জাহির করেননি। তিনি Kritias নামে একখানা বইতে দুজনের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে আটলান্টিস নামে একটা লম্বাটে মহাদ্বীপের মহাসভ্যতার বর্ণনা দিয়েছেন—কাহিনী শেষ করেছেন একটা সেনটেন্স আধখানা লিখে—ঠিক যেভাবে মডার্ন সিরিয়াল শেষ হয়। কিন্তু ইগনেটিয়াস ডোনেলি নামে এক তালেবর আমেরিকান কংগ্রেসম্যান নানারকম মালমশলা জোগাড় করে যখন লিখলেন—আটলান্টিস: অ্যান্টিডিলুভিয়ান ওয়ার্ল্ড—তখন হইচই পড়ে গেল পৃথিবীময়—কত হাজার বই যে লেখা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। দু'হাজার বছরেও আটলান্টিসের রহস্যের কিনারা হয়নি।

প্রশ্ন : কোথায় সেই আটলান্টিস?

মা : কিছুটা জলের তলায়, কিছুটা শুক্রগ্রহে, কিছুটা গ্রহাণুদের মধ্যে। পৃথিবীর ফ্লাইং সসারগুলোও এই আটলান্টিসবাসীদের বানানো।

প্রশ্ন : বলছো কি মা?

মা : উদ্ভট তত্ত্ববিশ্বাসীরা যা বলছেন, তাই বললাম। মস্ত একটা ধূমকেতুর আবির্ভাবের পর জেগেছিল আটলান্টিস, তারপর কোত্থেকে চাঁদ এসে গেল পৃথিবীর চারধারে—আগে নাকি চাঁদ ছিল না পৃথিবীর—চাঁদের টানে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটতেই তলিয়ে গেল আটলান্টিস। আর একটা উদ্ভট বিশ্বাসের সমর্থকরা বলেছেন, আটলান্টিসের বৈজ্ঞানিকদের বড় বাড় বেড়েছিল বলে প্রলয় ঘটে সেখানে। বিমানে চেপে একদল পালায় শুক্রগ্রহে—সেই বিমানই আজকের ফ্লাইং সসার—মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে পৃথিবীতে। বাকি আটলান্টিসের কিছুটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে ঘুরতে থাকে সূর্যকে ঘিরে—আজকের গ্রহাণু তারা।

প্রশ্ন : আটলান্টিস বিশ্বাসীদের মাথা কি খারাপ?

মা : তা জানি না। তবে এদের পত্রিকা দ্য আটলান্টিয়ান-এ এমন কথাও বলা হয়েছে যে, ইউরেনাস গ্রহ ভাঙতে শুরু করেছে। ভাঙা টুকরোগুলো সৌরজগতে নেচে নেচে যখন বেড়াবে, অবর্ণনীয় প্রলয় সৃষ্টি করবে, পৃথিবীর অক্ষরেখা পাল্টে যাবে, নতুন ডাঙা জাগবে, বহু দেশ তলিয়ে যাবে। আর একটা সংখ্যায় লেখা হয়েছে, প্লুটো গ্রহে পিলে চমকানো সভ্যতা বিরাজ করছে এবং সেখানে পাতাল রেল আছে।

প্রশ্ন : পৃথিবী থেকে তিনশ কোটি মাইল দূরে পাতাল রেল?

মা : ডেসমণ্ড লেসলী তাঁর বিখ্যাত কেতাব 'ফ্লাইং সসার্স হ্যাভ ল্যাণ্ডেড'-এ লিখেছেন আরও তাজ্জব কি বাৎ! আটলান্টিয়ান আর লেমুরিয়ানরা গ্র্যাভিটি আর ম্যাগনেটিজম-এর মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক বের করে ফেলেছিল। পৃথিবীর কোল্ড ম্যাগনেটিক ফোর্স-কে তারা জয় করে বসেছিল বলে হালকা তুলোর মত ভেসে থাকতে পারত যখন তখন।

প্রশ্ন : কোল্ড ম্যাগনেটিক ফোর্সটা কি জিনিস?

মা : ভগবান জানেন।

প্রশ্ন : প্লেটো কি ডাহা মিথ্যে লিখবেন?

মা : সেকালে ক্রীট নামে একটা দ্বীপ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভূমধ্যসাগরের সেই দ্বীপসভ্যতা নিয়েই হয়তো কাহিনী রচনা করেছিলেন প্লেটো।

প্রশ্ন : দানিকেনের তত্ত্ব কি সত্যি?

মা : সবই অনুমিতি। বাইবেলের ইজকিয়েল চারজন মহাকাশচারীকে চারখানা অগ্নিময় চাকাওলা গাড়িতে চেপে মর্ত্যে অবতরণ করতে দেখেছিলেন। তাদের প্রত্যেকের মুখ চারটে, ডানা চারটে। দানিকেনের ধ্রুববিশ্বাস, এই চারজনই অন্য গ্রহের জীব। গুহার ভেতরে আদিম মানবের আঁকা হেলমেটধারীদের ছবি তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু পাথরের বুকে আদিম ছেনি দিয়ে ছবি আঁকতে গেলে সেটা কাগা-বগা আঁকা ছাড়া আর কি হতে পারে? এখন তার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে মনের মত করে। পিরামিড নিয়েও কম হইচই হয়নি। সব মহাকাশচারীই নাকি গ্র্যাভিটি জয় করে বসে আছে এবং যাদুদণ্ড বুলিয়ে হিংটিংছট বললেই পেল্লায় পাথর শূন্যে ভেসে উঠে পিরামিড বানিয়ে ফেলেছে। একথা আগে বলেছিলেন দুজন—টেলর আর স্মিদ—দানিকেন বললেন, মহাকাশচারীরা পিরামিড বানিয়েছেন, ভেতরে 'হিমঘুম' ঘুমিয়ে থাকার জন্যে। দানিকেন এমন কথাও বলেছেন যে, অন্য গ্রহের মানুষ এ গ্রহে এসে উজবুক মেয়েদের রাক্ষসবিবাহ করে উন্নত মগজওলা মানুষ সৃষ্টি করে গেছে।

প্রশ্ন : তাহলে তো বলতে হয়, আমাদের পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ?

মা : মঙ্গল, শুক্র, সিগনাস, অ্যালফা সেন্টরি—এই সব জায়গাতেই হয়তো আদিম মানবীদের শ্বশুরবাড়ি। ঈস্টার দ্বীপের অদ্ভুত দানব মূর্তিগুলোর খুশি খুশি মুখচ্ছবি নাকি ধরণীর বউ পাওয়ার জন্যেই। এমন কি স্বয়ং যিশুখ্রিস্টও নাকি শুক্রগ্রহের মানুষ—এমন বিশ্বাসও রয়েছে খাতাকলমে। প্যাট্রিক মুর তাঁর বই 'ক্যান ইউ স্পিক ভেনুসিয়ান?'-এর ১৩০ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন এই তথ্য: বাইবেল, বুক অফ ইজকিয়েল, Mars, Sector 6।

প্রশ্ন : দানিকেন নাকি আকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি দেখিয়েছিলেন?

মা : হ্যাঁ। যোড়শ শতাব্দীতে আঁকা সেই ম্যাপ গ্লোবে সেঁটে দিলে মনে হয় ঠিক যেন মহাকাশ থেকে দেখে আঁকা হয়েছে। প্রাচীন এয়ারফিল্ডও দেখা গেছে যেখান থেকে নাকি আটলান্টিসের বিমানগুলো ওঠানামা করত যখন-তখন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, জোনাথন সুইফট 'গালিভার্স ট্রাভেল'-এ বলেছিলেন মঙ্গলের দুটো উপগ্রহ আছে—পরে দেখা গেছিল, সত্যিই তা আছে। তবে কি তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন? মনে হয় না। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই, পৃথিবীর মোটে একটা, বৃহস্পতির চারটে—মঙ্গলের তাহলে খান দুই না থাকলে কি চলে?

প্রশ্ন : সাইবেরিয়ায় ধূমকেতুর ধাক্কা নিয়ে কোনো উদ্ভট তত্ত্ব নেই?

মা : ধূমকেতু তত্ত্বটা বলেছিলেন রাশিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্লোরেন্সকি। এর পেছনে যুক্তি আছে। কিন্তু আরও দুটো বিচিত্র তত্ত্ব এনেছিলেন রাশিয়ারই তিন সায়ান্স-ফিকশন লেখক। যেমন, মস্ত একটা স্পেশ-শিপ অন্য গ্রহ থেকে এসে বিগড়ে গেছিল—অ্যাটমিক মোটর দুম্ করে ফেটে যেতেই নিশ্চিহ্ন হয় সাইবেরিয়ার পাইন-বন। দ্বিতীয়, ক্রাকাতোয়া-র অগ্ন্যুৎপাতের পর তিন বছর ধরে ধুলোর মেঘ পাক খেয়েছিল পৃথিবীকে ঘিরে। সিগনাস থেকে বৈজ্ঞানিকরা তাই দেখে সংকেত পাঠিয়েছিল এনার্জি-রশ্মি ছুঁড়ে। তাইতেই এই বিপত্তি!

প্রশ্ন : জ্যোতিষীদের কথা কি অবৈজ্ঞানিক?

মা : ১৯৭১ সালের মার্চে জেনারেল ইলেকশন ডেকে ইন্দিরা গান্ধী জিতে গেছিলেন জ্যোতিষীর কথায়। ১৯৩৯-এ যুদ্ধ লাগবে না—জ্যোতিষীর এই কথায় হিটলার বিলক্ষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন—কিন্তু ঘটেছিল ঠিক উল্টো। প্রেসিডেন্ট কেনেডি-র গুপ্তহত্যা যে-জ্যোতিষী আগে বলেছিলেন, তিনিই বলেছিলেন, সাংঘাতিকভাবে মারা যাবেন প্রেসিডেন্ট দ্য গল, প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কো আর আবিসিনিয়ার সম্রাট—কিন্তু কোনো

ভবিষ্যৎবাণীই মেলেনি। আকাশের নক্ষত্ররা ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছে—এ তথ্য তুই-ও জানিস। সুতরাং তুই যে-সময়ে জন্মালি, সেই সময়ে গ্রহ-নক্ষত্ররা কোথায় কিভাবে ছিল, তা জেনে তোর সমস্ত জীবনটার ওপর তাদের প্রভাব ছকে দেওয়া কি যায়? একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার শুধু বলা যায়, কিন্তু তুই ল্যাটা হবি কিনা, কুমড়ো দেখলেই মুখ বেঁকাবি কিনা—এ সব তো বলা যাচ্ছে না। আকাশের তারাগুলো দেখলেও তো মনে হয় না অমুক-অমুক জন্তুর মত দেখতে। বৃষ-কে কি ষাঁড়ের মত মনে হয়? বৃষরাশির মানুষরা কি ষণ্ডামার্কা হয়? আমাকে কেউ যদি বিজ্ঞান দিয়ে বুঝিয়ে দেন, নেপচুন স্নায়ুতন্ত্রকে—বিশেষ করে থ্যালেমাস-কে, শনি চামড়া, দাঁত আর হাড়কে, বৃহস্পতি পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডকে, বুধ শ্বাসপ্রশ্বাসকে, ইউরেনাস রক্তসংবহনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে—তাহলেই আমি স্বস্তি পাবো। জ্যোতিষী আর জ্যোতির্বিদরা সেকাল থেকেই অনেক সাড়া ফেলেছেন—একালে ফ্রয়েডের শিষ্য মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং নিজেও সারা জীবন চুটিয়ে জ্যোতিষ চর্চা করে গেছেন। বিলেতের এক বিখ্যাত জ্যোতিষী টিভি প্রোগ্রামে বলেছেন, ভবিষ্যতের জ্যোতিষীদের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে তত মাথা ঘামাতে হবে না, মনোবিদ হলেই চলবে। ফলে, নতুন একটা পেশার উদ্ভট হতে পারে—যার নাম astropsychiatrist; বাংলায় জ্যোতির্মনোবিজ্ঞানী।

প্রশ্ন : তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে জ্যোতিষচর্চা করা ঠিক নয়?

মা : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যে সব কুসংস্কার হিন্দুদের অনেক ক্ষতি করেছে, তার মধ্যে একটা হল জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি খুব বেশি মন দেওয়া। বুদ্ধ বলেছেন, যারা নক্ষত্রগণনা, এই রকম অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাদের সবসময়ে বর্জন করবে। জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস সাধারণত দুর্বলচিত্তের লক্ষণ। মনের জোর কমিয়ে দেয়। আসলে অজানাকে জানতে চাওয়া মানুষের স্বভাব—সকৌতুক সেই কৌতুহল মিটলেই যথেষ্ট—সত্যিমিথ্যে যাই হোক না—রাশিচক্রকে মাথায় না রেখে কাজ করে যা—তোকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। হুজুগে মাতিসনি।

প্রশ্ন : তবে যে শুনি পৃথিবীতে অমুক অমুক সময়ে প্রলয় ঘটবেই?

মা : হ্যাঁ, আবার নোয়ার নৌকো বানাতে হবে, নয়তো বেলুনে করে শূন্যে ভেসে থাকতে হবে—এই সব তো? এরকম ভবিষ্যৎবাণী তো আকছার শোনা যাচ্ছে। পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে গ্রহদের সংঘাতে বা সম্মেলনে—এরকম ভবিষ্যৎবাণী শোনা গেছিল ১৫২৪-এ, ১৯১৯-এ, ১৯৬২-তে, ১৯৮৪-তে—কিস্‌সু হয়নি। আর একটা সাল আসছে—১৯৯৯-তে—দেখি কি হয়!

প্রশ্ন : শুধু কি জ্যোতিষী? বিজ্ঞান-জানা লোকেও তো এমন কথা বলছেন?

মা : তা তো বটেই। ডক্টর অ্যাডাম বারবার পেশায় গাইরোসকোপ ইঞ্জিনিয়ার। তাই উনি অঙ্ক কষে বলেছিলেন, পৃথিবী একটা বিরাট গাইরোস্কোপ—ঠিক সেইভাবেই টলছে। ঘুরুনির শেষের দিকে। একবার টলেছিল ৯০০০ বছর আগে—নোয়া বাঁচিয়েছিল সেবার—আবার আসন্ন সেই দিন। তাঁর বই 'দ্য কামিং ডিস্যাস্টার ওয়ার্স দ্যান দ্য এইচ বম্ব' চলে গেছে বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের কাছে—আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে। পথেঘাটে যেন বন্দর তৈরি থাকে। নর্থ পোল আর সাউথ পোলের পাহাড়ের চুড়োয় যেন জেট লাগানো থাকে—জেট ছুঁড়ে টলানি রুখে দেওয়া হোক। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ হিউ ব্রাউনের ঘুম ছুটে গেল দক্ষিণ মেরুতে বরফের ওজন বাড়ছে বলে—এখুনি খাল কেটে বরফ বের করে দেওয়া হোক—নইলে পৃথিবী টলবেই। গুজব-প্রসঙ্গটা রাষ্ট্রসংঘেও পৌঁছেছিল।

প্রশ্ন : ভূমিকম্প নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী নেই?

মা : ইংল্যাণ্ডের পি. নরকট বলেছেন, পৃথিবী তো একটু চ্যাপ্টা, তাই তার ঘুরুনির সময় কমছে এক শতাব্দীতে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগেরও কম। ফলে, চাপ বাড়ছে পৃথিবীর পেটে। একদিন ফেটে যাবে দুম করে। তার আগেই সুমেরু আর কুমেরুতে ফ্লাই হুইল বসিয়ে তাদের ঘুরুনি দিয়ে 'চেক' করা হোক পৃথিবীর মন্দীভূত ঘুরুনি। অথবা, বড় বড় বাঁধ বেঁধে রুখে দেওয়া হোক সমুদ্রের জল। অথবা, চাঁদকে দু-টুকরো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক পৃথিবীর দু-পাশে। সাহারা-দের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন একজন গণিতবিদ আর ইঞ্জিনিয়ার—নাম তাঁর এ.পি. পেড্রিক।

প্রশ্ন : সাহারা-দের সমস্যা?

মা : সাহারা মরুভূমি, ডেথ ভ্যালি, অস্ট্রেলিয়ার ভেতরকার খাঁ-খাঁ অঞ্চলগুলোয় মেরু অঞ্চলের বরফ গলানো জল পাইপে করে এনে ফেলা হোক—পৃথিবীর বাড়তি মানুষের থাকার জায়গা ঠিক মিলে যাবে। পেড্রিক সাহেব অঙ্ক-টঙ্ক কষে নকশা পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছেন।

প্রশ্ন : এরকম বদ্ধ বিশ্বাসী আর কে-কে আছে মা?

মা : আঙুলে গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু এদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে গেলেও খটকা লাগে আগের যুগের কথা ভেবে। টেলিভিশন পাইওনিয়ার বেয়ার্ড যখন বলেছিলেন, বাতাসের মধ্যে দিয়ে তিনি ছবি পাঠাতে পারেন—লোকে তখন টিটকিরি দিয়েছিল; তাহলে যখন অক্সফোর্ডের জর্জ ডিলাওয়ার বললেন, চিন্তার ছবি বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাঠাতে পারেন তিনি—তখন কি হেসে গড়িয়ে পড়া ঠিক হবে? কোপারনিকাস, ডালটন, জিওলকোভস্কি-র মতবাদ এককালে হাসির খোরাক হয়েছিল—তাহলে যদি এখন কিছু বদ্ধবিশ্বাসী বলে বেড়ায় যে পৃথিবী, গোল নয়—চ্যাপ্টা, পৃথিবী নিরেট নয়—ফোঁপরা, আকাশ ফাঁকা নয়—ভরাট, সূর্য গনগনে নয়—কনকনে—তাহলে হি-হি করে হাসা কি উচিত?

প্রশ্ন : পৃথিবী চ্যাপ্টা আর ফোঁপরা? আকাশ ভরাট? সূর্য কনকনে? কি বলছ মা?

মা : বিলেতের 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি' বলছে এই সব কথা। বাসুকির ফণায় পৃথিবী—পুরাণের এই কথা শুনে যারা মুখ বেঁকিয়ে হেসেছে, তারাই এখন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে দেশের লোকের আজগুবি বিশ্বাস শুনে। দু-হাজর বছর আগে দক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ আর ভূগোলবিশেষজ্ঞ টলেমি মানতে চাননি পৃথিবী ঘুরছে লাট্টুর মতন—ঘুরলে ঝড়ের চোটে টেকা যাবে না—এখনও এই ধরনের বদ্ধবিশ্বাসীরা তুমুল চেঁচিয়ে চলেছে, এমন কি বৃটিশ টেলিভিশন প্রোগ্রামেও তাদের ডাকা হচ্ছে। 'চ্যাপ্টা পৃথিবী তত্ত্বে'র আইজাক নিউটন বলা যায় স্যামুয়েল শেনটন-কে। পেশায় যদিও সাইনবোর্ড পেন্টার। সূর্য পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে—এই ধারণা নিয়ে কলকাতার যে মানুষটা হন্যে হয়ে ঘুরছে—তার বিশ্বাস কি 'দ্য সান গোজ রাউণ্ড' বইটা থেকে এসেছে? এই বইয়ের লেখিকা মিস মার্গারেট এল. এস. মিসেন—নিবাস এডিনবরায়। পৃথিবীটা যে নিরেট গোলক নয়—একই কেন্দ্রকে ঘিরে পর পর পাচঁটা গোলকের সমন্বয় এবং প্রতিটি গোলকে মানুষ গিজ গিজ করছে—কুমেরু আর সুমেরুকে জুড়ে একটা সুড়ঙ্গ এই সব পাতাল-পৃথিবীদের ফুঁড়ে গেছে এবং অরোরা-র মেরুপ্রভা আসলে পাতাল-সূর্যের জ্যোতি—এই বিশ্বাস আমাদের পৌরাণিক গল্প-টল্পগুলোকেও ম্লান করে দিচ্ছে না? আকাশ নাকি নিরেট, পাতাল-সূর্যের প্রতিবিম্বকে সত্যি সূর্য মনে হয়, চাঁদও নেই—শুধু, পাতালের আলোর ঝিকিমিকি! নিরেট ছাদের কারিকুরিগুলোকে গ্রহনক্ষত্র মনে হয়। ছাদের ওপর আছে এন্তার নল—সেই জল

ঝরে বৃষ্টির আকারে! আজব এই তত্ত্ব জাহির করছে যে সোসাইটি, তার নাম 'সোসাইটি ফর জিওকসমিক্যাল রিসার্চ'। উদ্ভট ব্রহ্মাণ্ডের প্রবক্তা জন ব্রাডবুরি-কে নিয়ে টিভি প্রোগ্রাম হয়েছে, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার ইন্টারভিউ নিয়েছে। ভদ্রলোক কিন্তু পিলে চমকানো অঙ্ক কষে আর যন্ত্র বানিয়ে প্রমাণ করে চলেছে ব্রহ্মাণ্ড মোড়া রয়েছে শক্ত ধাতুর চাদরে!

প্রশ্ন : সূর্য কনকনে কে বলেছে?

মা : সাসেক্সের একজন পাদরী—পি. এইচ. ফ্রান্সিস—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কতে এম. এ.। তাঁর মতে, সূর্য থেকে এনার্জি এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ইলেকট্রিক এনার্জি হয়ে যাচ্ছে বলেই রোদ পাচ্ছি। আসলে সূর্য ঠাণ্ডা। তার পেছনকার ছায়া ইনফিনিটি তে প্রতিফলিত হয়ে নক্ষত্র-মায়া সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর নিজস্ব শক্তি-চক্রের জন্যেই পৃথিবী গরম থাকছে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম হার্শেল—যিনি ইউরেনাস আবিষ্কার করেছিলে—তিনিও বিশ্বাস কবতেন, সূর্যের জঠর বেশ শীতল—বাইরেটা অবশ্য গরম। গড ফ্রায়েড বুরেন নামে এক জার্মান আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছিল, সূর্যের ভেতরে গাছপালায় মোড়া সবুজ শ্যামল একটা গোলকও আছে; পাদরী ফ্রান্সিস তাই তো টেলিভিশন প্রোগ্রামেও তাল ঠুকে—বলেছেন সূর্য মোটেই গরম নয়। 'দ্য টেম্পারেট সান' নামে একটা বইও লিখেছেন। সুতরাং মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত তত্ত্ব শুধু এদেশেই তৈরি হয় না—বিলেত আমেরিকার লোকেও কম যায় না। এমন লোকও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেখানে আর জাহির করে সে নাকি অন্য তিনটে গ্রহের মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে গড়গড়িয়ে।

প্রশ্ন : অন্য গ্রহের মানুষের ভাষা জানে এই পৃথিবীর মানুষ?

মা : বহু ভাষাবিদ্‌ এই ভদ্রলোকের নাম বার্নাড বায়রন, থাকেন ইংল্যাণ্ডের রমফোর্ডে। ইনি শুক্র, প্লুটো, আর ক্রুগার—এই তিনটে গ্রহের মানুষদের দেখতে কি রকম জানেন, ভাষাও জানেন।

প্রশ্ন : ক্রুগার নামে তো কোনো গ্রহ নেই সূর্যের?

মা : অনেক দূরে বামন-তারা ক্রুগার-60'র চারধারে ঘুরছে এই গ্রহ। বায়রন-এর কাছে ভাষাগুলো রশ্মি মারফত চলে আসে—আসলে তা টেলিপ্যাথি। শুক্রগ্রহের মানুষদের চোখ সুন্দর নীল, চুল সোনালী; প্লুটোবাসীরা বড় পুঁচকে, হাত লম্বা, বুড়ো আঙুল আরও লম্বা, মাথাটা খাড়াই ডিমের মত; ক্রুগারবাসীদের একটা ফুসফুস বুকের ওপর দিকে—আর একটা শরীরের একদম তলায়; মঙ্গলগ্রহবাসীদের চোখ দুটো, আছে মাথার দু পাশে।

প্রশ্ন : এই সব গালগল্প লোকে বিশ্বাস করে?

মা : না করুক, মজা তো পায়। যেমন তুই পেলি। আরও যদি পেতে চাস, Patrick Moore-এর লেখা Can You Speak Venusian? বইটা কলকাতার বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি থেকে এনে পড়িস। যা কিছু তোকে বললাম—সব সেখানে আছে।

গীতা

প্রশ্ন : গীতা কবে লেখা হয়েছিল, মা?

মা : শাস্ত্রপুরাণের হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার একশ দুই বছরে লেখা হয়েছিল গীতা। কিন্তু বিলেতের পণ্ডিতরা দেখিয়ে দিয়েছেন, আর্যরা উত্তর পশ্চিম ভারতে এসেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের কাছাকাছি। তাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটেছিল খ্রিস্টজন্মের এক হাজার থেকে সাতশ বছরের মাঝামাঝি। গীতা লেখা হয়েছিল সেই সময়ে!

প্রশ্ন : গীতায় তাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গল্প আছে?

মা : ওরে না। যুদ্ধের কোনও গল্পই নেই গীতাতে। আছে শুধু শ্রীকৃষ্ণের ভাল ভাল উপদেশ আর কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগে অর্জুন দেখতে চেয়েছিলেন, দুই দলের সৈন্যদের চেহারা। শ্রীকৃষ্ণ রথ রেখেছিলেন দু-দলের মাঝে। অর্জুনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছিল দু-দলের সৈন্যদের দেখে। লড়াইয়ের মাঠে জড়ো হয়েছে তাঁরই চেনা জানা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। কেউ গুরুজন কেউ স্নেহাস্পদ। যুদ্ধ করলে তো এরা মরবেই। তখন রাজত্ব করবেন কাদের নিয়ে? ভীষণ ভেঙে পড়লেন অর্জুন। শুয়ে পড়লেন রথে। হাত থেকে পড়ে গেল গাণ্ডীব ধনুক। শ্রীকৃষ্ণকে বললেন রথ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এ যুদ্ধ তিনি করবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুদ্ধের মাঠেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে অর্জুনকে রাজি করান। অর্জুনের রাজি হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা নিয়েই গীতার গল্প।

প্রশ্ন : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গল্প তাহলে কোথায় আছে?

মা : মহাভারতে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বই।

প্রশ্ন : আর গীতা?

মা : এতে আছে ৭০১টা শ্লোক। এর মধ্যে ৫৭৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কথা, ৮৫টা শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন, ৪০টা শ্লোকে সঞ্জয় রেডিও ঘোষকের মত খবরের সূচনা করেছেন, আর একটি মাত্র শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের খবর শোনাতে আদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন : রেডিও ঘোষক ছিলেন নাকি সঞ্জয়?

মা : ব্যাপারটা বেশ মজার। যুদ্ধ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে—এখনকার হরিয়ানায়। ধৃতরাষ্ট্র থাকেন হস্তিনাপুরে। তিনি অন্ধ। যুদ্ধের খবর পাওয়া যায় কী করে? ব্যাসদেব বললে—'বেশ তো, দিব্যচক্ষু দিচ্ছি তোমাকে, সেই চোখে তুমি যুদ্ধ দেখতে পাবে।' ধৃতরাষ্ট্র মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হয় না। আমারই আত্মীয়স্বজন মারা যাচ্ছে, এ দৃশ্য কি দেখা যায়? আমি বরং শুনতে চাই। দিব্যচক্ষু দিন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি সঞ্জয়কে, সেই আমাকে যুদ্ধের খবর শুনিয়ে যাবে।' ব্যাসদেব তখন দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে। সঞ্জয় শুনিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ঠিক যেন টেলিভিশনে দেখেছিলেন আর রানিং কমেন্টারি দিয়ে গেছিলেন। মনে তো হয়, ব্যাসদেব যাকে দিব্যচক্ষু বলেছেন আসলে সেটা একটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল টিভিসেট।

প্রশ্ন : বটে! গীতার গল্প তাহলে সঞ্জয় বলে গেছেন?

মা : হ্যাঁ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ এই ১৮টা অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের কথাবার্তা লেখা আছে।

প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণের ৫৭৫টা শ্লোকে কী বলা হয়েছে, মা?

মা : ১৫৩টা শ্লোকে মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, ১৭৫টা শ্লোকে তিনি নিজে কে সেই পরিচয় দিয়েছেন, ২৪৭টা শ্লোকে মানুষের জীবনের সমস্ত দিক তুলে ধরেছেন, সেইসঙ্গে জগতের সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন।

প্রশ্ন : মানুষের জীবনের সমস্ত দিক? জগতের সব বিষয়? মানে?

মা : জন্ম, মৃত্যু, প্রাণের বিরামহীন গতি, বাইরের প্রকৃতি, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টি, সমাজব্যবস্থা, শরীর ভাল রাখতে গেলে কী কী জিনিস কীভাবে খাওয়া দরকার, এ ছাড়াও আরও নানারকম তত্ত্ব আর তথ্য।

প্রশ্ন : গীতার বক্তব্য তাহলে কী মা?

মা : মূল বক্তব্য দুটো; এক, মানুষের স্বাভাবিক কাজ যা, সে তাই করুক। তাহলেই দিব্যজীবন পাবে। দুই, শ্রীকৃষ্ণ নিজে কে, আর তাঁর পরিচয়। এই দুটো ব্যাপার ভালভাবে বুঝলে সমাজে আর সংসারে সুখ-শান্তি এনে ফেলা যায়। যুদ্ধ করব না বলে অর্জুন বেঁকে বসেছিলেন বলেই গীতার প্রয়োজন হয়েছিল। অর্জুন ছিলেন রাজ্যপাল। তাঁর কাজ তিনি করবেন না কেন?

প্রশ্ন : কী কী কারণে যুদ্ধে নারাজ হয়েছিলেন অর্জুন?

মা : এক: অর্জুন ক্ষত্রিয় ঠিকই, কিন্তু ক্ষত্রিয়র কাজ তো শত্রুবধ। ঠাকুর্দা ভীষ্ম আর গুরুদেব দ্রোণাচার্য কি তাঁর শত্রু? দুই: এদের মেরে ফেলবেন কেন? রাজ্যের লোভে? চেনাজানা সবাইকে খতম করে রাজ্যলাভে তাঁর দরকার নেই। তিন: এত বড় যুদ্ধে বেশির ভাগ পুরুষই মারা যাবে। বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি, বিধবা কুমারীদের নিয়ে রাজত্ব করবেন? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যদি মরেই গেল তাহলে রাজত্বটা করবেন কাদের নিয়ে?

প্রশ্ন : ঠিকই তো বলেছিলেন অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ কী ওকালতি করলেন?

মা : অর্জুনের মনের এই, তিনটে বাধাই যে ঠিক নয়—একে একে তা বুঝিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথম বাধা: ঠাকুর্দা, গুরুদেব আর চেনাজানা রাজাদের মারা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন, কৌরবসভায় এই ঠাকুর্দা আর গুরুদেবই তো বলেছিলেন, কৌরবদের নুন খান তাঁরা, কাজেই লড়াই করবেন তাদের হয়ে। অন্য রাজারা যুদ্ধ করতেই চেয়েছিলেন চুপচাপ থেকে। যদি যুদ্ধে জেতেন, লুটের ভাগ তো পাবেন। দুর্যোধনদের মত

পাপিষ্ঠদের দলে যখন এঁরা ভিড়েছেন, তখন তাঁদের কেন বধ করা যাবে না? দু নম্বর বাধা: গুরুজনদের মেরে রাজ্যের ধনদৌলত ভোগ করা কি যায়? শ্রীকৃষ্ণের ওকালতি, ন্যায় যুদ্ধে জিতলে ধনদৌলত লাভ তো ঘটবেই। তৃতীয় বাধা: গণহত্যা। এইটেই অর্জুনের সবচেয়ে বড় বাধা। শ্রীকৃষ্ণ তখন জলের মত বুঝিয়ে দিলেন কেউই মরছে না। সাপ যেমন খোলস পালটায়, মানুষও তেমনি পুরোনো খোলস ফেলে দিয়ে নতুন খোলস নেয়; অর্থাৎ নতুন করে জন্মায়। প্রাণটা ঠিকই থাকছে, তার মৃত্যু নেই। সুতরাং অর্জুন গণহত্যা করে ফেলবেন—এটা এক্কেবারে ভুল ধারণা। এ যুদ্ধে শুধু খোলসগুলো পড়ে থাকবে, নষ্ট খোলস ছেড়ে প্রাণ খুঁজবে অন্য খোলস। কাজেই অর্জুন যেন তাঁর স্বাভাবিক কাজ, মানে লড়াই করে যান।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, স্বাভাবিক কাজ বলতে শ্রীকৃষ্ণ কী বলতে চেয়েছেন?

মা : স্বভাব অনুযায়ী কাজ করা। সবার স্বভাব কি একরকম হয়? হয় না। কেউ ঝগড়াটে, কেউ ভালমানুষ, কেউ উপকারী, কেউ গাইয়ে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গুণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই গুণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন: সত্ত্ব, রজো আর তমো। যার যেমন স্বভাব, সেই স্বভাবের চিহ্ন হচ্ছে তার গুণ। সত্ত্ব গুণ যার মধ্যে বেশি, সে নির্মল স্বভাবের মানুষ, ভাল আর মন্দর তফাত বোঝে, জ্ঞানী হতে চায়। রজো গুণে মানুষ লোভী হয়। তমো গুণে মানুষের সবরকম ভুল ধারণা হয়। আবার বলি, এই গুণগুলিই মানুষের স্বভাব ঠিক করে নেয়। কাজের ধারাও ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্ন : স্বভাব অনুযায়ী কাজের ধারা ঠিক হয়ে যায়?

মা : রবীন্দ্রনাথের গুরুজনরা তাঁকে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পড়িয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের স্বভাবে যে কাজ করলেন, তাতে সমাজ আর সংসারের উপকার হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাই বলেছেন, স্বভাব অনুযায়ী কাজ করলে সবারই ভাল। কাজ যে করে, সে কর্মী। স্বভাব অনুযায়ী কাজের চার রকম কর্মীগোষ্ঠিও উনি তৈরি করে দিলেন—সমাজের ভালোর জন্য: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

প্রশ্ন : এরা তো চার জাতের মানুষ?

মা : ভুল। এরা চার কর্মীগোষ্ঠীর মানুষ। কর্মীগোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন বর্ণ। যার যে গুণ, সে সেই বর্ণের মানুষ, অথবা সেই ইউনিয়নের মানুষ। ব্রাহ্মণের স্বভাব শান্ত। তার কাজ, তপস্যার কাজ। ক্ষত্রিয়ের কাজ বীরত্ব আর প্রভুত্ব। বৈশ্যের কাজ চাষ-আবাদ ব্যবসা, টাকা না থাকলে রাজত্ব চলবে কি করে? শুদ্রের স্বভাব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের পরিচর্যা করা। কেউ কিন্তু কারও চেয়ে ছোট নয়। কারও হাতে বেশি ক্ষমতা জড়ো হচ্ছে না। উঁচু-নীচু বলে কিছু থাকছে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শূদ্রের কাজ অন্য তিন বর্ণের পরিচর্যা করা—যে কাজগুলো সমাজে খুবই দরকারি, শূদ্ররা অন্য তিন বর্ণের দাস, এমন কথা বলা হয়নি।

প্রশ্ন : তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের কাজ করার ওপরেই শ্রীকৃষ্ণ বেশি জোর দিয়েছেন?

মা : ঠিক তাই। তাঁর নির্দেশে কোনওরকম সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামি নেই। স্বভাবমত কাজ করো—সুন্দর সমাজ গড়ে তোলো। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেও যেমন ব্রাহ্মণ থাকা যায় না—শূদ্র বংশে জন্মালেও তেমনি শূদ্র থাকা যায় না। তার স্বভাব, তার কাজ তাকে অন্য বর্ণে অন্য জাতে অন্য আসনে নিয়ে যায়। দশে মিলে কাজ করলে সমাজেরই মঙ্গল। একা সব কাজ তো করা যায় না। সমাজ সংস্থায় এই হল শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাপত্র—হাজার হাজার বছর আগে তিনি আরও একটা কথা বলেছিলেন—যা টের পেয়েছে এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা।

প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণের আরও এক ব্যবস্থাপত্র মানে?

মা : উনিই বলেছিলেন, শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষ হাত মিলিয়ে চললেই তো হবে না—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম—এই পাঁচটা আদিম উপকরণের সঙ্গে সহযোগিতা দরকার। গাছপালা কেটে ফেলার পরিণামটা কি ভয়াবহ হয়েছে, এখনকার গবেষকরা তা বুঝেছেন। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে পরিবেশ দূষণ। মানুষের তেষ্টার জল, নিঃশ্বাসের বাতাসেও এখন বিষ ঢুকে পড়েছে।

প্রশ্ন : পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণের কথা খেটে যায়, তাই না, মা?

মা : ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী ঠিক বিষয় বেছে নিলে তাদের শক্তির অপচয় হবে না, কাজ করা আরও সহজ হবে, মানুষের production বাড়বে, দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে। সব কাজই যজ্ঞ। যজ্ঞে ফল পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে। সেইজন্যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ফলের দিকে তাকিয়ে কাজ না করে কাজকে পুজো করার মত দ্যাখো। কাজ করার এইটাই মস্ত কৌশল—কাজ, কাজ, কাজ—নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা থাকলে মানুষের ভেতর থেকে শক্তি বেরিয়ে আসে। মানুষ তখন অতিমানুষ হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : কাজ করেই সুপারম্যান হওয়ার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন?

মা : শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বসুদেব আর দেবকীর ছেলে। রাজা কংসের ভাগ্নে। পাণ্ডবদের মা কুন্তীর ভাইপো। অর্জুনের সম্বন্ধী। এইটাই তাঁর সব পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন যদুকুলের নম্বর ওয়ান সেরা মানুষ। মানুষ হয়েও নিজের কর্মযোগ প্র্যাকটিস করে মানুষী শরীরেই মানুষশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

গুপ্তচর

প্রশ্ন : মাতাহারি কি সবচেয়ে বড় গুপ্তচর?

মা : মাতাহারি গুপ্তচরই ছিল না, অথচ তাকে এই বদনাম নিয়েই গুলি খেয়ে মরতে হয়েছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। হ্যাঁ, রূপসী ছিল বটে মাতাহারি, দহরম মহরম ছিল মিলিটারি মহলে, ওরিয়েন্টাল ডান্সে ছিল নম্বর ওয়ান—সেইসঙ্গে বদনাম কুড়িয়েছিল গুপ্তচরগিরির জন্যে। মাতাহারি তার আসল নামও নয়। জাতে ওলন্দাজ। বিয়ে করেছিল স্কটল্যাণ্ডের এক মদ্যপকে। তখন তার নাম ছিল মিসেস মারগারেথা ম্যাকলিয়ড। ইন্দোনেশিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ করে ঠিক করেছিল ইউরোপে গিয়ে নর্তকী হবে।

প্রশ্ন : মাতাহারি নামটা কিন্তু গুপ্তচর হিসেবেই কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে, তাই না মা?

মা : সে কিংবদন্তী ভেঙেও গেছে ১৯৬৩ সালে সিক্রেট ফাইল খুলে দেখার পর। মাতাহারির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে নাকি জামান কাইজারের হয়ে গুপ্তচরগিরি চালিয়েছে। আসলে, ভুল করে নামী জার্মান গুপ্তচর ক্লারা বেনেডিক্স-এর বদলে তাকেই শনাক্ত করে বসে ইংরেজরা ১৯১৬ সালের নভেম্বরে। ওই মাসেই মিসেস ম্যাকলিয়ডকে গ্রেপ্তার করা হয় 'এস এস হলাণ্ডিয়া'জাহাজে হল্যাণ্ড যাওয়ার পথে। ভুল বুঝতে পেরে পুলিশ তাকে ছেড়েও দেয়। ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ফ্রান্সে; অপরাধ—মাদ্রিদে জার্মান স্পাইদের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ রেখেছে নাচ-টাচের মাধ্যমে। বিচার হয় প্যারিসে। সৌন্দর্য আর নর্তকী হিসাবে সুখ্যাতি তার কাল হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : গুপ্তচরদের নাকি বাহিনী আছে দেশে-দেশে?

মা : এদের গালভরা নাম হল 'ইনটেলিজেন্স এজেন্সি'। যুক্তরাষ্ট্রের CIA-র প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুমান-এর উদ্যোগে। 'দ্য কোম্পানি' নামেই পরিচিত কর্মচারীদের কাছে। হেড কোয়ার্টার ভার্জিনিয়ার ল্যাঙলে-তে; দ্বিতীয় কেন্দ্রটা ভার্জিনিয়াতেই—ম্যাকলিন অঞ্চলে। কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০; বেশির ভাগই বিশ্লেষক—রুটিন কাজের জন্যে খোলাখুলিভাবে নিযুক্ত। গুপ্ত কাজের জন্যে আছে একদম

ভেতরের কিছু লোক—এদের চাকরি 'প্ল্যানস ডিভিশন'-এ—এরাই চালায় আমেরিকান দূতাবাসগুলোর CIA দপ্তর—যাদের নাম 'স্টেশন'। CIA-র পুরো নাম 'সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি'।

প্রশ্ন : ব্রিটেনেও নিশ্চয় আছে গুপ্তচর সংস্থা?

মা : দুটো আছে। দুটোরই প্রতিষ্ঠা CIA-র আগে—১৯০৯ সালে। একটার নাম M16; কর্মীদের কাছে এর নাম 'দ্য ফার্ম'। 'ব্রিটিশ সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস' নামেও সবাই চেনে। সদর দপ্তর লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ রোডে; বৃটেনের বাইরে থেকে গোপন খবর সংগ্রহ করাই এদের কাজ। MI-এর পুরো নাম 'মিলিটারি ইনটেলিজেন্স'।এ ছাড়াও আছে M15; পত্তনের সময়ে নাম রাখা হয়েছিল 'স্পেশ্যাল ইনটেলিজেন্স ব্যুরো'। কর্মীদের কাছে 'দ্য অফিস' নামেই পরিচিত। সদর দপ্তর লণ্ডনের কার্জন স্ট্রীটে। ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আর অন্য দেশের গুপ্তচরদের খবরাখবর রাখাই এদের কাজ।

প্রশ্ন : রাশিয়ার ইনটেলিজেন্স এজেন্সির নাম KGB?

মা : হ্যাঁ। কর্মীদের কাছে 'দ্য সেন্টার' নামেই পরিচিত। KGB অর্থাৎ 'সোভিয়েত কমিটি অফ স্টেট সিকিউরিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে—ষোড়শ শতাব্দী থেকে তৎপর রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স সংগঠনের ধাঁচে। সদর দপ্তর মস্কোর Dzerzhinsky Square-য়ে। কর্মীর সংখ্যা প্রায় দু লক্ষ। শোনা যায়, রাশিয়ার বাইরে অ-রুশ কর্মীর সংখ্যা সাড়ে সাত লাখেরও বেশি। মূল দায়িত্ব দেশের ভেতরে যেন নিরাপত্তা বজায় থাকে—একই সঙ্গে মিলিটারি শাখা GRU-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুপ্তচরগিরি অব্যাহত রাখে বাইরে।

প্রশ্ন : এবার বলো ফ্রান্সের গুপ্তচর বাহিনীর কী নাম?

মা : The Service de Documentation Extericure et Contre-Espionage—সংক্ষেপে, SDECE প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। সদর দপ্তর প্যারিসের পুবে—Boulevard Mortier পাড়ায়। বাড়িটাকে কর্মীরা বলে la piscine—কেননা, কাছেই রয়েছে একটা সুইমিং পুল। দেশের বাইরে থেকে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করাই এদের কাজ। কর্মীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

প্রশ্ন : শুনেছি নাকি ইজরায়েলেও আছে স্পাই বাহিনী?

মা : আছে এবং তাদের সদর দপ্তর সর্বদাই হঠাৎ-হঠাৎ বাড়ি পাল্টায় স্রেফ নিরাপত্তার কারণে। এই সংস্থার নাম MOSSAD; প্রতিষ্ঠা ১৯৫০ সালে। ঘাঁটি তেল আভিভে। কর্মী সংখ্যা প্রায় ১২০০। মূল দায়িত্ব দেশের বাইরে। গুপ্তচরগিরি। MOSSAD নামটা এসেছে হিব্রু শব্দ থেকে—যার মানে, 'ইন্সটিটিউশন ফর ইনটেলিজেন্স অ্যাণ্ড স্পেশ্যাল অ্যাসাইনমেন্ট্স।

প্রশ্ন : গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করার রেওয়াজ নিশ্চয় আগেও ছিল?

মা : আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট যে-পদ্ধতিটা মাথা খাটিয়ে বের করেছিলেন, আজও তা কাজে লাগছে। মধ্য প্রাচ্য আর এশিয়ায় অভিযান চালানোর সময়ে অফিসারদের আনুগত্য বিচার করতেন তাদের দিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখিয়ে। সেই চিঠি খুলে পড়তেন, অসন্তোষের জায়গা ধরে ফেলতেন এবং তা নির্মূল করতেন।

প্রশ্ন : 'ফিফথ কলাম' কাকে বলে, মা?

মা : বাংলায় বলে পঞ্চম বাহিনী। বোঝবার সুবিধের জন্যে বলা হয়—অশ্ব, রথ, গজ, পদাতিক—এই চার বাহিনীর বাইরে যে বাহিনী, অর্থাৎ গুপ্তচর বাহিনী। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯-এ পারস্যের নেতা সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যাবিলন শাসক বেলসাজারকে হারানোর জন্যে গোপনে বিক্ষুব্ধ ব্যাবিলনিয় পুরুতদের নিয়ে একটা বাহিনী

গড়েছিলেন। এই বাহিনী কীভাবে সাহায্য করেছিল সাইরাসকে, তা জানা যায়নি। তবে ব্যাবিলনের দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে জানা গেছে, বিনা রক্তপাতে শহর দখল করেছিল সাইরাসের সৈন্যবাহিনী। আধুনিক যুগে 'ফিফথ কলাম' নামটার প্রথম ব্যবহার করেন স্প্যানিশ ন্যাশনালিস্ট জেনারেল মোলা ১৯৩৬ সালে। চার 'কলাম' অর্থাৎ সূচীমুখ সৈন্যসজ্জা দিয়ে মাদ্রিদ অবরোধের পর বড়াই করে বলেছিলেন, 'ফিফথ কলাম' ইতিপূর্বেই রয়েছে ভেতরে। অর্থাৎ দেশেরই লোক দেশে বসে যখন বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলায়, তখন তাদের বলা হয় 'ফিফথ কলাম'।

প্রশ্ন : 'স্প্যানিশ আমার্ডা' তেড়ে আসছে শুনে বল খেলতে শুরু করেছিলেন কেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক?

মা : কারণ তিনি গুপ্তচর মারফত অনেক আগেই খবরটা পেয়েছিলেন। স্পেন থেকে তাদের অজেয় বাহিনী রওনা হওয়ার আগেই ইংরেজ নৌবাহিনীর কমাণ্ডার জেনে গেছিলেন—ইংল্যাণ্ড আক্রান্ত হতে চলেছে—তাই নির্বিকার থাকতে পেরেছিলেন। খবর আনার কৃতিত্বটা অবশ্য রানী প্রথম এলিজাবেথের প্রধান উপদেষ্টা স্যার ফ্রান্সিস ওয়ালসিঙহ্যাম-এর। ইনিই গুপ্তচরদের সংগঠন গড়ে তোলেন ইংল্যাণ্ডে এবং তাদের শত্রুদেশে পাঠিয়ে দেন একদম ভেতরে ঢুকে গিয়ে খবর জোগাড় করার জন্যে। দুঁদে স্পাই অ্যান্টনি স্ট্যানডেন রাজসভাসদ সেজে ঢুকে পড়ে স্প্যানিশ আর্মাডা-র গ্র্যাণ্ড অ্যাডমিরাল মার্কুইস ডি সান্তাক্রুজ-এর অভিযানে। স্পাইয়ের নাম তখন পম্পিও পলিগ্রিনি। সান্তাক্রুজ আর স্পেন অধীশ্বর দ্বিতীয় ফিলিপ-এর মধ্যে যেসব চিঠি বিনিময় হত, পলিগ্রিনিই সেগুলো খুলে পড়ে জানতে পারে স্পেনের মারকুটে প্ল্যান। অভিযানের অনেক মাস আগেই জানিয়ে দেয় স্পাইমাস্টার ফ্রান্সিসকে।

প্রশ্ন : জেমস্ বণ্ড কাহিনী কি সত্যি স্পাইয়ের ঘটনা নিয়ে লেখা?

মা : নিশ্চয়। সোভিয়েত স্পাই সংগঠন SMERSH-কেই জনপ্রিয় করেছেন জেম্স্ বণ্ড স্রষ্টা আয়ান ফ্লেমিং। সত্যিকারের KGB ডিপার্টমেন্ট এই SMERSH। নামকরণ হয়েছে উদ্দেশ্য অনুসারে। Smert Shipionen—মানে, মরুক স্পাইরা! দেশের বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুনিপাত করাই এই সংগঠনের কাজ। সবচেয়ে নামী নিহত ছিলেন ট্রটস্কি—১৯১৭ বিপ্লবের প্রাক্তন বলশেভিক লিডার—মেক্সিকোয় খুন হন ১৯৪০ সালে।

প্রশ্ন : আমেরিকায় CIA-র পত্তন ঘটেছিল কীভাবে, মা?

মা : ব্রিটিশদের দৌলতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকার কোনও কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর সংস্থা ছিল না। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ চাপে পড়ে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট OSS অর্থাৎ 'অফিস অফ দ্য স্ট্র্যাটেজিক সারভিস' গড়ে তুললেন দেশের গুপ্তচরদের কাজে সংহতি আনার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধশেষে OSS-কে সরকারিভাবে ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু চাকরিতে থেকে যায় বহু কর্মী। এদেরকে নিয়েই CIA-এর কেন্দ্রীন তৈরি হয় ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের উদ্যোগে।

প্রশ্ন : সত্যি স্পাই থেকে যদি জেম্স্ বণ্ড তৈরি হয়, তাহলে অলীক গল্প পড়ে সত্যি স্পাইরা কি প্রেরণা পায়?

মা : শত্রুদেশের গুপ্তচর সংস্থার একদম বিবরে প্রবেশ করে যেসব খবর সংগ্রহকারী সেই গুপ্তচরদের ডাকনাম Mole অর্থৎ ছুঁচো। এ নাম প্রথম মাথায় আনেন ব্রিটিশ রোমাঞ্চ লেখক জন লা কারে—আসল নাম ডেভিড কর্নওয়েল—প্রাক্তন M16 অফিসার। ১৯৭৪ সালে লেখা Tinker, Tailor, Soldier Spy নভেলে 'ছুঁচো'কে চালু করেন ইনিই—পরে নামটা লুফে নেয় সত্যিকারের স্পাইরা।

প্রশ্ন : এখন তো আকাশি গুপ্তচরদের জয়জয়কার, তাই না, মা?

মা : স্যাটেলাইট? তাদেরকেও বোকা বানিয়েছে মাটির মানুষ—অন্তত একটি ক্ষেত্রে। ১৯৮২ সালে ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে বৃটেনের রয়াল এয়ার ফোর্স খুব বড়াই করেছিল, যে তারা পোর্ট স্ট্যানলি-র একমাত্র এয়ারপোর্টকে বোমা মেরে অকেজো করে দিয়েছে—আর্জেন্টিনার এয়ারফোর্সের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। আমেরিকান স্যাটেলাইট থেকে তোলা আকাশি ফটোগ্রাফেও দেখা গিয়েছে—বড় বড় বোমার গহ্বর রয়েছে এয়ারপোর্টের রানওয়েতে। যুদ্ধশেষে জান গেল তাজ্জব খবরটা। মুষ্টিমেয় আর্জেন্টাইন সৈন্য স্রেফ বালতি আর কোদাল নিয়ে রাতের অন্ধকারে রানওয়েতে মাটি ছড়িয়ে রাখত, দিনের আলোয় স্যাটেলাইট থেকে মনে হত গহ্বর। রাত হলেই মাটি সরিয়ে উড়িয়ে দিত বিমান—রসদ আর সৈন্য নিয়ে যেত প্রতি রাতে—শেষ সমর্পণের দিন পর্যন্ত।

প্রশ্ন : গুপ্তচরদের রোজগার নিশ্চয় অনেক?

মা : ঠকেও মরে। যেমন বুরবক বনেছিল সিসারো নামে স্পাই। তার আসল নাম এলিসা বাজনা। জাতে তুর্কি। চাকরি করত নিরপেক্ষ তুরস্ক-এর রাজধানী আঙ্কারা-র ব্রিটিশ দূতাবাসে। ১৯৪৩-এর অক্টোবরের এক সকালে রাজদূত স্যার হিউজে বাথটাবে ডুবে গা ধুচ্ছিলেন। টপ-সিক্রেট ডকুমেন্ট বোঝাই বাক্সটা ছিল পড়াশুনার ঘরে টেবিলে। এলিসা টুক করে চাবি থেকে একটা মোমের ছাঁচ বানিয়ে নিয়েছিল। তারপর সারা মাস ধরে ৫২টা ডকুমেন্টের নকল বানিয়ে চড়া দামে বেচেছিল আঙ্কারা-র নাৎসী অফিসারদের কাছে। তুরস্ক তখন চিন্তা করছে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়বে কিনা। গুপ্ত সংবাদগুলো খুবই কাজে লেগেছিল জার্মানদের। 'সিসারো' সাঙ্কেতিক নামটা জার্মানদেরই দেওয়া—রোমের সুবক্তা সিসারো ছিলেন মস্ত রাজনীতিবিদ খ্রিস্টপূর্ব ১০৬ থেকে ৪৩-এ। মহানন্দে এলিসা স্পাইং চালিয়ে গেল ১৯৪৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত। তুরস্ক তদ্দিনে ঠিক করে নিয়েছে যুদ্ধে নাক গলাবে না। তিন লক্ষ পাউণ্ড রোজগারও করে ফেলেছে এলিসা—লুকিয়ে রেখেছে ব্রিটিশ দূতাবাসেই শোবার ঘরের কাঠের মেঝের তলায়। এপ্রিলেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে টাকার আণ্ডিল নিয়ে উধাও হয়ে গেল এলিসা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে আবির্ভূত হল ইস্তানবুলে—মতলব ছিল টুরিস্টদের জন্যে বানাবে বিলাসবহুল হোটেল। তখনই জানল, জামার্নরা তাকে ঠকিয়েছে। জাল টাকা দিয়েছে।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষেও নিশ্চয় ছিল গুপ্তচররা?

মা : কৌটিল্য, কামন্দক আর যাজ্ঞবল্ক্য দূত আর গুপ্তচরকে দুটো আলাদা ভাগে ফেলেছিলেন। কামন্দক বলেছিলেন—সবার সামনে কাজ করে যারা, তারা হল দূত—আড়ালে করলে গুপ্তচর। কৌটিল্য গুপ্তচরগিরির ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন; তাঁর অর্থশাস্ত্রের ৪ অধ্যায়ে এই পেশা নিয়ে আলোচনা করেছেন। চর-দের 'রাজার চোখ' বলেছেন কামন্দক। একই কথা আছে মহাভারতের উদ্যোগপর্বে। শ্লোকটা এই: চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ। শুক্রনীতিসারে রাজাকে রোজ রাতে গুপ্তচরদের কাছ থেকে জানতে হবে আত্মীয়স্বজন, রাজকর্মচারী, অন্তঃপুরিকা আর প্রজাদের মতিগতি কিরকম।

প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতবর্ষের গুপ্তচর! এ কাজ করত কারা?

মা : বুদ্ধি যাদের ছুরির মত, কথা যাদের মধুর মত, খাটতে পারে গাধার মত, চকিতে বুঝতে পারে অন্যের মনোভাব—তাদেরকেই বহাল করা হত চরের কাজে। কৌটিল্যের লেখা থেকে মনে হয়, ছাত্র, উদাসীন, গেরস্থ, ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিরা ছদ্মবেশে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ করত। জ্যোতিষী আর মেয়েরাও ভাল গুপ্তচর হতে পারত। কৌটিল্য দুই শ্রেণীর গুপ্তচরের কথা লিখেছেন। এক, এক জায়গায় থেকে খবর জোগাড় করার

গুপ্তচর; দুই, নানা জায়গায় ঘুরে খবর এনে দেওয়ার গুপ্তচর। নানান গুপ্তচর লাগিয়ে একই খবর সংগ্রহ করার বিধানও দিয়েছেন ক্ষুরবুদ্ধি কৌটিল্য এবং সেই সব গুপ্তচররা যেন কেউ কাউকে চিনতে না পারে। একই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে মহাভারত আর বিষ্ণুধর্মোত্তরেও।

প্রশ্ন : মহাভারতেও গুপ্তচর বর্ণনা আছে?

মা : শান্তিপর্ব ১৪০-৪১-য়ে আছে—'পাষণ্ড তাপস প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর। লোকের কন্টক-স্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শুন্যাগার, পানাগার, তীর্থ ও দ্যুত সভায় প্রতিনিয়ত গমন করিয়া থাকে।'

প্রশ্ন : কিন্তু মা, কাজটা নোংরা হলেও দেশের মঙ্গল কি হয়নি গুপ্তচরগিরির ফলে?

মা : সেকালের ভারতবর্ষে দুর্নীতিদমন করার ব্যাপারে, দেশে শাসনশৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে গুপ্তচরদের অবদান কম ছিল না। এরাই খবর এনে দিত ঘুষ নিচ্ছে কিনা বিচারপতি অথবা কোনো রাজকর্মচারী। সমাজবিরোধীদের যম ছিল এই গুপ্তচররা—শান্তিভঙ্গ করলে, টাকা জাল করলে, খাবারে ভেজাল মিশোলে, চুরি-চামারি লুঠপাট করলে—এরাই ফাঁসিয়ে দিত দুষ্কৃতিদের। দেশের ভেতরের অবস্থা কিরকম—রাজাকে সে সম্বন্ধে সজাগ রাখত। এক গুপ্তচরের খবর আর এক গুপ্তচর সত্যি বলে ফতোয়া দিলে—পুরস্কার পেত সেই গুপ্তচর। খবর মিথ্যে হলে কিন্তু তার কপালে অনেক দুঃখ লেখা থাকত। ভারতীয় গুপ্তচরদের নাম গ্রীস আর রোম দেশেও পৌঁছেছিল

প্রশ্ন : ইণ্ডিয়ান স্পাইদের সুনাম গ্রীস আর রোমে?

মা : সে দেশের ঐতিহাসিকরা লিখে গেছেন ইণ্ডিয়ান স্পাইদের সম্বন্ধে অনেক কথা। 'এপিসকোপাই' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর কথা বলা হয়েছে; এরা ঘুরে ঘুরে খবর জড়ো করত—রাজাকে অথবা শাসন-অধিকর্তাকে জানিয়ে দিত। স্ট্র্যাবো-র বইতে এদেরকেই বলা হয়েছে 'এফোরি'। কৌটিল্য যেমন ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহর জন্যে মেয়ে-গুপ্তচর বহাল করার নির্দেশ দিয়েছেন স্ট্র্যাবোর লেখাতেও পাওয়া যায় সেই পদ্ধতি—নগর আর শিবির ঘুরে খবর জোগাড় করে মেয়ে-গুপ্তচররা। কৌটিল্য বলেছেন, রাজা এদের খবর থেকেই বুঝে নেবেন রাজ্যের কোথায় কোথায় অসন্তোষ দানা পাকাচ্ছে—দরকার হলে বিরোধ পাকিয়ে বিরোধী দমন করবেন—রাজানুরক্তদের বেশি সম্মান দিয়ে দলে টেনে নেবেন। এমনকি বিচারের ব্যাপারেও বিচারকরা বাদী আর বিবাদীর বক্তব্য সমর্থনের জন্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে খাঁটি খবর জোগাড় করতে পারেন কৌটিল্যের ব্যবস্থায়।

প্রশ্ন : এখন তো গুপ্তচররা পাশের দেশের খবর আনছে। সেকালে?

মা : সেকালের ভারতবর্ষেও ছিল একই ব্যবস্থা। পাষণ্ড আর প্রচ্ছন্ন তাপসদের দিয়ে অন্য দেশ থেকে খবর জোটানোর উপদেশ আছে মহাভারতে। প্রবাসী রাজদূতদেরও এ কাজ করতে হত—সেই দেশের রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়ে গুপ্ত সংবাদ বের করে নিতেন। কখনো দেশের ভেতরে যারা রাজার বিপক্ষে, গুপ্তচর বাছা হত তাদের মধ্যে থেকে। অন্য দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, টাকাপয়সার অবস্থা, সৈন্যব্যবস্থা, দুর্গ ইত্যাদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—সব খবর চলে আসত গুপ্তচরদের মাধ্যমে। মহাভারতের দ্রোণপর্বে লেখা আছে, কুরু আর পাণ্ডব দুই দলই গুপ্তচর লাগিয়েছিল সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই। বিদেশের গুপ্তচররা গোপন খবর পাঠাতো সাঙ্কেতিক লিপির সাহায্যে।

প্রশ্ন : মহাভারতের গুপ্তচর শিক্ষা নিশ্চয় বৃথা যায়নি পরবর্তীকালে?

মা : তা কি করে বলব? তবে গুপ্তচর দিয়ে শুধু খবর জোগাড় করা ছাড়াও শত্রুদেশকে দুর্বল করাও হয়েছে। শোনা যায়, মগধরাজ অজাতশত্রু এই কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন লিচ্ছবি-মগধ যুদ্ধে। লিচ্ছবিদের ঐক্য চুরমার করে দেওয়ার জন্যে মন্ত্রী বস্‌সকার-কে পাঠিয়েছিলেন। বস্‌সকার লিচ্ছবিদের মধ্যে অনৈক্য এনে দিয়েছিলেন। অজাতশত্রুর মতলব হাসিল হয়েছিল।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, আধুনিক যুগে ছদ্মবেশে খবর জোগাড় করে যারা, তাদেরকে তো গোয়েন্দা-ও বলা হয়?

মা : তা হয়। গুপ্তচর আর গোয়েন্দা নামের মধ্যে একটা মর্যাদার ব্যবধানও তৈরি হয়েছে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কিন্তু বংশপরম্পরায় গোয়েন্দাগিরি করত একটাই সম্প্রদায়: খোঁজী সম্প্রদায়। অপরাধ নির্ণয় এদের ছিল একচেটিয়া পেশা। রাজা-বাদশা, গেরস্থ-বণিক, হিন্দু-মুসলমান—প্রত্যেকেই দরকার হলে খোঁজী-দের খুঁজত। ইংরেজরা এদেশে আসার আগে জমিদারি-পুলিশের রঙ্গাস্তি চাকরানিরা ছিল খোঁজী গোষ্ঠীর গোয়েন্দা। ইংরেজরা এদের প্রথম হদিশ পায় পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলায়।তারপরেই খবর আসে, নদীয়াতেও রয়েছে খোঁজী গোষ্ঠী। এই জাত-ব্যবসায়ীদের দিয়ে অনেক জটিল মামলার কিনারা করেছেন ইংরেজ বিচারপতিরা।

প্রশ্ন : ভারতীয় 'খোঁজী'রা তাহলে গুপ্তবিদ্যা শিখিয়েছে ইংরেজদের?

মা : গোটা পৃথিবীকে 'খোঁজী'রা শিখিয়েছে একটা বিদ্যে: পদচিহ্ন বিদ্যে। খোঁজী'রা এই গোপন বিদ্যে জানত পুরুষানুক্রমে—ইংরেজরা তা জেনে নিয়ে চালু করে ভারতীয় পুলিশমহলে। ইংরেজি পরিভাষাগুলোও দিশি পরিভাষা 'এড়ী, তল, পেষ, সাঁকো'র নিছক অনুবাদ। রাজস্থানের মরুঅঞ্চলের খোঁজী গোষ্ঠী 'ট্র্যাকটিং' নামে আর এক গোপন বিদ্যায় অতিশয় কুশলী। ভারতীয় পুলিশ সেই বিদ্যের কিছুটা শিখে নিয়ে তাকে বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছে। তামাম দুনিয়ার পুলিশরা এখন তারই চর্চা করে চলেছে।

প্রশ্ন : 'খোঁজী'দের নিয়ে সত্যি গোয়েন্দা গল্প লেখা যায় না?

মা : তাদের খুঁজে পেলে তো! রাজস্থান ছাড়া আর সব জায়গায় মুছে গেছে এই জাত-ব্যবসায়ী গুপ্তচর-গোয়েন্দারা।

গুমখুন

প্রশ্ন : জাতীয় নেতার মুণ্ড শূন্যে ছিটকে দেওয়ার মত ঘটনা কখনও ঘটেছে?

মা : না। তবে ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে গুপ্তঘাতকদের অজস্র বর্বর কাহিনী। রাশিয়ার নিহিলিস্টরা কি কম কাণ্ড করেছে! জারের ঘোড়াকে শূন্যে ছিটকে দিয়েছে বোমা ফাটিয়ে—তার পরের বোমায় চেহারা পালটে দিয়েছে স্বয়ং জারের।

প্রশ্ন : কোন্ জার মা?

মা : রাশিয়ার মহাবিপ্লব যখন ঘটেনি—তার আগে লোমহর্ষক খুনখারাপিতে ছেয়েছিল রাশিয়া দেশটা। কৃষক আর অভিজাতদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল বিদ্বেষ আর চক্রান্ত। নিহিলিস্টদের বোমার ঘায়ে হাত-পা উড়ে যাওয়া অথবা বিলকুল খতম হয়ে যাওয়াটা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কেউ আর তেমন চমকে উঠত না। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার খুনের হুমকির পরোয়া করতেন না। ভূমিদাসদের তিনি চিরকালের মত মুক্তি দিয়েছিলেন, আইনকানুনের বিস্তর সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু তাতেও পুরুষানুক্রমে সন্ত্রাসের রাজত্বর অবসান ঘটানো যায়নি। নিহিলিস্টদের চোখে সম্রাট তখন অত্যাচারী রাজবংশের শিরোমণি ছাড়া কিছুই নয়। নৃশংস মৃত্যুই নাকি তাঁর একমাত্র প্রাপ্য শাস্তি। তাই একদিন রক্ষীদের হাজার সজাগতা সত্ত্বেও সম্রাটের খাবার ঘরের নিচে রাখা হয়েছিল অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা। গুমখুনিরা জানত, কখন খেতে বসেন সম্রাট। বোমা ফাটবে ঠিক তখনই। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে! ১৮৮০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বোমা রাখা হল—আর ঠিক সেইদিন সেই সময়েই আলেকজাণ্ডার রুটিন ভঙ্গ করলেন। ভাইপোর সঙ্গে অন্য ঘরে বসে কথা বলতে লাগলেন। বলে পাঠালেন, খেতে আজ দেরি হবে। ঠিক সাড়ে ছটায় গোটা খাবার ঘরটা ছিটকে গেল প্রাসাদের বাইরে শূন্যে—ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ল ৭৬ জন রাজরক্ষী—সোনার থালা আর সিল্কের চাদর ঘিরে রইল ছিন্নভিন্ন দেহগুলোকে। সেন্ট পিটার্সবার্গের বিখ্যাত উইনটার প্যালেসের একটা দিক পুরো ধ্বংস হয়ে গেছিল

এই বিস্ফোরণে—আওয়াজ শোনা গেছিল কয়েক মাইল দূর থেকে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বড় গোঁয়ার ছিলেন বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলেও খুন হয়ে গেলেন ঠিক ১৩ মাস পরে।

প্রশ্ন : নিহিলিস্টদের বোমায়?

মা : হ্যাঁ। প্রাসাদের একটা দিক উড়িয়ে দিয়েও জার-কে খতম করা যায়নি শুনেই নিহিলিস্টরা ফের কোমর বেঁধে লেগেছিল। যে রাস্তা দিয়ে জার যেতেন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে—সেই রাস্তা এমনিতেই ফাঁকা থাকত। রাস্তার পাশে চিজ বিক্রির দোকানঘর খুলে বসেছিল নিহিলিস্টরা। নামেই দোকান। মেঝে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাস্তার তলা পর্যন্ত। খোঁড়া মাটি রাখা হত চিজের পিপেতে। জানি না, এই ঘটনা থেকেই শার্লক হোমসের একটা কেস লেখা হয়েছিল কিনা। যাই হোক, কানাঘুষোয় কিন্তু গোয়েন্দাবাহিনীর টনক নড়ায় বন্ধ করে দেওয়া হল চিজের দোকান। জারকেও হুঁশিয়ার করা হল। কিন্তু কাঠগোঁয়ার ভদ্রলোক কোনও কথাই কানে তুললেন না। 'খুনের ভয়ে কয়েদি হয়ে থাকব নাকি বাড়িতে?' এই বলে বেরোলেন সৈন্যদের একটা অনুষ্ঠান দেখবেন বলে। নিহিলিস্টরা বোমার বাণ্ডিল নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল নানা দিকে। অনুষ্ঠান থেকে ফেরবার সময়ে বিশেষ একটা ব্রিজের ওপর তাঁর ঘোড়ায় টানা গাড়ি উঠতেই একজন নিহিলিস্ট মেয়ের হাতে দুলে উঠল একটা রুমাল। সেই হল সঙ্কেত। খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট হাতে একজন পুরুষ আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলে ঘোড়ার পায়ের তলায়। আগুন আর বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল শূন্যে ছিটকে যাচ্ছে সামনের ঘোড়া। বাকি ঘোড়াগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কসাক রক্ষীরা মারা গেল, জখমও হল, তালগোল পাকিয়ে গেল কাঠ আর লোহায় মোড়া গাড়িখানা।

প্রশ্ন : জার-ও মারা গেলেন?

মা : না। তিনি ভাঙা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জখমদের দিকে এগোতেই প্যাকেট হাতে এগিয়ে এল আর একজন, জিজ্ঞেস করল নরম গলায়—লাগল নাকি? জার বললেন—'আঁচড়ও লাগেনি।' সঙ্গে সঙ্গে লোকটার হাতের প্যাকেট আছড়ে পড়ল সটান রাজার ওপর। এবারের বিস্ফোরণ আরও প্রচণ্ড। সম্রাটকে আর চেনাও যাচ্ছিল না। ধড়ে প্রাণ রয়েছে তখনও—মারা গেলেন প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার পর।

প্রশ্ন : ওইরকম বিস্ফোরণের পরেও বেঁচে ছিলেন?

মা : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের ক্ষেত্রেও এইরকম পরমায়ুর জোর কিছুটা দেখা গেছে সেদিন ছিল ক্যাবিনেট মিটিং। গৃহযুদ্ধে পরাজিত বিরোধী পক্ষের এক গুপ্তচর আর এক তরুণ সেনানীকে ক্ষমা করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরছেন ৫৫ বছরের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। স্ত্রী মেরী বললেন—'চলো, একটা মজার নাটক দেখে আসবে ফোর্ড থিয়েটারে।' ৮টায় নাকেমুখে গুঁজে দুজনে চলে গেলেন থিয়েটারে। বসলেন স্টেট বক্সে। দোলনা চেয়ারে বসে দুলতে-দুলতে নাটকের মজায় সব ক্লান্তি যখন ভুলে গেছেন, ঠিক তখনি এক ছোকরা এসে দাঁড়ালো প্রেসিডেন্টের পেছনে। রাত তখন দশটা। লোকটার নাম জন উইলকিস। রোমিওর ভূমিকায় অভিনয় করেই চলে এসেছিল খুন করবে বলে। নাটক করে নাম করতে পারেনি বলে বড়াই করেছিল—'এবার এমন নাটক করব যে গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে আমার নাম।' গৃহযুদ্ধে পরাজিত পক্ষের সমর্থক সে। ছোট্ট পিস্তল তুলে গুলি করেছিল লিঙ্কনের বাঁ কানে—গুলি ব্রেনের মধ্যে গিয়ে আটকে গেছিল ডান চোখের পেছনে। বেঁচেও ছিলেন কিন্তু ভোর পর্যন্ত। গুপ্তঘাতক? সে তো গুলি করেই স্টেট বক্স থেকে লাফিয়ে ১৪ ফুট

নিচে নেমেই গলা ফাটিয়ে সোল্লাসে বলেছিল—এইভাবেই শেষ হোক অত্যাচারীর দল। কিন্তু পতাকায় ডান পা জড়িয়ে যাওয়ায় ভেঙে গেছিল বাঁ পা। তারপরেও ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাণে বাঁচেনি।

প্রশ্ন : Assassin শব্দটার আসল মানে কী মা?

মা : ক্রুসেড। যুদ্ধের সময়ে বিশেষ এক গুপ্ত মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে শত্রু হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যেত। এ কাজ করতে হত 'হাশিশ' নামে মাদক দ্রব্য খাওয়ার পর। 'হাশিশ' প্রভাবে থাকার সময়ে তাদের 'হাশাশিন' বলে ডাকা হত। এই শব্দটাই মধ্যযুগীয় ল্যাটিনে ঢুকে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের নানা ভাষায়। ইংরেজিতে Assassin শব্দটা চালু হয় সতেরো শতকে। যে কোনও খুনির ক্ষেত্রেই এ-শব্দের ব্যবহার থাকলেও বিশেষ করে রাজনৈতিক হত্যার সময়ে শব্দটার চল বেশি আছে। আঠারো শতকে যুক্তরাষ্ট্রে দলবদ্ধ গুমখুনের রাজত্ব চালিয়েছিল সেরা গুমখুনি চিনে সমাজবিরোধীরা—পাল্লা দিয়ে গেছিল আইরিশ আর ইটালিয়ানরা। অভাব ছিল না গুপ্ত সমিতির। অদ্ভুত তাদের নাম। যেমন, মরা খরগোশ। ইটালিয়ানরা স্বদেশের দারিদ্র্য এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে এসে খুলে বসেছিল নিজেদের গুপ্ত সমিতি 'মাফিয়া'। মাফিয়া মানে জানিস তো? সিসিলিয়ান সমাজবিরোধীরা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে মাফিয়া অর্থাৎ খাটো ঝোপঝাড় আগাছায় গা ঢেকে থাকতো বলে তাদের নাম দাঁড়িয়েছিল মাফিয়া। ১৮৮০-তে এই মাফিয়ারাই নিউ অর্লিয়েন্সে 'ব্ল্যাকহ্যাণ্ড' অর্থাৎ 'কালোহাত' নাম নিয়ে ঢুকে পড়ে চালিয়ে গেছিল লোমহর্ষক সন্ত্রাসের রাজত্ব বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এদেরই কুকীর্তির ফলে।

প্রশ্ন : মহাযুদ্ধের পেছনে ছিল 'কালোহাত'?

মা : জানিস তো প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক আর আর্চডাচেসকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিল বলে। সার্বিয়া-র বিপ্লবী 'কালো হাত' ছিল তার পেছনে। ১৯১৪-র ২৮ জুন জোড়া খুনের নায়ক ছিল একজন ছাত্র—তাকে অতিয়েছিল 'বুল' অর্থাৎ 'ষাঁড়' নামধারী এক অতি কদাকার আর দৈত্যাকার পুরুষ—আসল নাম তার ড্রাগুটিন ডিমিট্রিয়েভ—ছিল আর্মি অফিসার, তলায় তলায় গড়ে তুলেছিল ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক গুপ্ত সমিতি—কালোহাত। জোড়া খুনের কয়েক হপ্তার মধ্যেই সার্বিয়া আক্রমণ করে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী—শুরু হয় পৃথিবী জুড়ে রক্তঝরা যুদ্ধ! পৃথিবীর ভারসাম্যই পাল্টে গেছিল সেই যুদ্ধে—ভুল প্রমাণিত হয়েছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলি-র কথা

প্রশ্ন : ডিসরেলি কী বলেছিলেন, মা?

মা : বলেছিলেন—'গুপ্তহত্যা কখনই বিশ্ব ইতিহাস পাল্টে দেয়নি।' ওঁর মৃত্যুর পরেই, অস্ট্রিয়া রাজবংশের এই ডবল মার্ডারের পরেই, মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছিল দু' কোটি লোকের মাথায়—ঝাঁকুনি খেয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাস।

প্রশ্ন : গুমখুনিরা কেন এমন নরপিশাচ হয়ে যায় মা?

মা : কারণ অনেক। পাগলামি, ঈর্ষা, লোভ। মূল এই তিনটে কারণ থেকেই কার মাথায় শেকড় চালিয়ে দেয় বিকৃত দেশপ্রেম, কেউ অর্জন করতে চায় কুখ্যাতি, কেউ চায় আতঙ্ক থেকে মুক্তি। যেমন ঘটেছিল ক্যাথরিনের ক্ষেত্রে। আতঙ্ক আর উচ্চাশা মিলেমিশে তাঁকে গুপ্তঘাতক করে তুলেছিল। জীবনে ব্যর্থ মানুষ মনকে যখন বোঝায় যে অমুক দেশনেতা বা রাজপরিবারের কাউকে খতম করতে পারলেই ভয়ানক একটা অন্যায়ের প্রতিকার করে ফেলা যাবে—তখন ভয়ঙ্কর সেই বদ্ধমূল ধারণা থেকেই জন্ম নেয় হত্যার লিপ্সা। শেক্সপিয়র

এই কারণেই বলেছিলেন—Uneasy lies the head that wears a crown! মুকুটধারীর মাথা স্বস্তিতে থাকতে পারে না কখনই!

প্রশ্ন : অভিশপ্ত মুকুট?

মা : না তো কি! শুধু মুকুট পরার অপরাধে কত ভালো মানুষকে প্রাণবলি দিতে হয়েছে। 'ষাঁড়' নামধারী নরপিশাচের মত আরও এক গুপ্তঘাতক যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারের হৃৎপিণ্ড বুলেট মেরে ফুটো করে দিয়ে যুগোশ্লাভিয়া আর হাঙ্গেরির মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর উপক্রম করেছিল ১৯৩৪-এর অক্টোবরে। নাম তার পিটার কেলম্যান। রেগে আগুন জনতা তাকে পিটিয়েই মেরে ফেলে। 'ষাঁড়'-কে অবশ্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তার প্রথম পৈশাচিক রাজহত্যার জন্যে।

প্রশ্ন : গুপ্তহত্যার জন্যে পুরস্কার?

মা : 'ষাঁড়' ছিল আর্মি লেফটেনান্ট—সার্বিয়ার রাজা আর রানীকে নৃশংসভাবে খুন করার পুরস্কার পেল কর্নেল হয়ে গিয়ে। সেই তার প্রথম গুপ্তহত্যা। বৃহত্তর সার্বিয়া-র স্বপ্ন দেখত যে তপ্তমস্তিষ্ক সৈন্যরা—'বুল' ছিল তাদের পালের গোদা। দেশের মঙ্গলের জন্যে যাদের পরলোকে যাওয়া দরকার, তাদের খতম তালিকাও তৈরি করেছিল 'বুল'। ফর্দের প্রথমেই ছিল দুর্বল রাজা আলেকজাণ্ডার আর তার কুটিল রানী ড্রাগা-র নাম। নানারকম শয়তানি চক্রান্তে বোঝাই রানী ড্রাগা-র মাথা। তাই একদিন দলবল নিয়ে চণ্ডাল 'বুল' হানা দিল প্রাসাদে গভীর রাতে। ডিনামাইট ফাটিয়ে ফিউজ করে দিল সমস্ত আলো। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না রাজা আর রানীকে। তারপরেই দেখা গেল, শোবার ঘরের লাগোয়া গুপ্তঘরে লুকিয়ে জানালা দিয়ে রক্ষীদের ডাকছে রাজা আর রানী। তেড়ে গেল 'বুল' চ্যালাদের নিয়ে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দুজনকে আধমরা করার পর রানীকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলে দিলে জানালা—দিয়ে রাজার পেটে এত জোরে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল 'বুল' যে তলোয়ার পেট ফুটো করে আটকে গেল কাঠের মেঝেতে। তখনো রাজা মরেনি দেখে তাঁকেও চ্যাংদোলা করে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই তিনি দুহাতে গোবরাট আঁকড়ে ধরেছিলেন। একজন কশাই সৈন্য তলোয়ারের এক কোপে আঙুলগুলো কেটে বাদ দিতেই নিচে আছড়ে পড়েছিলেন আলেকজাণ্ডার।

প্রশ্ন : 'কালোহাত' গুপ্তসমিতি তখন গড়ে উঠেছিল?

মা : না। এরপর থেকেই দক্ষিণী স্লাভ-দের এক করে আরও বড় দেশ যুগোস্লাভিয়া গড়ে তোলার স্বপ্নে বুদ হয়ে যায় 'বুল'—১৯১১-র মে মাসে জন্ম নিল কুখ্যাত 'কালোহাত'। 'আসল' সার্বিয়া-র সমস্ত শত্রুনিধনই ছিল এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। ১৯১২ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে প্রায় ১২০টা গুপ্তহত্যা চালিয়ে গেছে 'কালোহাত'। ১৯১২-তে সেরা গুপ্তঘাতকদের ভিয়েনা পাঠিয়েছিল 'বুল' অস্ট্রিয়ার মহারাজা ফ্রান্সিস জোসেফের রক্ত ঝরানোর জন্যে। ব্যর্থ হয় ষড়যন্ত্র। তারপরেই তিন ছাত্রকে তাতিয়ে অস্ট্রিয়ারই আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ-কে খুন করায় 'বুল'। যে-ছেলেটা খুন করেছিল, তার বয়স তখন একুশও নয়। যক্ষ্মায় ধুঁকছে। জেলখানাতেই মারা যায় দু-বছর পরে। তাতে বয়ে গেল 'বুল'-এর। যুদ্ধের সময়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতই লড়েছে—আবার 'কালোহাত'কেও চালু রেখেছে। ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরে ঘাতক পাঠিয়ে দিল বুলগেরিয়ার রাজা ফার্দিনান্দ-কে খতম করার জন্যে। গুলি ফসকে যাওয়ায় ঘাতকের হয় মৃত্যুদণ্ড।

প্রশ্ন : ক্যাথরিন কে মা? যার কথা বললে একটু আগে?

মা : ইনিও ছিলেন রানী—রাশিয়ার রাজা তৃতীয় পিটারের বউ। বিয়ের ১৭ বছর পরে, রাজার বয়স যখন মোটে ৩৪, লোক লাগিয়ে রানী তাঁর গলা টিপে মারেন। কারণ, কাউন্টেস ওরোনোফের সঙ্গে রাজার মেলামেশা দেখে ভয় পেয়েছিলেন ক্যাথরিন। এরপর থেকেই পৈশাচিক হত্যালীলা শুরু হয় রাশিয়ার রাজপরিবারে। ক্যাথরিনের কাছ থেকে মুকুট পাওয়ার পাঁচ বছর পরেই ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হলেন পিটারের ছেলে রাজা প্রথম পল। রাজা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বোমায় মরার কথা আগেই বলেছি—ইনি ছিলেন পিটারের প্রপৌত্র।

প্রশ্ন : রানীরাও তাহলে গুপ্তহত্যা চালায়?

মা : ইতিহাসে রয়েছে এই ধরনের বিকৃত হত্যালালসার আরও অনেক ঘটনা। যেমন ডোমিটিয়া। এঁর স্বামী ছিলেন রোম-রাজা ডোমিটিয়ান। বিকৃতমস্তিষ্ক অত্যাচারী ছিলেন বলে প্রত্যেকেরই চক্ষুশূল ছিলেন। বর্বর স্বামীকে ভাড়াটে ঘাতক লাগিয়ে শোবার ঘরেই খুঁচিয়ে মারেন রানিসাহেবা। এ ঘটনা ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৯৬-তে। তবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পারিবারিক গুপ্তহত্যা পরম্পরার শুরু খ্রিস্টপূর্ব ৪১-এ। উন্মাদ রোমসম্রাট ক্যালিগুলা নিহত হওয়ার পর থেকেই। শূন্য রাজসিংহাসনে বসানো হল অনিচ্ছুক তিবেরিয়াস ক্লডিয়াস-কে। পয়লা নম্বর বইয়ের পোকা তিনি। তাই দেশশাসন তুলে দিলেন বউদের হাতে। বিশেষ করে তৃতীয় আর চতুর্থ স্ত্রীর হাতে। এঁদের নাম মেসালিনা আর অ্যাগ্রিপ্পিনা। বদ স্বভাবের জন্যে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮-এ খুন হলেন মেসালিনা। পথের কাঁটা সরে যাওয়ায় অ্যাগ্রিপ্পিনা ছেলে নিরো-কে দিয়ে ক্ষমতা দখল করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু রয়েছে আর এক পথের কাঁটা—তরুণ ব্রিটানিকাস। অ্যাগ্রিপ্পিনা তাঁকে বিষ খাইয়ে শেষ করে দিলেন। সম্রাট বানালেন সতেরো বছরের ছেলে নিরো-কে।

প্রশ্ন : ছেলের জন্যে এত খুন?

মা : সেই ছেলেই মা-কে খুন করিয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৯-য়ে। মায়ের কতৃত্ব সইতে না পেরে। নিরোর রক্তেও যে রয়েছে উন্মত্ততা আর নৃশংসতা। ২৯ বছর বয়সে, রোম জ্বালিয়ে দেওয়ার চার বছর পর, গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে নিজেই নিজের বুকে ছোরা বিধিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

প্রশ্ন : রাজারাজবাড়া বেশির ভাগই মরেছেন আত্মীয়-স্বজনের হাতে?

মা : সবসময়ে নয়। ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম এডোয়ার্ডের বয়স যখন মোটে তেরো, তখন তাঁর নিজের কাকা ডিউক অফ গ্লসস্টার বেচারাকে টাওয়ার অফ লণ্ডনে আটকে রাখেন ১৪৮৩-তে—সেখানেই দম আটকে মারা যায় ছেলেটা। রিচার্ড তৃতীয় হয়ে যান খুনে কাকা। তবে বেশির ভাগ নৃপতিদের নৃশংস নিধন ঘটে অজানা অচেনা মাথাপাগল গুপ্তঘাতকের হাতে। যেমন ইটালির রাজা আমবার্তো গুপ্তঘাতকের মরণ-মার এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'এ তো আমাদের পেশাগত ঝুঁকি'। ঠিক তারপরেই আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন ১৯০০ সালে। কুইন ভিক্টোরিয়ার ওপর গুপ্তঘাতক চড়াও হয়েছিল ছবার। ১৮৫৮-র জানুয়ারিতে অ্যানার্কিস্ট নিকোলা ওরসিনি-র ছোঁড়া বোমার ধোঁয়ার মধ্যে থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেছিলেন, রাজা লুইস ফিলিপের ওপর যদি দশটা হামলা হয়ে থাকে তো এখনও আমার পাওনা আরও ছ'টা—এই নিয়ে তো হল মোটে চারটে! একথা যখন বলছেন, তখন তাঁকে ঘিরে পড়ে রয়েছে ৫৬ জন মারাত্মকভাবে জখম মানুষ—তাদের মধ্যে মারা যায় আটজন। মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েও প্যারিস অপেরার দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি পাথরের মূর্তির দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, 'যে গুপ্তঘাতক খুন করে

পালাতে চায় না, তাকেই বেশি ভয়!’ রাজা চতুর্থ হেনরিও প্রাণ দিয়েছিলেন গুপ্তঘাতকের ছোরার মারে। আর এটাও তো ঠিক যে, বেশির ভাগ গুপ্তঘাতক এমনই ‘ফ্যানাটিক’ হয় যে পালাবার কথা মাথায় না রেখেই খুন করার জন্যে ক্ষেপে ওঠে।

প্রশ্ন : খুন করেও পালাতে চায় না, সে কেমন ঘাতক মা?

মা : কারণ তাদের মাথায় মস্ত ক্ষোভের দংশন চলে অবিরাম—তাই তারা নিজেদের চাইতে বেশি করে ভাবে: যার জন্যে এই যন্ত্রণা, আগে তাকে নিকেশ করা যাক। বিকৃত এই ধারণার ফলেই তারা এমন একজনকে টার্গেট হিসেবে বেছে নেয় যে ব্যক্তি এই জীবনের সমস্ত বিতৃষ্ণার মূল—যে এই জীবনের সমস্ত চাওয়ার প্রতিবন্ধক। ক্ষমতা আর সুবিধার প্রতীকী মুকুটমণি তো রাজা অথবা রাষ্ট্রনায়ক—অন্তরের ঘৃণা উপচে পড়ে তার ওপর—মনে করে, একে খতম করলেই পাল্টে দেওয়া যাবে পৃথিবীর চেহারা। ক্রমাগত গুমরে থাকতে-থাকতে, একটার পর একটা ঘটনার চাপান পড়তে পড়তে, বিকৃত বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস হয়ে গিয়ে তাকে ‘ফ্যানাটিক কিলার’ করে তোলে। জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে কর্নেল এডওয়ার্ড ডেসপার্ড—বৃটেনের তৃতীয় জর্জ-কে নিকেশ করার চক্রান্ত এঁটেছিলেম বৃটিশ সরকারের খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। আধপাগল হয়ে আশার ছলনায় ভুলে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছিলেন সুস্থ বিচারবুদ্ধি। একই বিকৃতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল লিঙ্কনের গুপ্তঘাতক—নইলে গুলি চালিয়েই ১৪ ফুট নিচে লাফিয়ে পড়ে, পা ভেঙে ফেলেও অমন চেঁচায়—প্রতিশোধ নিয়ে গেল দক্ষিণ দেশ! একইরকম প্রতিহিংসা চরিতার্থতা আর অনুশোচনার অভাব দেখা দিয়েছিল ট্রটস্কি-র গুপ্তঘাতকের ক্ষেত্রেও।

প্রশ্ন : নির্বাসিত রাশিয়ান নেতা লিওন ট্রটস্কি?

মা : দু-বার খুনের চেষ্টা হয় তাঁর ওপর। প্রথমবার কয়েকশো মেশিনগান-বুলেট থেকে বেঁচে যান স্বামী-স্ত্রী খাটের আড়ালে বসে পড়ে। দ্বিতীয়বার গুপ্তঘাতকের লেখা পাণ্ডুলিপি খতিয়ে দেখতে মাথা নিচু করতেই কুঠার নেমে আসে তাঁর মাথায়। ঘাতক তাঁর বাড়িতে আসত। সেদিন বর্ষাতির তলায় নিয়ে এসেছিল বন্দুক আর কুঠার। কুঠারের একদিক ছুঁচোলো, আর একদিক হাতুড়ির মত। পেছন থেকে কুঠার তোলার মুহূর্তে ট্রটস্কি একটু ঘাড় ফিরিয়েছিলেন বলে কুঠার খুলি ফুটো করে ঢুকে যায় আড়াই ইঞ্চি—আর সিকি ইঞ্চি বেশি ঢুকলেই তক্ষুনি মারা যেতেন ৬১ বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু মর্মান্তিক চেঁচিয়ে উঠতেই ছুটে আসে দুজন বডিগার্ড। ট্রটস্কির ব্রেন কিন্তু মারাত্মক চোট পেয়েছিল। অসাড় হয়ে গেছিল একটা হাত—আর একটা হাত আপনা থেকেই বৃত্ত রচনা করেছিল শূন্যে। অপারেশনের আগে শেষ বক্তব্যে বলেছিলেন, রাজনৈতিক গুপ্তঘাতকের মার খেয়ে মরতে চলেছি আমি।’

প্রশ্ন : সব গুপ্তঘাতকই কি এমনি উন্মাদ?

মা : সব্বাই তো নয়—ভাড়াটে গুপ্তঘাতকরা দিব্বি ঠাণ্ডা মাথায় খুনখারাপি চালিয়ে যায়। ট্রটস্কি-র গুপ্তঘাতককে উন্মাদ প্রমাণ করা যায়নি তারই কথাবার্তা থেকে। আবার জন হিঙ্কলি নামে ২৩ বছরের যে-ছোকরা ১৯৮১-র ৩০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান-কে গুলি করেছিল—তাকে কিন্তু পাগল বলেই রেখে দেওয়া হয়েছে পাগলা গারদে। ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ নামে একটা সিনেমায় সে দেখেছিল প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন এমন এক নেতাকে গুপ্তহত্যা করার রোমহর্ষক দৃশ্য। এই সিনেমারই এক কিশোরী অভিনেত্রীকে একটা চিঠি লিখে রেখে সত্যিকারের প্রেসিডেন্টকে খুন করতে বেরিয়েছিল জন হিঙ্কলি। তার বড়লোক বাবা

দশ লক্ষ ডলারেরও বেশি খরচ করে ছেলেকে শুধু পাগল প্রমাণ করে প্রাণে বাঁচাতে পেরেছিলেন। আরথ ট্রটস্কি-র গুপ্তঘাতক খোশ মেজাজে জেলে বসে ছবি আঁকত, টিভি আর রেডিও মেরামত করত। গোটা জেলের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা দেখাশুনোর ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার ওপর। মুক্তির পর প্রাহাতে শুরু করে নতুন জীবন রেডিও আর টিভি মেক্যানিক হিসেবে।

প্রশ্ন : পাগলরা তাহলে খুন করলেও তাদের মৃত্যুদণ্ড হয় না?

মা : যুক্তরাষ্ট্রে এই আইন নিয়েই তো ঝড় উঠেছিল। ১৮৪৩ সালে ড্যানিয়েল এম. ন্যাটেন নামে এক ব্যক্তি ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার মনে করে প্রাইম মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে গুলি করে মেরে ফেলে—কিন্তু বেকসুর খালাস পেয়ে যায় মাথা খারাপ বলে। ১৮৩৫ সালে রিচার্ড লরেন্স নামে এক রঙমিস্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অ্যানড্রু জ্যাকসনকে গুলি করেও মারতে পারেনি—নিজেকে সে ইংল্যাণ্ড আর যুক্তরাষ্ট্রের রাজা বলে জাহির করত—তাই তাকে রাখা হয় পাগলা গায়দে।

প্রশ্ন : গুপ্তহত্যার হিড়িক বিদেশেই বেশি?

মা : স্বদেশেও কি কিছু কম? রাজনৈতিক খুনের রেওয়াজ সেকালেও ছিল—একালেও চলেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণনা আছে ঘাতকদের খপ্পর থেকে নৃপতিদের রক্ষা করার নানা রকম কৌশলের। তার মানে গুপ্তঘাতকরা তখনও ছিল ভারতবর্ষে। নইলে রাজা ভদ্রসেন নিজের ভাই-এর হাতে খুন হলেন কেন রানীর শোবার ঘরেই? ছেলের হাতে নিহত হননি রাজা কারূষ? কৌটিল্য তো ওইজন্যেই নির্দেশ দিয়েছিলেন—রাজা যেন আগেভাগে জানিয়ে না রাখেন কবে কোন্ রানীর শোবার ঘরে জিরোতে যাবেন। অজাতশত্রু না হয় বাবা বিম্বিসারকে স্রেফ না খাইয়ে মেরেছিলেন—আবার পেট ভরে খাইয়েও তো মেরে ফেলার কায়দা জানত এই ভারতের গুপ্তঘাতকরা—খাবারে আর শরবতে মেশানো থাকত বিষ—তাই রাজার জিভে পৌঁছোনোর আগে অন্যের জিভে টেস্ট করা হত খাবারদাবার। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী পড়লেই দেখবি রাজনৈতিক খুন কত রকমের হতে পারে। আলাউদ্দিন খিলজি তো ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে একাধারে কাকা আর শ্বশুরমশাইকে খুন করেই সুলতান হয়েছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক তোরণ চাপা দিয়ে মেরেছিলেন বাবাকে। পেশোয়া রাজারা জানতেন গুপ্তহত্যার নারকীয় কায়দা-কানুন। কত আর বলব? কিছু গুপ্তঘাতক সত্যিই উন্মাদ, আর কিছু চায় রাতারাতি নামী হয়ে যেতে। ১৮৮১-তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডকে গুলি করে চার্লস গিটো চেয়েছিল প্রচারটা যেন ভালভাবে হয়। ১৯০১ সালে প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলে-কে গুলি করে গুপ্তঘাতক লিওন জোলগোজ টেক্কা মারতে চেয়েছিল আগের বছরের আর এক গুপ্তঘাতককে—শেষের এই নরাধমটি ইটালির রাজার ওপর গুলি করে অর্জন করেছিল বিপুল কুখ্যাতি। অস্ট্রিয়ার আর্চডিউকের গুপ্তঘাতক গ্যাভরিনো প্রিন্সিপ ছোকরা কেবল কল্পনা করতে পারেনি দুটো মাত্র বুলেট বোমা-বারুদের প্রলয়ঝড় তুলবে পৃথিবী জুড়ে।

প্রশ্ন : ইদানীং দেখা যাচ্ছে কেন শুধু বোমা আর গুলিই গুপ্তঘাতকদের খুব পছন্দ?

মা : অর্থাৎ গুপ্তহত্যা নয়—বৈজ্ঞানিক প্রকাশ্যহত্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী গুলি খেয়েছেন সবার চোখের সামনে। ইন্দিরা গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত দেহরক্ষী দুজন বুলেট বর্ষণ করেছিল খোলাখুলি। রাজীব গান্ধীর মৃত্যু হল জীবন্ত বোমা (!) বিস্ফোরণে বিপুল জনতার সামনেই। ১৯৮০ থেকেই জাতীয় নেতাদের ওপর গুপ্তঘাতকদের হামলা চলছে কড়া সিকিউরিটি সত্ত্বেও—বদ্ধ উন্মাদ অথবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বদ্ধবিশ্বাসীকে আটকে রাখা যাচ্ছে না কোনোভাবেই। এ যেন লোহার ঘরে সাপের প্রবেশ! মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাত ১৯৮১-র ৬ অক্টোবর

মিলিটারি প্যারেড দেখতে দেখতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন নিজের সৈন্যদের গুলিতেই—উড়ন্ত বিমানগুলোয় কেউ টেরও পেল না—প্রেসিডেন্ট আর নেই। লেবাননে ১৯৮২'র ইলেকশনে প্রেসিডেন্ট বশির সাহেব ভোটে জিতেও প্রাণে বাঁচলেন না—প্রায় ৬০০ পাউণ্ড বিস্ফোরণ ঠাসা বোমায় উড়ে গেল তিনতলা বাড়ি—মাত্র ৩৪ বছরেই শেষ হয়ে গেলেন ভাবী প্রেসিডেন্ট—লেবাননের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন এমনই ঘোঁট পাকানো যে বোঝা গেল না বোমা রেখেছে কোন্ কাপুরুষ! ফিলিপাইনের জনপ্রিয় নেতা বেনিগনো অ্যাকুইনো তিন বছর নিবাসনে থেকে দেশে ফেরবার আগেই টেলিফোনে স্ত্রী-কে বলেছিলেন—ম্যানিলা এয়ারপোর্টে নামলেই গুলি করা হবে আমাকে—তার পরেই গুপ্তঘাতক গুলি করবে নিজেকে। হলও তাই।

ম্যাগনেটিজম—অদৃশ্য সমুদ্র।

প্রশ্ন : চুম্বকের কি অদৃশ্য হাত আছে?

মা : লোহাকে টেনে নেয় যে শক্তি দিয়ে—তা অদৃশ্য। তাকেই বলে ম্যাগনেটিজম। পৃথিবীর সব্বাই ডুবে রয়েছি ম্যাগনেটিজম-এর অদৃশ্য সমুদ্রে।

প্রশ্ন : অদৃশ্য সমুদ্র?

মা : সমুদ্র, সূর্য, চাঁদ, তারা দেখা যায়। রোদের আঁচ, বাতাসের ধাক্কা, জলের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাগনেটিজম সমুদ্রকে দেখা যায় না—তাকে টেরও পাওয়া যায় না। আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে, মহাশূন্যেও ঠিকরে গেছে, নিরেট পৃথিবীর মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছেছে—অথচ তার শব্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধ—কোনওটাই নেই।

প্রশ্ন : ম্যাগনেটিজম যে আছে, তাহলে প্রমাণটা হবে কী করে?

মা : তার কাজ দেখে বোঝা যায় সে আছে—শুধু বোঝানো যায় না আসলে সে কী—কয়েক শতাব্দী ধরে তাকে জেনে আসার পরেও এই হেঁয়ালির সমাধান হয়নি।

প্রশ্ন : ম্যাগনেট থাকলে ম্যাগনেটিজম থাকে। পৃথিবীটা কোন ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিজম-এ ডুবে আছে?

মা : পৃথিবী নিজেই একটা ম্যাগনেট। মস্ত ম্যাগনেট।

প্রশ্ন : বুঝব কী করে?

মা : অরোরা দেখে।

প্রশ্ন : মেরুজ্যোতি? ম্যাগনেটিজম-এর জ্যোতি নাকি?

মা : পৃথিবীর ম্যাগনেটিজম-এর 'ফোর্স' যে-লাইন বরাবর ছুটছে, পৃথিবী ঘিরে মেরু অঞ্চলের দিকে গিয়ে তা একটু একটু করে খাড়াই হয়ে যেতে থাকে। সূর্য থেকে বিদ্যুকণা ছুটে এসে এই ম্যাগনেটিক ফোর্সের লাইনগুলোকে ঘিরে পেঁচিয়ে নামতে নামতে বাতাসের ধাক্কায় আলোকময় হয়ে ওঠে। এরই নাম মেরুজ্যোতি।

পৃথিবীর ম্যাগনেটিজম-এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। উত্তর মেরুতে এর নাম অরোরা বোরিয়ালিস, দক্ষিণ মেরুতে অরোরা অস্ট্রালিস।

প্রশ্ন : ম্যাগনেটিজম কীভাবে তৈরি হচ্ছে মা?

মা : সঠিক উত্তর মেলেনি আজও। মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, ম্যাগনেটিক বস্তুদের মধ্যে গুছিয়ে থাকা কণিকাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ম্যাগনেটিজম তৈরি হয়ে চলেছে। একটা তত্ত্ব বলছে, এই জাতীয় বস্তুদের মলিকিউলগুলোই এক-একটা ক্ষুদে ম্যাগনেট। উল্টোপাল্টা অবস্থায় থাকলে কাটাকুটি হয়ে যায় ফোর্সগুলো—তখন আর বস্তুটা ম্যাগনেট থাকে না। কিন্তু যদি লাইন দিয়ে থাকে মলিকিউল-ম্যাগনেটরা, তখন নর্থ পোলগুলো থাকে একদিকে, সাউথ পোলগুলো উল্টোদিকে—তখন ম্যাগনেট হয়ে যায় সেই বস্তু।

প্রশ্ন : মলিকিউলদের ভেতরকার ইলেকট্রনদের জন্যেও তো ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হতে পারে?

মা : তাই মনে করেন একদল বৈজ্ঞানিক। অ্যাটমকে ঘিরে চরকিপাক দিয়ে ইলেকট্রন মহাপ্রভুরাই ম্যাগনেটিজম বানিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন : মোটকথা, ম্যাগনেটিজম আজও এক রহস্য?

মা : আগে যতটা রহস্যময় ছিল, এখন ততটা নেই। যাকে পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাওয়া যায় না, যার ওজন নেই—তা প্রহেলিকা ঠিকই। সে কালের মানুষ তাই মনে করত চুম্বক পাথরের জাদুকরী শক্তি আছে। গ্রীকরা বলত, চুম্বকের আত্মা আছে। বলত, চুম্বক থেকে অদৃশ্য বাষ্প বেরিয়ে গিয়ে লোহার গায়ে ছোট ছোট ছেঁদা করে তার মধ্যে ভ্যাকুম বানিয়ে লোহাকে টান মারে নিজের দিকে। প্লেটো লিখেছেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ডাকটাইল নামে উপজাতিরা চুম্বক পাথরের তৈরি আংটি পরত, তার নাম 'সামোথ্রেসিয়ান আংটি'। রোমানরা আজগুবি গল্প বানিয়েছে, চুম্বক পাথর নিয়ে—ধাতুর মূর্তি নাকি শূন্যে ভাসিয়ে রাখত। হাতুড়ে ডাক্তাররা প্লেগ থেকে শুরু করে মামুলি সর্দি পর্যন্ত সারিয়ে দিত চুম্বক পাথরের জাদু দিয়ে। অ্যালকেমিস্টরা মনে করত, নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনা করে দিতে পারে জাদুকরী চুম্বক পাথর। আর যদি চুম্বক পাথরের শরবত বানিয়ে খেয়ে ফেলা যায়, তা হলে নাকি নিঘাৎ বয়স থমকে যাবে আর বাড়বে না। হাসছিস? এই কলকাতা আর ধারেকাছে চুম্বকের চিকিৎসা করে ফল দেখাচ্ছেন, এমন ডাক্তারের ঠিকানাও আমি জানি।

প্রশ্ন : তাই বলে চুম্বকের শরবত খেয়ে অমরত্ব লাভ! এ পাথর কোথায় পাওয়া যায় মা?

মা : লোহার খনিতে। বিশেষ একটা কালচে লোহা অন্য লোহাকে কাছে টেনে নিতে পারে। ৪০০০ বছরেরও আগে চিনে জাদুকররা এই 'ম্যাগনেটাইট' লোহা বা 'লোডস্টোন' দিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে 'থ' করে দিত দর্শকদের। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ২৭০০ বছর আগে এই জাদু থেকে তৈরি হল আদি কম্পাস—চিনদেশে। আরব্যরজনীর গল্পে আছে জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেক ছুটে গেছিল উত্তরের চুম্বকের টানে। অনেকের ধারণা ছিল, উত্তরে চুম্বক পাথরের স্তূপ আছে। সে ভুলও ভাঙল যখন ১৬০০ সালে স্যার উইলিয়াম গিলবার্ট দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীটাই একটা চুম্বক। পৃথিবীর নর্থ পোল টানছে কম্পাসের কাঁটাকে। এঁকে এই জন্যেই বলা হয় 'গ্যালিলিও অফ ম্যাগনেটিজম'

প্রশ্ন : পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড?

মা : ম্যাগনেটিক ল্যাবরেটরি বলতে পারিস। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য আর কসমিক-রে নিয়ে চলছে প্রকৃতির নিরন্তর এক্সপেরিমেন্ট।

প্রশ্ন : প্রকৃতির এক্সপেরিমেন্ট?

মা : ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনওদিনই একরকম থাকে না কেন? মূলে রয়েছে সৌরবাতাস, সৌরকলঙ্ক আর কসমিক-রে। ভ্যান অ্যালেন বেল্ট ঘিরে রয়েছে পৃথিবীকে—যার জন্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকেই। অনেকে তো মনে করেন, এই বেল্টই অরোরা বানাচ্ছে।

প্রশ্ন : পৃথিবীর বেল্ট?

মা : অদৃশ্য বেল্ট। সূর্য থেকে, আরও দূর অঞ্চল থেকে চার্জড় বস্তুকণা এসে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আছড়ে পড়ছে—বিশাল এলাকা জুড়ে এরাই বানিয়ে নিয়েছে ভ্যান অ্যালেন বেল্ট।

প্রশ্ন : ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনও দিনই এক থাকে না কেন মা?

মা : বেশিটা সৌরকলঙ্কের জন্যে। কিছুটা পৃথিবীর ভেতরকার লোহা আর নিকেলের জন্যে। পৃথিবী ঘুরছে, গলিত এই ধাতুরাও ঘুরছে—ফিল্ড সরে সরে যাচ্ছে। সূর্য থেকে রোজই কিছু অজানা বিকিরণ হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডে। প্রতি এগারো বছর অন্তর সৌরকলঙ্করা বড় বেশি দেখা দেয় সূর্যের বুকে—ম্যাগনেটিক অদৃশ্য সমুদ্রে ঝড় বেড়ে যায়। টেলিফোন, ইলেকট্রনিক্স, রেডিও, রাডারে তা টের পাওয়া যায়। ঠিকমত কাজ করে না—অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়।

প্রশ্ন : অদৃশ্য ম্যাগনেটিজম যন্ত্রদের বিগড়ে দেয় কেন?

মা : ম্যাগনেট দিয়ে তৈরি যে! একটু গড়বড় তো করবেই। পার্মানেন্ট ম্যাগনেট দিয়ে তৈরি অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার, গ্যালভানোমিটার, কার্ডিওগ্রাফ রেকডার, সিসমোগ্রাফ, ম্যাগনেটিক কম্পাস, ম্যাগনেটোমিটার—আরও অনেক যন্ত্র বিচলিত হয় পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হেরফের ঘটলেই। অনেক দূরে বসে নাটের গুরু মূলত সূর্যই তা করায়।

প্রশ্ন : পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বললে কেন? অস্থায়ী চুম্বকও হয় নাকি?

মা :তার দিয়ে সফট আয়রনকে পেঁচিয়ে, সেই তারের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট চালিয়ে দিলে লোহা হয়ে যায় ইলেকট্রো ম্যাগনেট—কারেন্ট বন্ধ করে দিলেই ফের লোহা। এই ধরনের ম্যাগনেট রয়েছে সমস্ত ইলেকট্রিক মোটরের হৃৎপিণ্ডে, রয়েছে টেলিগ্রাফে, টেলিফোনে, ইলেকট্রিক ঘন্টায়, স্টিল প্ল্যান্টে, টেম্পারেচার, প্রেসার,ট্রাফিক সিগনাল—সবই কন্ট্রোল করছে পারমানেন্ট ম্যাগনেটের দল। তোর ওই খেলনার গাড়ি আর তাসাওয়ালার মধ্যেও রয়েছে পাকা চুম্বক।

প্রশ্ন : ম্যাগনেট তাহলে বানানো যায়?

মা : নিশ্চয়। একটা সময় গেছে যখন ইস্পাতকে লোডস্টোন দিয়ে ঠকে নকল চুম্বক বানানো হত। তার পরেই তো দেখা গেল তারের কুণ্ডলী মানে জিলিপির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চালিয়ে দিলেই নকল চুম্বক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই ইলেকট্রোম্যাগনেটকে বলে ‘সোলেনয়েড’। ইস্পাতের ডাণ্ডাকে নকল পার্মানেন্ট ম্যাগনেট করাও হচ্ছে। আরও অনেক উন্নত পন্থা বেরিয়েছে। নানা রকমের খাদ মেশানো ধাতুকে তেলে জলে ডুবিয়ে কারেন্ট খাইয়ে কড়া পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বানানো হচ্ছে। বুড়িয়ে গেলে চুম্বকত্ব চলে যায় বলে তাকে অনেক তোয়াজ করে চুম্বকত্ব-আয়ু বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

প্রশ্ন : তাহলে তো চুম্বকের চুম্বকত্ব কেড়ে নেওয়ার পথও আছে?

মা : আছে বইকি। স্রেফ ঠুকে আর তাতিয়ে। হাতুড়ি দিয়ে পিটলেই চুম্বকত্ব চলে যায়—গরম করলেও তাই হয়। ঠিক যেন ভেতরকার ক্ষুদে চুম্বকগুলো দিব্বি সাজানো অবস্থা থেকে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়—নিজেরাই নিজেদের চুম্বকত্ব কাটাকুটি করে ফেলে।

প্রশ্ন : তাহলে বলো রোদের আঁচে পৃথিবীর ম্যাগনেটের চুম্বকত্ব চলে যায় না কেন?

মা : লোহার চুম্বকত্ব পুরোপুরি কেড়ে নিতে গেলে দরকার হয় ৭৫০ ডিগ্রি তাপ। রোদে তা নেই।

প্রশ্ন : পৃথিবীর ম্যাগনেটিজম কতটা মা?

মা : লোম খাড়া করে দেওয়ার মত। প্রচুর চুম্বক পদার্থ রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে। ৮০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টা এক পাউণ্ড ম্যাগনেট যদি পাশাপাশি পৃথিবীর জঠরে বসিয়ে দেওয়া যায়—তা হলে যে চুম্বকত্ব দাঁড়ায়—তাই।

প্রশ্ন : পৃথিবীর পেট থেকে লাভার সঙ্গে চুম্বক বেরিয়ে এলে গরমে তো নষ্ট হয়ে যায়?

মা : অবাক কাণ্ড সেইখানেই। আগ্নেয়গিরির লাভায় চুম্বক যেমন তেমনি থাকে। বহু জমাট লাভায় স্তরে-স্তরে চুম্বক কম্পাস হয়ে থেকে গেছে। ভূকেন্দ্রের প্রচণ্ড তাপেও তো সেখানকার ম্যাগনেটিক বস্তুদের ম্যাগনেটিজম লোপ পাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিকরা মাথা চুলকোন এ সব প্রশ্ন শুনলে। এই পৃথিবীর অনেক রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ম্যাগনেটিজম-এর মধ্যে।

প্রশ্ন : এতই যদি ক্ষমতা পৃথিবী-চুম্বকের, অরোরা তৈরি করছে না কেন পৃথিবীর মাথায়?

মা : কলকাতা তো রয়েছে বিষুবরেখায়। সৌরকলঙ্ক দেখা দিলেই সাবমাইক্রোসকোপিক ইলেকট্রন আর প্রোটন সেকেণ্ডে ২০০ থেকে ১০০০ মাইল স্পিডে ঠিকরে আসে সূর্যের বুক থেকে—২/১ দিনেই পৌঁছে যায় পৃথিবীতে। সেই তুলনায় আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি আলোর গতিবেগে ৮ মিনিটেই পৌঁছে যায় পৃথিবীতে। হাজার হাজার মাইল দূরে এসেই বস্তুকণাগুলোকে পৃথিবীর ম্যাগনেটিজম ঠেলে দেয় সুমেরু আর কুমেরুর দিকে—এই কারণেই মার্চ আর সেপ্টেম্বরেই বেশি অরোরা দেখা যায়—তখন পৃথিবীর অক্ষরেখা সূর্যের সঙ্গে সঠিক কোণে থাকে। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডক্টর উইলিয়াম বেনেট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন, বিষুব রেখার মাথায় পৃথিবী ঘিরে ঠিক এই সময়ে মস্ত ইলেকট্রিক কারেন্টের আংটি তৈরি হয়ে যায়—ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লাইন ধরে নেমে যায় অরোরা অঞ্চলের দিকে।

প্রশ্ন : অরোরা অঞ্চলটা তাহলে কোথায়?

মা : পুব গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো অঞ্চলে। সেখানে প্রায় প্রতি রাতেই আকাশ জ্বলতে থাকে মেরুজ্যোতির দৌলতে। সূর্য-চন্দ্র-তারা দেখার মতই ম্যাগনেটিজম-এর আশ্চর্য খেলা দেখা যায় রোজ। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দেখা যায় ১০ থেকে ২০ বছরে একবার। বিষুবরেখায় অরোরা কি জিনিস তা কেউ দেখেনি। আলাস্কা, উত্তর কানাডা, নরওয়ে, গ্রীনল্যাণ্ড উপকূল আর উত্তর সাইবেরিয়াও পড়ে অরোরা অঞ্চলে। তবে তোর ভাগ্য যদি খুলে যায়, ১১ বছর অন্তর সৌরঝড় যদি একবার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—অদৃশ্য 'সমুদ্র' কি এক্সপেরিমেন্ট করে বসবে কে জানে। তখন হয়ত কলকাতার মাথায় দেখবি মেরুজ্যোতি। কল্পবিজ্ঞানে মানায়? কল্পনা করতে কিন্তু ভাল লাগে।